মনোরমার জীবন-চিত্র

দ্বিতীয় খণ্ড এবং সমাপ্ত

শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা

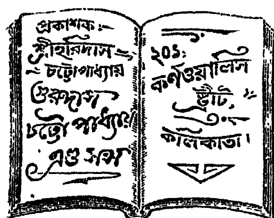
কর্তৃক লিখিত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌

২০১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

আশ্বিন,—১৩২৫

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা (বাঁধান)



প্রিণ্টার—শ্রীরাধাশ্যাম দাস,
ভিক্টোরিয়া প্রেস
২ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন

অত্যন্ত সঙ্কোচ ও ভয়ের সঙ্গে "মনোরমার জীবন-চিত্র" ১ম খণ্ড প্রকাশিত করিতে হইয়াছিল। পাঠক-পাঠিকাগণের সহৃদয়তায় দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত করিতে আমার সেরূপ ভয় ও সঙ্কোচ নাই। দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য চারিদিক্ হইতেই যথেষ্ট উৎসাহ ও উত্তেজনা পাওয়া গিয়াছে।

সঙ্কোচের দুইটি কারণ ছিল। একে ত নিজের গৃহিণীর জীবন-চিত্র, তাহাতে আমার নিজের কথা অনেক বলিতে হইয়াছে। দক্ষিণেশ্বরের পূজ্যপাদ পরমহংসদেবের কৃপা-প্রাপ্ত বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ এবং তপোবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত স্বামী তুরিয়ানন্দজী ১ম খণ্ড জীবন-চিত্র পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন— "যদি আপনি ইহা (এই জীবন-চিত্র) না লিখিতেন, তবে সাধারণের উপর আপনার অত্যাচার করা হইত। কারণ, তিনি (মনোরমা) লোকতঃ আপনার সহধর্ম্মিণী হইলেও ধর্ম্মতঃ আমাদের সকলেরই মহাহিতসাধিনী ও মনোরঞ্জনকারিণী।"

"ভক্তিযোগ"প্রণেতা দেশরত্ন শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—"তোমার নিজের কথা যাহা লিখিয়াছ, তাহাতেও বড় সুখ পাইয়াছি।"

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—"আপনার নিজের কথা না লিখিয়া কিরূপে আপনি আপনার স্ত্রীর জীবন-চরিত্র লিখিতেন, তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। ইহাতে যদি কোনো পাঠক মনে করেন, আপনি

অহমিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপায় নাই।" এইরূপ অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লিখিয়াছেন ও বলিয়াছেন। সুতরাং আমার উভয় প্রকারের সঙ্কোচই খর্ব্ব হইয়াছে।

"নব্য-ভারত" লিখিয়াছেন যে,— "এই পুস্তকের বিশ-হাজার খণ্ড মুদ্রিত করিয়া বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে বিতরণ করা কর্ত্তব্য ছিল।" এ কথা দ্বারা শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় মনোরমার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও আমার প্রতি যথেষ্ট অনুকম্পা দেখাইয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞাপালনের উপযুক্ত সুযোগ যদি কখনও উপস্থিত হয়, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

বঙ্গদেশে অন্য কোনও ব্যক্তি নিজের গৃহিণীর জীবন-চরিত্র লিখিয়াছেন বলিয়া জানি না, এই দুঃসাহসের কার্য্য শুধু আমিই করিলাম, এই জন্যই এত কথা বলিতে এবং এত কৈফিয়ৎ দিতে হইল।

বিনীত

গ্রন্থকার।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়

বর্ত্তমান যুগে নানারূপ চিন্তাপ্রণালী ধর্ম্মের বেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সে সকলের মধ্যে একটি এই যে, ধর্ম্ম যেন একটা মানসিক-ব্যায়াম এবং মানুষের আত্মশক্তিই উহার নিয়ন্তা। যে অঙ্গের অনুশীলন না হয়, শরীরের সেই অঙ্গ যেমন অপুষ্ট থাকে, সেইরূপ মানসিক যে বৃত্তির অনুশীলন না করিবে, উহার পরিপুষ্টি হইবে না ; আর যে বৃত্তির বেশী অনুশীলন করিবে, উহা অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া যাইবে ; সুতরাং মানসিক বৃত্তি-নিচয়ের সম-বিকাশ হইবে না, কাজেই পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মলাভ হইবে না। বলা বাহুল্য যে, এ সকল কথা কোন দেশেরই ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুমোদিত নহে এবং এরূপ মতের ধর্ম্মে, ভগবৎকৃপা একান্ত আবশ্যকীয় বস্তু নহে। ইহার মধ্যে পরিস্ফুট আস্তিক্যবুদ্ধি নাই।

শরীরের প্রত্যেক অঙ্গকে আহার করাইতে হয় না, একমাত্র উদরে আহার্য্য পড়িলেই উহা দ্বারা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুষ্ট হয়, সেইরূপ একমাত্র ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলে সমস্ত সদ্‌বৃত্তির যথোচিত বিকাশ হয়। শরীরের প্রত্যেক অঙ্গকে, প্রত্যেক যন্ত্রকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র-রূপে পরিপোষণ করার ভার যদি মানুষের হাতে থাকিত, তবে কেহই জীবনধারণ করিতে পারিত না। বৃক্ষের মূলে জল-সিঞ্চন করিলে যেমন সমস্ত কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প এবং ফল, পুষ্টতা লাভ করে, সেই-রূপ ভগবানে প্রীতি জন্মিলে তাহা হইতেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়, এইরূপ বিশ্বাসই আস্তিকতার পরিচায়ক।

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি-পূর্ব্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

(গীতা ১০ম)

ভগবানে সতত যুক্ত থাকিয়া প্রীতিপূর্ব্বক যাঁহারা তাঁহার ভজনা করেন, যাহাতে তাঁহারা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে তিনি সেইরূপ বুদ্ধি-যোগ প্রদান করেন।

সুতরাং ভগবানে একান্ত অনুরক্তি দ্বারা সাধকের বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয়, বিশুদ্ধ-বুদ্ধি-ব্যক্তির সমুদয় আচরণই যথোচিত হইবে, সমুদয় বৃত্তিই যথোচিত স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে, কাল্পনিক পথে চলিয়া দিশাহারা হইবেন।

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ।"

যাঁহারা একান্তচিত্তে ভগবান্‌কে উপাসনা করেন, সেই নিত্যাভিযুক্ত ব্যক্তিগণের যোগক্ষেম ভগবান্‌ই বহন করেন।

যোগ অর্থ প্রয়োজনীয় বস্তুর আহরণ এবং ক্ষেম অর্থ উহার সংরক্ষণ। ঐকান্তিক ভক্তের সাংসারিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর ভগবান্ আহরণ করেন এবং উহার সংরক্ষণ করেন। তখন অভাব এবং অধর্ম্ম থাকে না, সাধকের পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কেন না, পিতাই শিশুর হাত ধরিয়াছেন। এইরূপ বিশ্বাসের নাম-ই আস্তিক্যবুদ্ধি।

ভগবান্‌কে প্রেম করাই ধর্ম্ম, না করাই অধর্ম্ম। বহুপ্রকারের পাপ বা বহুপ্রকারের ধর্ম্ম নাই। এক পাপ, এক ধর্ম্ম ; সহস্র প্রকারের

পাপকার্য্য বা ধর্ম্মকার্য্য ঐ একেরই শাখা-প্রশাখা মাত্র। ঈশ্বরানুরাগই ধর্ম্ম, এবং তাঁহাতে বীতানুরাগ-ই পাপ। সুধু সু-গৃহিণী হইলে চলিবে না, পতিপ্রাণা হওয়া চাই, নতুবা সমস্তই বৃথা।

"সর্ব্বধর্ম্মাণ্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

অন্য সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সুধু (ঈশ্বরের) শরণাগত হও, তিনিই তোমাকে সমস্ত পাপ (অযুক্তকার্য্য) হইতে রক্ষা করিবেন। ইহাই আস্তিক্যধর্ম্ম।

ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ, জীবন্ত, সর্ব্বশক্তিমান্, ভক্তবৎসল ও "সর্ব্বস্ব" বলিয়া না জানিলে, আস্তিক হওয়া যায় না, কোনও আবছায়া বিশ্বাস লইয়া ধর্ম্ম চলে না।

প্রকাণ্ড একটা চাউল-কলে প্রতিদিন হাজার হাজার মণ ধান ভাঙ্গিতেছে। ধানগুলি কলের একটা মুখে ঢালিয়া দেওয়া হয়, কল ঘুরিতে থাকে। যথাকালে তুঁষ, খুদ, কুড়ো এবং ছাঁটা চাউল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট-স্থানে নির্গত হয়। সেইরূপ ভগবানের নামরূপ যন্ত্রে সাধকের চিত্ত যখন অর্পিত হয়, তখন সেই কলেরই গুণে প্রীতিভক্তি, পবিত্রতা, স্নেহ, মমতা, দয়া, দাক্ষিণ্য সমস্তই যথোপযুক্তরূপে আপনাপন স্থান প্রাপ্ত হয়। ইহাতে ভুল-ভ্রান্তি বা নূন্যাধিক্য কিছুই ঘটে না। অন্য কোনও রূপ সাধনা দ্বারাই মানুষ এইরূপ নিখুঁত ও নির্ভুল হইতে পারে না। এই প্রলোভন-পূর্ণ সংসারে মানুষ আপনার বুদ্ধিবলে রক্ষা পাইবে, এরূপ কল্পনা করাই মোহের কার্য্য। ভগবানকে আত্মসমর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। তাই দাস নরোত্তম বলেছেন,—

"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।"

"ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্
পাশ নাশ হেতুরেষ নতু বিচার বাবলম্"

ইহাই আস্তিক্য ধর্ম্ম।

(৫৫ বৎসর পূর্ব্বে এই বাংলা দেশের কোন এক ক্ষুদ্র পল্লীতে একজন শুদ্ধচরিত্র লক্ষ্মীমন্ত গৃহস্থের গৃহে একটী বালিকা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে বালিকা পুস্তক হইতে কিছুমাত্র বিদ্যালাভ করে নাই, কাহারও মুখে, যোগতত্ব, আত্মদর্শন, ব্রহ্মদর্শন প্রভৃতির বিষয় শুনে নাই, কোনও রূপ অনুশীলন বা চর্চ্চা করে নাই, শুধু সদ্‌গুরুর কৃপায় ব্রহ্মনামে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং কিরূপ ভাবে সংসারধর্ম্ম পালন করিয়াছে, মনোরমার জীবন-চিত্রে তাহাই চিত্রিত হইয়াছে।)

প্রশ্ন উঠিতে পারে গুরুকৃপায় সকলের সমান অবস্থা হয় না কেন? শাস্ত্র বলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মে যিনি যেরূপ সাধনা করিয়াছেন, তাহার ফল লইয়া নবীন-জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষেত্র যেরূপ প্রস্তুত থাকে বীজ (বীজমন্ত্র) সেই হিসাবে অঙ্কুরিত হয়। জন্মান্তরের জ্ঞানাগ্নি ইন্ধন পাইলেই জ্বলিয়া উঠে। মহাকবি কালিদাস গৌরীর বিদ্যাশিক্ষা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ;—

"তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং
মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশ কালে
প্রপেদিরে প্রক্তনজন্ম বিদ্যাঃ॥ কুমার সম্ভব

শরৎকালে গঙ্গাবক্ষে হংসমালা যেরূপ হঠাৎ আসিয়া হাজির হয়, রাত্রি হওয়া মাত্রই যেমন মহৌষধিগুলি আপনা আপনি দীপ্তি পায়,

সেইরূপ বিদ্যাশিক্ষা কালে স্থির-বুদ্ধি পার্ব্বতীর পূর্ব্বজন্মের অভ্যস্থবিদ্যা স্ফূর্ত্তি পাইল।

আজন্মসিদ্ধ শ্রীশ্রীকবীর সাহেব বলিয়াছেন ;—

"জীবৎ লৌলাগিরহে মুয়েমাঁহি সমায়"।

জীবন্তে প্রেম লেগেই থাকে, মরিলেও সঙ্গে সঙ্গে (পরবর্ত্তি দেহে) প্রবেশ করে।

ধ্যানযোগের কথা শুনিয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি চিত্তস্থিরতা রক্ষা করিতে না পারিয়া যোগী সিদ্ধলাভ করিতে না পারে তবে কি বায়ুবিচ্ছিন্ন মেঘের মতন বিনষ্ট হইবে ?"

ভগবান্ বলিলেন "হে অর্জ্জুন, ইহকাল পরকালে কোথাও তাঁহার (যোগীর) বিনাশ নাই,—

"নহিকল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"।

কল্যাণকারী ব্যক্তিরা কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না, ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।

সকলেই শতদল পদ্ম বা বসরাই গোলাব, কেহ আজ ফুটিয়াছে, কেহ কাল ফুটিবে, কেহবা এখনও কলিকা আছে ফুটিতে দুদিন বিলম্ব হইবে, এইমাত্র পার্থক্য।

গীতা বলেন, যোগভ্রষ্ট অথবা অপ্রাপ্তসিদ্ধি সাধক, শুদ্ধচরিত্র লক্ষ্মীমন্ত গৃহস্থের ঘরে অথবা যোগীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বদেহ-জাত সাধনার সংযোগ প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হন।

কি অপূর্ব্ব আশার কথা! এক জনের জীবনে সাক্ষ্য পাইলে কত লোকের আশা হয়। তাই বুঝি শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন,

"মনোরমার জীবন দ্বারা লক্ষ লোকের উপকার হইবে"।

মনোরমার জীবন-চিত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

ভবানীপুর পদ্মপুকুর

ভগবতী বাবুর বাড়ীতে আসিয়া আমাদের মন বড়ই প্রফুল্ল হইল। বাড়ীটির বাহিরের মহলে একটি আঙ্গিনা এবং একটি প্রশস্ত বৈঠকখানা-ঘর ও চাকরের জন্য একটি ছোট ঘর ছিল। অন্দর-মহলে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত আঙ্গিনা, এবং চারিটি শয়ন-ঘর, দুইটা রান্নাঘর ও স্নানের ঘর প্রভৃতি ছিল। প্রাচীরের কোলে কোলে বেল, যূঁই, চামেলী, গেঁদা, গোলাপ ও পাতাবাহারের গাছ সারি সারি সুশৃঙ্খলভাবে শোভা পাইত। সকল ঘরের চারিদিকেই ড্রেণ, কোথাও কিছুমাত্র জল দাঁড়াইতে পারে না। ভাড়ার বাড়ীর এরূপ সুবন্দোবস্ত প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। বাড়ীওয়ালা এমন কোনও খুঁত রাখেন নাই, যাহা লইয়া ভাড়াটীয়া কিছুমাত্র অভিযোগ আনিতে পারে। ছাদে উঠিবার সিঁড়িটিও বেশ প্রশস্ত, ছাদের চারিদিকে প্রাচীর ঘেরা, ছেলে-পিলেদের সেখানে দৌড়াইতে খেলাইতে কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। সিঁড়িঘরে একটা ছোট কুঠরী, সেখানে একজন লোকের নির্জ্জন-বাসের

ও শয়নের সুবিধা আছে। বাড়ীটির খিড়কীর দ্বারে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী, উহার চারিপাড়ে নারিকেল, কদলী প্রভৃতি বৃক্ষরাজি। যদিও এই পুকুরটি আমাদের মধ্যে নহে, তথাপি উহার ব্যবহারে আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। আমাদের খিড়কীর দরজায় একখানা বাঁধাঘাট ছিল, সে ঘাটটি এত পরিষ্কার যে, কখন কখনও বালক-বালিকাগণ ঘাটে বসিয়া আহার করিত।

পঁচিশ টাকা ভাড়ার একটি বাড়ীর এইরূপ বর্ণনা করিতে দেখিয়া কেহ মনে মনে হাস্য করিতে পারেন; কিন্তু আমরা অনেক বড় বড় বাড়ীতে বাস করিয়া এরূপ আনন্দ লাভ করি নাই। যে মনোরমা বোলপুরের শান্তিনিকেতনরূপ প্রাসাদে বাস করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন, তিনি এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

বাড়ীওয়ালা ভগবতী বাবু নিজে পরিশ্রম করিয়া উনান প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বস্তুতঃ উমাচরণ বাবু, ভগবতী বাবু এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ সকলেই সর্ব্বদা আমাদের সুখ-সুবিধার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নিকট আমি চিরকালের তরে কৃতজ্ঞ হইয়া রহিয়াছি।

ভবানীপুর আসার পরে শ্রীমান্ রেবতীমোহন, বেণীমাধব এবং অন্যান্য দুই একটি বন্ধু ব্যক্তি আমাদের পরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। অতিথি অভ্যাগত অনেক সময়ই থাকিতেন।

কলিকাতায় আসিয়া চন্দ্র বাবুকে গয়ায় একশত টাকা পাঠাইবার জন্য আমি ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। যখন তাঁহার নিকট হইতে একশত টাকা লইয়াছিলাম, তখনই এই সঙ্কল্প ছিল যে, "কবিতা-রঞ্জন" নামক

আমার রচিত বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকখানার গ্রন্থ-স্বত্ব বিক্রয় করিয়া চন্দ্র বাবুকে টাকা পাঠাইব। উক্ত পুস্তকখানি পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে একটু আদৃত হইয়াছিল এবং উহা বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য-তালিকায় স্থান পাইয়াছিল, প্রতি বৎসরই উহার দ্বারা কিছু অর্থাগম হইত, অনেকবার উহা উচ্চ প্রাইমেরী পরীক্ষার পাঠ্য হইয়াছে। আজ অসুবিধায় পড়িয়া অল্পমূল্যে উহা বিক্রয় করার সঙ্কল্প করিলাম। কেন না, চন্দ্র বাবুকে অতি সত্বর টাকা পাঠাইতে হইবে। পুস্তকের প্রকাশক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয়ের সহিত কথা বলিয়া জানিলাম, উক্ত পুস্তকের হিসাবে তাঁহার নিকট আমার ৮০৲ আশী টাকা পাওনা হইয়াছে, আমি তৎক্ষণাৎ সেই টাকা তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া চন্দ্র বাবুকে পাঠাইয়া দিলাম এবং অবশিষ্ট ২০৲ কুড়ি টাকা শীঘ্র পাঠাইব বলিয়া লিখিলাম। কয়েক দিন পরে চন্দ্র বাবু আমাকে লিখিলেন যে, বাকি ২০৲ কুড়ি টাকা আমাকে পাঠাইতে হইবে না, কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের খরচের জন্য ২০৲ কুড়িটা টাকা দিয়াছেন। পরে জানিলাম, সেই শ্রদ্ধেয় বন্ধু আর কেহ নহেন, তিনি বাঁকিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রদ্ধেয় ৺ প্রকাশচন্দ্র রায়ঃ আমাদের ২০৲ টাকার অনাটন পড়িয়াছে বলিয়া যে তিনি ঠিক্ ঠিক্ গণিয়া ২০৲ টি টাকা দিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি তাহা জানিতেন না, আমাদিগকে ২০৲টি টাকা দেওয়ার ইচ্ছা হওয়াতেই তিনি উহা দিয়াছেন; কিন্তু ভগবানের কৃপায় অচিন্তিতরূপে একশত টাকার জোগাড় হইয়া গেল, এবারে "কবিতা-রঞ্জনে"র গ্রন্থস্বত্ব বিক্রয় করিতে হইল না।

শুগন নামক একটি হিন্দুস্থানী চাকর ও রান্না করার জন্য একজন ব্রাহ্মণীকে রাখা হইল। কোথা হইতে যে সমস্ত খরচ চলিবে, তাহার স্থিরতা নাই। উমাচরণ বাবু ইচ্ছা করিয়া এক দোকান হইতে কয়েক মণ বাকতুলসী চাউল আনিয়া দিলেন। অন্যান্য খরচপত্র কোথা হইতে কি ভাবে চলিল, তাহা এখন আমার ঠিক মনে নাই।

ইচ্ছাশক্তির কার্য্য

আমি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া কতকগুলি রোগীকে অচিরে আরোগ্যদান করিয়াছিলাম, আমার বন্ধু ৺ শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী, তন্মধ্যে কয়েকটি ঘটনা "মিরার" নামক দৈনিক ইংরাজী পত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া নানাস্থান হইতে আমার নিকট রোগী আসিতে লাগিল। আমি নিয়ম করিয়া দিলাম যে, সপ্তাহের মধ্যে একমাত্র বুধবারে আমি রোগী দেখিব। কোন কোন বুধবারে শতাধিক রোগীও উপস্থিত হইত, ইহাদের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকও আসিতেন।

একদিন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, মহামহোপাধ্যায় ৺মহেশ-চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আমি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তাঁহার দুই চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, তিনি বহু চেষ্টা করি-য়াও কিছুতেই চক্ষু মেলিতে পারিলেন না। ইহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, আমি ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে নিশ্চয়ই তাঁহাকে রোগমুক্ত

করিতে পারিব। আমি এইরূপ হাত, মুখ, চোক, কাণ বন্ধ করিয়া দিয়া ইচ্ছাশক্তির উপর রোগীর বিশ্বাস জন্মাইতাম।

নব-বিধানের অন্যতম নায়ক মহাবাগ্মী প্রচারক ভাই প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত যখন আমার প্রথম দিন আলাপ হইল, সেই দিন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের মুখে আমার নাম শুনিয়াই তিনি আমাকে বলিলেন যে, তিনিও ইচ্ছাশক্তির অলৌকিক কার্য্য (Miracle) বিশ্বাস করেন। আরও বলিলেন, "মানুষের মন জড় বস্তুর উপর কতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই, যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে যে সকল অলৌকিক কার্য্যের উল্লেখ আছে, সে সকল অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।" বাস্তবিকও ইচ্ছাশক্তি জড় বস্তুর উপর কতদূর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে, তাহার একটা সীমারেখা টানিয়া দেওয়া বড়ই অবিবেচনার কার্য্য। একদিন বরিশালের স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এবং আমি একস্থানে কথা-বার্ত্তা বলিতে বলিতে রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম। খুব ভোরে আমরা উপাসনা করিতেছি, এমন সময় ব্রজমোহন কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যা-পক পণ্ডিত কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার ইচ্ছা হইল যে, পণ্ডিত মহাশয়কে বোবা করিয়া রাখিব, সত্য সত্যই তাঁহাকে বোবা হইতে হইল। পণ্ডিত মহাশয় কথা বলিতে না পারিয়া অত্যন্ত ত্রাস-যুক্ত হইলেন এবং একটা পেন্সিল দিয়া একটু কাগজে লিখিয়া অশ্বিনী বাবুকে জানাইলেন যে, তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তিনি কথা কহিতে পারিতেছেন না, কিরূপে

শিক্ষকতা করিবেন ? অনেকক্ষণ ধরিয়া আমরা তাঁহাকে লইয়া আমোদ করিতে লাগিলাম। তিনি শত চেষ্টা করিয়াও কথা কহিতে পারিতেছেন না, তাঁহার অধরোষ্ঠ জুড়িয়া গিয়াছে, তাহা আর স্বতন্ত্র হয় না। কথা কহিতে যত চেষ্টা করিতেছেন, শুধু "গোঁ গোঁ" শব্দ হইতেছে, কথা ফুটিতেছে না। পণ্ডিত মহাশয় যখন বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন, তখন শ্রীমান্ অশ্বিনী তাঁহার মুখ খুলিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম, "পণ্ডিত মহাশয়, কথা বলুন, কথা বলুন," অমনি তিনি হাঁ করিয়া মুখ খুলিয়া কথা বলিতে লাগিলেন, এবং আপনাকে বিপদ্‌মুক্ত মনে করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। বরিশালে এরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। তিন চারি জন অবিশ্বাসীর হাতে হাতে ধরাইয়া ইচ্ছাশক্তি দ্বারা হাত বাঁধিয়া দিয়াছি, শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা হাত খুলিয়া স্বতন্ত্র হইতে পারেন নাই।

গয়ার চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ডাক্তার মহাশয়ের কথা পাঠককে একাধিকবার বলিয়াছি। একদিন তাঁহার নিকটে একটি যুবক বসিয়া কথা বলিতেছিল, সে যুবকটি পোষ্টাফিসে সামান্য বেতনে কেরাণীর কার্য্য করে। তাহার চিবুকখানা অত্যন্ত বাঁকা দেখিয়া আমি ঐরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, একবার জ্বর হইয়া এই অঙ্গটি বিকৃত হইয়া গিয়াছে। আমার মনের মধ্যে শক্তি আসিল, আমি চিবুকখানা ধরিয়া তৎক্ষণাৎ সোজা করিয়া দিলাম, উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। আরও একটি ঘটনা বলিব। ডাক্তার চন্দ্র বাবুর একটি ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ অমরনাথ তীব্র জ্বর ও নিউমোনিয়া রোগে ভুগিতেছিল, চন্দ্র বাবু নিজে সু-চিকিৎসক, তিনিই যুবকের

চিকিৎসা করিতেছিলেন, কিন্তু যুবক বলিয়া বসিল যে, আমি ঝাড়িয়া দিলেই সে আরোগ্য লাভ করিবে। চন্দ্র বাবুর বিশেষ অনুরোধে আমি তাহাকে ঝাড়িয়া দিলাম, সত্যই যুবকটি আরোগ্য লাভ করিল। এই কয়েকটি ঘটনা এইজন্য লিখিলাম যে, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, অধ্যাপক জগদীশ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সাধারণের অসাধারণ শ্রদ্ধাভাজন এবং ভগবানের কৃপায় ইঁহারা সকলেই এখনও জীবিত আছেন। *

আমাদের দেশে অলৌকিক শক্তি-সমূহের এতদূর বিকাশ হইয়াছিল যে, সামান্য ব্যক্তিও ঝাড়িয়া অনেক কঠিন রোগ দূর করিতে পারিত; কিন্তু এই সকল কার্য্য সমস্তই একান্ত প্রবঞ্চনা ও কু-সংস্কার-দূষিত বলিয়া উপেক্ষিত ও নিন্দিত হইতেছিল। এখন য়ুরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতমণ্ডলী এই সকল শক্তির চর্চ্চায় মনোযোগী হওয়ায় ইহার স্বপক্ষে এদেশে সাহস করিয়া দুই একটি কথা বলা যায়। আমার এতটা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, যদি কোন ডাকাত আমাকে কাটিবার জন্য তলোয়ার উত্তোলন করে, তবে আমি সজোরে যদি বলি "থামো", তৎক্ষণাৎ ডাকাতের হস্ত অর্দ্ধপথে থামিয়া যাইবে। সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার এম্, ডি, এবং সুপ্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতি অনেকে আমার তখনকার ইচ্ছাশক্তির কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

* দুঃখের বিষয়, চন্দ্র বাবু সংপ্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু তখনকার গয়ার পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় এখনও ৺কাশীধামে টেঁড়ানিম নামক স্থানে বাস করিতেছেন, তিনি এই ঘটনা জানেন।

মনোরমার জীবন-চিত্র

ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক সু-প্রসিদ্ধ বক্তা ও সু-লেখক শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্র-নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র গণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (ডাক নাম গনু) পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া বহুকাল চলচ্ছক্তিরহিত হইয়াছিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তাহাকে একস্থান হইতে সরিতে হইলে কচ্ছপের মতন চারি হাত-পায়ের উপর ভর করিয়া নড়িতে হইত, তাহার বয়স তখন ২৫।২৬ বৎসর। শ্রীমান্ রেবতীমোহন সেন এবং আমি একদিন গোয়াবাগানে প্রচারক চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী গিয়াছিলাম। আমরা তিন জনায় মিলিয়া বাহিরের ঘরে কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় গনু কচ্ছপের মতন থপ্‌থপ্ করিয়া আমাদের ঘরে প্রবেশ করিল এবং হাত-যোড় করিয়া সজল-নয়নে আমাকে বলিল, "আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমি দাঁড়াইবার শক্তি হারাইয়াছি।" তৎক্ষণাৎ তরতর বেগে আমার মধ্যে শক্তির আবির্ভাব হইল, আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এবং গনুর মাকে (তিনি পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন) ঘর হইতে বাহিরে যাইতে বলিলাম, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। শ্রীমান্ রেবতীমোহন আমার কাছেই রহিলেন। আমি গনুর হাত ধরিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে বলিলাম, যুবক তখনই আমার হাত ধরিয়া দাঁড়াইল, আমি তাহার হাতে একখানা লাঠি দিয়া বলিলাম, "এই লাঠি ধরিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া যাও।" সে তখনই লাঠি ভর করিয়া চলিয়া গেল। আমরা সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইলাম। প্রচারক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "এরূপ অদ্ভুত মিরাকেল (miracle) আমি কখনই দেখি নাই।" সেই দিন হইতে গনু যতকাল বাঁচিয়াছিল, সর্ব্বদাই সে লাঠি

ভর করিয়া ভ্রমণ করিত। এ ঘটনা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অনেকেই জানেন।

সুকিয়া ষ্ট্রীটের সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম, বি, মহাশয়ের আঙ্গুলে ছুরীর আঘাত লাগিয়া বিষাক্ত ঘা হইয়াছিল, আঙ্গুলের যাতনায় তিনি নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। মর্ফিয়া ইন্‌জেক্ট্‌ করিয়াও কোন ফল দর্শিত না, আমি যাইয়া ঝাড়িয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া আসিতাম।

এরূপ কত শত শত ঘটনা হইয়াছে, তাহার হিসাব নাই। এই সময় ইচ্ছা হইলে লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতাম এবং সহস্র সহস্র লোককে শিষ্য করিতে পারিতাম। আমার এইরূপ ক্ষমতা দেখিয়া কত কত বড়লোক আমার নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীগুরুদেব আমাকে কিরূপ সু-কঠিন পরীক্ষায় ফেলিয়াছিলেন। যদি গোস্বামী মহাশয় আমার গুরু ও মনোরমা আমার গৃহিণী না হইতেন, তাহা হইলে অর্থোপার্জ্জনের এরূপ সুযোগ থাকিতে বিষম দরিদ্রতার মধ্যে এই বিষম পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম কি না, ঘোর সন্দেহের বিষয় ছিল।

একদিন একটি হৃষ্টপুষ্ট-দেহ সম্ভ্রান্ত মুসলমান আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং আমাকে সেলাম করিয়া একখানা কার্ড দিলেন। কার্ডখানি দেখিয়া জানিলাম, তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের দেওয়ান মৌলবী ফজলে রব্বি খান্ বাহাদুর। স্বয়ং নবাব বাহাদুর পক্ষাঘাত-রোগে পীড়িত, তাঁহার চিকিৎসায় লক্ষাধিক টাকা

ব্যয়িত হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকারের চিকিৎসকগণ এবং সাধু, ফকির, কত লোক যে তাঁহাকে দেখিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নানাপ্রকার লোক সহস্র সহস্র টাকা নিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই উপকার হয় নাই। আমাকে দেখাইবার জন্য নবাব সাহেব ব্যস্ত হইয়াছেন এবং খোদ দেওয়ান সাহেবকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। খান বাহাদুর আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার অর্থ এই যে, কত টাকা হইলে আমি মুর্শিদাবাদ যাইয়া নবাব সাহেবকে দেখিতে প্রস্তুত আছি? যদি আমি বলিতাম যে, দশ হাজার টাকা দিতে হইবে, তিনি তাহাতে কিছু-মাত্র বিচলিত হইতেন না, কিন্তু আমি যখন বলিলাম যে, এই সকল কার্য্যে আমি অর্থ গ্রহণ করি না, তখন তিনি বড়ই বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন যে, তবে তিনি কিরূপে আমাকে পাইতে পারেন? আমি বলিলাম যে, আমি সম্প্রতি যাইতে পারিব না, যে দিন আমার ইচ্ছা হইবে, সেই দিন যাইব। তিনি আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং মুর্শিদাবাদ যাইয়া টেলিগ্রাফিক্ মনি-অর্ডারে প্রথম শ্রেণীতে যাওয়ার উপযুক্ত পাথেয় পাঠাইয়া দিলেন। তখন আজিমগঞ্জ হইয়া ষ্টীমারে মুর্শিদাবাদ যাইতে হইত।

আমি যখন নিজের টাকায় ১ম শ্রেণীতে যাতায়াত করি না, তখন অন্যের টাকায় প্রথম শ্রেণীতে কেন যাইব, ইহা ভাবিয়া আমি পরম প্রীতিভাজন শ্রীমান্ রেবতীমোহন সেনকে সঙ্গে লইয়া মধ্য-শ্রেণীতে মুর্শিদাবাদ গেলাম। বলা বাহুল্য যে, আমরা সেখানে সাদরে অভ্যর্থিত হইলাম।

নবাব বাহাদুরের প্রাইভেট্ সেক্রেটরী জানকী বাবুর বাড়ীতে

আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু আমরা সেখানে না থাকিয়া নশীপুরে ডাক্তার জানকী বাবুর বাড়ী অতিথি হইলাম। নবাব বাহাদুরের গাড়ী আমাদিগকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিল। ডাক্তার জানকী বাবু তাঁহার বাড়ীর দরজায় নবাবের গাড়ী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, হয় ত ভাবিয়াছিলেন, কোন বড়লোক আসিয়াছেন, কিন্তু আমাকে ও শ্রীমান্ রেবতীকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন। আমরা আমাদের আগমনের কারণ তাঁহাকে বলিলাম। (রেবতীমোহন কলিকাতার মূকবধির বিদ্যালয়ের সুযোগ্য শিক্ষক এবং "নলদময়ন্তী," "বালক শ্রীকৃষ্ণ," "হাসন হোসন" এবং "দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা।) ডাক্তার জানকী বাবু শ্রীশ্রীগুরুদেবের বন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও শ্যালিকা আমাদের গুরু-ভগিনী, তাঁহার জামাতা শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ সেন (এখন নসীপুরের মহারাজার দেওয়ান) আমাদের বিশেষ স্নেহ-ভাজন। বলা বাহুল্য যে, এই বাড়ীতে আমরা আপন বাড়ীর মতন অসঙ্কোচে বাস করিয়াছিলাম।

বিকালে নবাবের গাড়ী আমাদিগকে নেওয়ার জন্য আসিল, আমি মৌলবী ফজলে রব্বি সাহেবকে বলিলাম যে, নবাব বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করিতে যে সকল কায়দা-কানুনের দরকার, আমি তাহার কিছুই জানি না। তিনি নবাব বাহাদুরের নিকট যাইয়া আমার আগমন-বার্ত্তা দিলেন। নবাব বলিলেন, "তাঁহার জন্য কোন কায়দা-কানুনের দরকার নাই।" বস্তুতঃ নবাব তখন আর্ত্ত এবং আমি নিঃস্বার্থভাবে তাঁহার উপকার করিতে গিয়াছি, আমাকে দেখিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়াছেন,

এরূপ অবস্থায় মান-অভিমানের ভাবই তাঁহার মনে আসিতে পারে না। আমি গৃহে প্রবেশ করামাত্র তিনি সেলাম করিলেন, আমি আগে সেলাম করার অবসর পাইলাম না। আমার সঙ্গে আমার একটি বন্ধু আছেন বলায় তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি করিলেন। নবাব সাহেব ইঙ্গিত করিয়া আমাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন; আমরা সেলাম করিয়া আসনে বসিলাম। মাঝিলা নবাব (নবাব বাহাদুরের ভ্রাতা) একটি ডিবি খুলিয়া মূল্যবান্ পানের খিলি নিজ হাতে আমাদের কাছে ধরিলেন, আমরা উহা গ্রহণ করিলাম না। বোধ হয়, এই ব্যবহারটি একটু বিসদৃশ হইয়াছিল, অন্ততঃ সেলাম করিয়া একটি পান হাতে লওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এ সকল আদব-কায়দা আমরা জানিতাম না। আমাদের সাধন-প্রণালীতে এঁটো খাওয়া নিষেধ, কোন হিন্দুর বাড়ীর তৈয়ারী পানও বিশেষ না জানিয়া আমরা খাই না। শুনিয়াছি, নবাব-বাড়ীর পানে মুক্তা পোড়াইয়া চূণ দেওয়া হয়, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব পানের আস্বাদ-গ্রহণ আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না।

আমরা পান গ্রহণ না করায়, অন্ততঃ হাতে না লওয়ায় বোধ হয় অসভ্যতা হইয়াছিল। যে নবাব-পরিবারের নিকট পান পাইলে দেশীয় রাজগণ আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন, সেই পরিবারের নবাব-জাদার প্রদত্ত পান, অতি সামান্য ব্যক্তি হইয়াও আমরা প্রত্যাখ্যান করিলাম। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কেহ এরূপ কার্য্য করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইত।

আমরা ৩।৪ দিন সেখানে ছিলাম। দুই বেলাই নবাব সাহেবের গাড়ী আমাদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইত। একদিন আমি

তাঁহাকে ঝাড়িয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ কোন উপকার হইবে, তাহা আমার মনে হইল না। কতকগুলি বিশেষ প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছিল, নবাব বাহাদুর আমার নিয়মের অধীন হইতে পারিলেন না, আমিও আমার ভিতরে বিশেষ শক্তি অনুভব করিলাম না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অনুরোধ উপরোধে আমি কখনও কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারি নাই, যখন শক্তির আবির্ভাব হইত, তখন সম্মুখে যে রোগী উপস্থিত হইত, তাহারই উপকার হইত। ইচ্ছা-শক্তিকে ঔষধের মতন যখন তখন ব্যবহার করা যায় না। আর নবাব বাহাদুরও এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা যে ব্যক্তি ইষ্ট করিতে পারে, সে অনিষ্টও করিতে পারে। নবাবদিগের এরূপ সংশয় অস্বাভাবিক নহে।

যাহা হউক, আমরা যে কয়দিন ছিলাম, আদরের সহিত গৃহীত হইতাম। নবাব সাহেবের কোন জাঁক-জমক দেখি নাই। তাঁহার বিনয়-নম্র চরিত্র ও সাধারণ পোষাক-পরিচ্ছদের সহিত "নবাবী" শব্দটার কিছুমাত্র সম্পর্ক দেখিতে পাই নাই। একদিন বৈকালিক আহারের সময় উপস্থিত হইলে আমরা সে স্থান হইতে উঠিয়া যাইতে উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় নবাব বলিলেন, যদি আমাদের আপত্তি না থাকে, তবে আমরা সেখানে থাকিতে পারি। নবাব কি আহার করেন, দেখিতে আমার কুতূহল জন্মিল, সুতরাং আমরা সেখানেই বসিয়া রহিলাম, দেখিলাম, তাঁহার আহারেও কিছুমাত্র "নবাবী" নাই।

তৃতীয় দিবসে আমি দেওয়ান বাহাদুরকে জানাইলাম যে, আমার

সেখানে আর বিলম্ব করা অনাবশ্যক, আমার দ্বারা কোন কার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। নবাব সাহেবের নিকটও বিদায় গ্রহণ করিলাম।

বিষম সমস্যা

দেওয়ান সাহেব আমার হাতে ৩৫৲টি টাকা দিলেন। আমাদের ২০ টাকার অধিক পাথেয় লাগিবে না, তিনি যে কি হিসাবে ৩৫৲ টাকা দিলেন, তাহা বুঝিলাম না। যদি টাকা লইয়া রোগী দেখার ইচ্ছা থাকিত, তবে অন্ততঃ কয়েক হাজার টাকা অগ্রিম লইতে পারিতাম, যখন তাহা লওয়া হয় নাই, তখন ১৫৲ টাকা অতিরিক্ত কিরূপে লইব? ইহাতে যে অতিশয় ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পাইবে, তাহা বুঝিতেছিলাম; কিন্তু যখন আমাকে শ্রীশ্রীগুরুদেব ব্রত দিয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন, "কাহারও নিকট কিছু চাহিবে না এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক কেহ কিছু প্রদান করিলে তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে না।" প্রথম ব্রতটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি পালন করা অধিকতর কষ্টজনক হইয়া উঠিল। অভিমান বলিতে লাগিল, "যথার্থ ভাড়ার টাকাটা রাখিয়া বাকি টাকা কয়টি ফিরাইয়া দাও।" কিন্তু তখনই ব্রত বলিল যে, "অভিমানের কথা শুনিও না, তোমার অভিমান নষ্ট করিবার জন্যই গুরু তোমাকে এই ব্রত দিয়াছেন।" বস্তুতঃ টাকা ফিরাইয়া দেওয়া অপেক্ষা টাকা গ্রহণ করা যে কঠোরতর কর্ত্তব্য, তাহা সে দিন ভাল করিয়া বুঝিলাম। তথাপি অভিমান

খোঁচাইতেছিল, বলিতেছিল, 'এই কয়টা সামান্য টাকা তুমি বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করায় ইহারা কি মনে ভাবিল? ছিঃ ছিঃ! ইহাদের নিকট এত ছোট হইতে গেলে কেন?'

অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, এ সকল কাজের সঙ্গে মনোরমার জীবন-চিত্রের সম্পর্ক কি? এগুলি এতটা বিশেষভাবে লেখার এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন কি? কথা এই যে, একটি সুদরিদ্র পরিবারে এইরূপ প্রলোভনের মধ্যে মনোরমার মতন গৃহিণী না হইলে ধর্ম্মকে ঠিক রাখা একরূপ অসম্ভব হইত। তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত অথচ অনুরাগযুক্ত হইয়া সংসার করিয়াছেন, তাঁর সেই পবিত্রতা ও ত্যাগের মহিমায় স্বামীর সর্ব্বপ্রকারের হীনতা বা স্বার্থপরতা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। জীবনের প্রত্যেক অবস্থায়ই তিনি তাঁহার স্বাভাবিক মহত্ত্বে আমাকে তুলিয়া ধরিয়াছেন, ডুবিতে অবসর দেন নাই। আমার ইচ্ছা-শক্তির প্রভাব হইতেও তিনি আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। নিজের ত কথাই নাই, যদি সন্তানদিগকে একখানি ভাল কাপড় দিতে কিংবা কন্যাদিগকে দুগাছি বালা দিতে তাঁহার ইচ্ছা ব্যক্ত হইত, তবেই আমি একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতাম। এই কথাটি বুঝাইবার জন্যই আমার ইচ্ছাশক্তির কার্য্য সম্বন্ধে এত কথা বলিতে হইল।

ইচ্ছাশক্তির এই সকল কার্য্যকে সচরাচর লোকেরা ধর্ম্মের সঙ্গে মিলাইয়া লয়, এজন্য আমি সর্ব্বদাই লোককে বুঝাইয়া দিতাম যে, এই শক্তির সঙ্গে ধর্ম্মের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। ঈশ্বরকে ত আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু আমার গৃহমধ্যে এমন দুইটী জাগ্রত চক্ষু ছিল যে,

কোনও প্রকার স্বার্থপরতা কিম্বা কপটতা আমার মনে প্রবেশ লাভ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত।

"কখনো বিপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি, সরমে সে হয় সারা"

আমি এই তত্ত্বটী মানুষ দিয়া বুঝিয়াছিলাম।

সতীশচন্দ্র

একদিন মনোরমা ধ্যানে বসিয়াছেন এমন সময় ভবানীপুরের যুবক ব্রাহ্ম শ্রীমান্ লক্ষ্মীচন্দ্র সাহা একটী ভদ্রলোককে লইয়া আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোকটীর পরিচয় পাইয়া জানিলাম যে, তাঁহার নাম শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি একজন এম্, এ, বি, এল্। অল্প বয়সে বহরমপুরে হেড্ মাষ্টার ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। পরে হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন এবং অল্পদিন পরেই ওকালতী পরিত্যাগ করিয়া নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে মিশিতে ছিলেন। সতীশ বাবু সুশ্রী যুবা পুরুষ, কুলীন ব্রাহ্মণ এবং সুপণ্ডিত। অনেক ধনীলোক তাঁহাকে কন্যাদানের জন্য আকিঞ্চন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি দার পরিগ্রহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। ইঁহার পিতা কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হাইকোর্টের অনুবাদক। কৃষ্ণবাবু প্রত্যক্ষবাদী দলের একজন সভ্য কটন সাহেব ও স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

শ্রীমান্ লক্ষ্মীচন্দ্র সাহা মনোরমার সমাধির অবস্থার কথা জানিতেন, তিনি সতীশ বাবুকে সেই কথা বলিলেন, সতীশবাবু লক্ষ্মীর সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে একদিন সকাল-বেলায় উপস্থিত হইলেন। তখন মনোরমা ধ্যানস্থা; সুতরাং সেখানে যাইতে আপত্তি করা হইল না। সতীশবাবু সেই ধ্যানস্থা মূর্ত্তি দেখিয়া সেইখানে বসিয়া গেলেন, সারাদিন আর সেখান হইতে উঠিলেন না। এই সময় হইতে সতীশবাবু প্রায় প্রতিদিনই আমাদের বাড়ী আসিতে লাগিলেন।

তিন পয়সার নিমন্ত্রণ

একদিন আমার মাথায় বেজায় খেয়াল চাপিল। আমাদের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম-করণ করিতে হইবে। শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করা হইল, তিনি আমাদের বাসায় ভবানীপুরে আসিয়া উহার নাম রাখিবেন। তখন তিনি মৌনী।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের একমাত্র পুত্র, আমাদের গুরুপুত্র ও গুরুভ্রাতা উদারচেতা যোগজীবন গোস্বামীকে আমি বলিলাম যে, একটা পাগ্‌লামী করিব ভাবিয়াছি, কাল খোকার নামকরণ ও অন্নপ্রাশন করিব। ফকীররা যাহাকে "দেল-দরিয়া পুরুষ" বলেন, তাহা ছিলেন যোগজীবন গোস্বামী। মুক্তহস্ত, মুক্ত-হৃদয়, নির্ভীক, সদাব্রত, দানব্রত, অগাধ-হৃদয়, প্রেমিক যুবক। যোগজীবন বলিলেন, "বেশ ত, আমি সকলকে নিমন্ত্রণ করিব।" আমি বলিলাম, "যাহা তোমার ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার।"

সত্য-সত্যই যোগজীবন গোস্বামী সমস্ত গুরুভ্রাতাকে সপরিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। বালক-বালিকা লইয়া নিমন্ত্রিতের সংখ্যা শতাধিক হইবে।

আমার ভয় ও চিন্তা

দুপ্রহরের পরে সুকিয়াষ্ট্রীট হইতে বাড়ী আসিয়া মনোরমাকে সমস্ত বলিলাম, শুনিয়া তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। রাত্রি পোহাইলে যে কি বন্দোবস্ত হইবে, তার জন্য কিছুই ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন না। আমি কিন্তু ক্রমশঃ চিন্তায় কাতর হইতে লাগিলাম।

আমাদের বাড়ীর সিঁড়ি-ঘরের ছোট দোতলা কোটার দরজা বন্ধ করিয়া আমি মনে মনে চিন্তা করিতেছি যে, কাল যখন শ্রীগুরুদেব ৮।৯ টার সময় আসিবেন, তাঁহার সঙ্গে ২।৩ খানা গাড়ী আসিবে, ভাড়া কোথা হইতে দিব? যে সকল স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা আসিবেন, তাঁহাদের গাড়ী-ভাড়াও ত দেওয়া উচিত। কেননা, আমার পারিবারিক অনুষ্ঠানে সকলে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবেন। নিমন্ত্রিত নরনারীগণ সকলেই উপবাস করিবেন, বালক-বালিকাগণ কি খাইবে, শ্রীশ্রী গুরু-দেবকেও উপবাস করিতে হইবে, সে দিনকার খরচ বাদে আমার হাতে নগদ তিনটি মাত্র পয়সা ছিল। কি পাগ্‌লামী করিলাম! আমাকে লোকেরা পাগল মনে করিবে, সেজন্য ভাবিতেছি না, এখন ভাবনা হইয়াছে, সকলেই যে ক্লেশ পাইবে। আমি যতই ভাবিতেছি, ততই

চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িতেছি, কিন্তু মনোরমাকে মোটেই চিন্তিত দেখিতেছি না! শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশে তিনি আকাশবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার চিন্তা কি? আজ তাঁহার কথা ভাবিয়া একটি বাউল সঙ্গীত মনে পড়িল;—

"গুরুপদে ঠিক আছে যার, তার সুখের আর ভাবনা কি?
• সদানন্দে থাকে সে জন নিরানন্দের জানে কি?"

মনে মনে ব্রত ভাঙ্গা

এতদিন মনোরমার নির্ভর ও আমার অসমসাহসিকতা (গোঁয়ার-তামী) উভয় মিলিয়া মিশিয়া গৃহস্থালী করিয়া আসিতেছিল, আজ আমার সাহস পরাস্ত হইল। বালক-বালিকাগণকে লইয়া অর্দ্ধাশনে কিংবা অনশনে দিন কাটাইতে আমি ভীত বা বিচলিত হই নাই, কিন্তু আজিকার পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন। বালক-বালিকাসহ দুইশত নরনারী নিমন্ত্রিত; কিন্তু তাহাদের সেবার জন্য তিন পয়সার অধিক সঞ্চিত নাই, এবং কাহারও নিকট ধার চাইতে কিংবা অভাব জানাইতে অধিকার নাই।

যতই বেলা অবসান হইতেছিল, ততই আমার চিত্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। আমি মনে মনে কল্পনা করিতেছিলাম যে, গুরুদেবের প্রদত্ত ব্রত কাল প্রভাতেই ভঙ্গ করিতে হইবে। বাড়ীর সম্মুখে যে মুদী দোকান আছে, সেই দোকান হইতে কিছু চাউল, ডাইল, মসল্লা,

তৈল ও ঘৃত ধার করিয়া আনিব, তাহাতে একটা খিচুড়ী হইবে এবং উমাচরণবাবুর নিকট হইতে কয়েকটি টাকা চাহিয়া লইয়া যথাসাধ্য সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিব।

নিরুপায়ের উপায়

যখন এইরূপ কল্পনা দ্বারা আমার নির্ভরের দর্প একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল, সেই দর্পাবসান ও বেলাবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমার গৃহের রুদ্ধ দ্বারে মৃদু মৃদু আঘাত পড়িল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে ?" উত্তর পাইলাম না, কিন্তু আবার মৃদু মৃদু আঘাতের ধ্বনি শুনিলাম। আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হওয়ায় একটু বিরক্ত হইয়া আমি দরজা খুলিয়া দিলাম এবং দেখিলাম, সহাস্যমুখে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছেন। আমার মনের অবস্থা ও চাঞ্চল্য তিনি অনায়াসে বুঝিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিশ্চিন্ত ও অবিচলিত ভাব আজ আমি ষোল আনা সহ্য করিতে পারিতেছিলাম না। আমার মনে হইতেছিল, যেন তিনি আমা হইতে অনেক দূরে বাস করিতেছেন। আমার এইরূপ ভাবনা-চিন্তার সময় আমার সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইতেছেন না, তিনি সেই ঠিক্ ঠিক্ নিত্যকার মানুষই রহিয়াছেন। আমি পাগ্‌লামী করিতে গিয়া এখন কাতর হইয়া পড়িয়াছি। দরজা খুলিয়া তাঁহার প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া আমি বলিলাম, "হাসিবার কি হইল ? আমি যে ভাবিয়া মরিতেছি।" তিনি বলিলেন, "উমাচরণবাবুর স্ত্রী আসিয়া অতি বিনীতভাবে এই

প্রার্থনা জানাইয়াছেন যে, কাল খোকার অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণের সমস্ত মিঠাই-মিষ্টান্ন তিনি দিতে ইচ্ছা করেন, এ বিষয়ে তোমার মত জানিবার জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছেন।" কথাটা বলিয়াই মনোরমা খুব হাসিয়া ফেলিলেন, সে হাসির অর্থ এই যে, নিমন্ত্রণে ত সমারোহ খুবই, খাওয়াইবার সংগ্রহ বা ব্যবস্থা নাই, তাহাতে মিষ্টান্নের সংস্থান যে হইল, ইহাই যথেষ্ট। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার বোধ হইল যেন, আমার মাথার পাষাণ নামিয়া গেল। ভাবিলাম, একেবারে অনাহার অপেক্ষা জলযোগের বন্দোবস্ত অনেক ভাল।

উৎসব-দিনে

রাত্রি প্রভাত হইল। আজি নিমন্ত্রণের দিন। বেলা ৭টা অবধি কিছুমাত্র আয়োজন নাই। কাল যে ধার করার কল্পনা করিয়াছিলাম, অযাচিতরূপে মিঠাই-মিষ্টান্নের সংস্থান হওয়ায় আজ সে সংকল্প তিরোহিত হইয়াছে। ভগবানের লীলার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া আজ আবার প্রাণে নির্ভরের ভাব আসিয়াছে, ভাবিলাম, যা হবার তাই হবে, আমি আর কর্ত্তৃত্ব করিব না। সংসার ত আমার নয়, ইহা মনোরমার সংসার, তাঁহার ত পূর্ণ নির্ভরের ভাব রহিয়াছে, আমি কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইয়া কাল কতই না ক্লেশ পাইয়াছি, আজ আর কিছুই ভাবিব না।

বেলা প্রায় ৮টা, এমন সময় আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ গুরু-ভ্রাতা

শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস মহাশয় আসিয়া একখানা কুড়ি টাকার নোট দিয়া বলিলেন, "আপনার কোন বন্ধু খোকার নাম-করণ উপলক্ষে এই কুড়ি টাকা যৌতুক দিয়াছেন।" আমি সেই দাতা বন্ধুর নাম জিজ্ঞাসা করিলাম না, কেননা, যেখান হইতে যাহা কিছু আসে, সমস্তই আমি একজনার দান বলিয়া গ্রহণ করিতাম। কুড়ি টাকা পাইয়া তাহার কতক লইয়া শ্রীমান্ রেবতীমোহন ও বেণীমাধব বাজার করিতে চলিলেন। এই সময় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় দশটী টাকা দিয়া বলিলেন যে, এই দশ টাকার দুধে পরমান্ন প্রস্তুত হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীগুরুদেব প্রায় ৯টার সময় আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে অনেকে আসিলেন। বিশ্বাস মহাশয়ের প্রদত্ত টাকা হইতে গাড়ীভাড়া দেওয়া হইল। গুরুদেবের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসমাগমে বাহির-বাড়ী ভরিয়া গেল।

বেলা ৯টার পরে খুলনার মহেশ্বরপাশা গ্রাম হইতে স্নেহ-ভাজন ৺মেঘনাথ মজুমদার পাঁচ সের বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত লইয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি আমাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। নিজ বাড়ীতে গাই দোয়াইয়া দধি করিয়া আমার জন্য এই ঘৃত প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন, আজ যে আমাদের বাড়ীতে কোন উৎসব হইবে, তাহা ইনি জানিতেন না।

তখন আমার ভগিনী-পতি বরিশাল নরোত্তমপুরনিবাসী বদান্যবর ৺দ্বারিকানাথ রায় মহাশয় মাতলার পোর্টক্যানিং কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলেন, তাঁহার সদর আফিস ছিল সাহেবের আবাদ

অথবা মিনাখাঁ। আমার দিদিও সেখানে থাকিতেন। তিনি যখনই কলিকাতায় আসিতেন, তখন বোটে ভরিয়া নানা প্রকারের জিনিস-পত্র লইয়া আসিতেন এবং আত্মীয়স্বজনদিগের মধ্যে উহা বিতরণ করিতেন। এবারে দিদির সঙ্গে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে প্রায় দুইমণ ঘরে-পাতা দই ছিল। দিদি যে একবারে দৈবাৎ আজ উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা নয়, আজ যে খোকার অন্নপ্রাশন হইবে, এরূপ সম্ভাবনা তিনি জানিতেন, কিন্তু এজন্য তাঁহাকে আসিতে লেখা হয় নাই, কেন না, এই নামকরণ বা অন্নপ্রাশনে কোন সমারোহ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। দিদি যখন আসিলেন, তখন আর কিছুরই অপ্রতুল রহিল না। আমাদের বাড়ীর একটি যুবক স্বভাব-সরল ৺ললিতকুমার গুহ ঠাকুরতা, সম্পর্কে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, আমার ভগিনী-পতির অধীনে নায়েবী কার্য্য করিত, সেও দিদির সঙ্গে আসিল এবং খোকার জন্য একটি মূল্যবান্ পরিচ্ছদ ও মুকুট কিনিয়া আনিল।

শ্রীশ্রীগুরুদেব কালীদর্শন করিতে কালীঘাটে গেলেন। সেই সঙ্গে একটি তান্ত্রিক সাধু আসিয়াছিলেন। তিনি নানাপ্রকারের আসন দেখাইলেন, সে সকল দেখিতে অতি চমৎকার। তিনি কারণ (মদ্য) দ্বারা নিবেদন না করিয়া আহার করেন না, সুতরাং তাঁহার জন্য কারণ আনিয়া দিতে গুরুদেব পণ্ডিত মহাশয়কে আদেশ করিয়াছিলেন এবং আমার বাড়ীর পয়সা দিয়া উহা খরিদ করা না হয়, তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনা লইয়া নিমন্ত্রিত কয়েকটি ব্রাহ্ম যুবক বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীগুরুদেব

কি ভাবে কিরূপ অবস্থায় এরূপ করিলেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই।*

বাহির-বাড়ীতে ভবানীপুরের প্রবীণ-বয়স্ক বহু ধর্ম্মার্থী লোক, মধুলুব্ধ মক্ষিকার ন্যায় গোঁসাইজীকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন, সেখানে লোকের ভিড় হইয়াছে। বাড়ীর মধ্যে বহু মহিলা ও বালক-বালিকাগণের সমাগমে বাড়ীটী উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছে। দিদির একান্ত আগ্রহে ঢোল ও টিকারা সহযোগে শানাইয়ের সু-মধুর রব উঠিয়া উৎসবটিকে পূর্ণাঙ্গতা প্রদান করিয়াছে।

বেলা ১১ টার পরে শ্রীশ্রীগুরুদেব বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শ্রীমান্ রেবতীমোহনের সু-মধুর কণ্ঠ, ভাবে ভারি হইয়া খোল-করতালের সহযোগে গৃহ পরিপূর্ণ করিল, অন্যান্য অনেক গায়ক তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী সেই দিন আমরা প্রথম শুনিলাম।

* ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য ও আদর্শ পুরুষ, যাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ মহর্ষি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন—সেই দেবেন্দ্রনাথ যখন সাধক অবস্থায় নৌকাযোগে পশ্চিমে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। তিনি উক্ত তান্ত্রিককে নিজের নৌকায় নিয়া আসেন এবং আহারের সময় মদ্য আনয়ন করিয়া উক্ত সন্ন্যাসীকে পান করিতে দেন। এই কথা তিনি তাঁহার জীবন-বৃত্তান্তে নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন, অথচ তিনিই বলিয়াছেন, "মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যম্।" মহৎ ব্যক্তিরা সর্ব্বত্রই "সামান্য বিধি" ও "বিশেষ বিধি" অবলম্বন করিয়া কার্য্য করেন, সাধারণ লোক তাহাতে বিচলিত হইবে আশ্চর্য্য কি?

গান। *

"তব শুভ সম্মিলনে প্রাণ জুড়াব হৃদয়-স্বামী।
কবে বসিব একান্তে প্রাণকান্ত তোমায় লয়ে আমি!
মধুর বৃন্দাবনে, গোপীজনগণ সনে,
(তব) নিত্যপদ সেবি প্রভু কৃতার্থ হইব আমি।
(কবে) অখিল লীলা-রসে ডুবাব মানস হে,
(আমি) সকলই ভুলিব কেবল হৃদয়ে জাগিবে তুমি।
হৃদযে ধরি শ্রীপদ, বিপদ ঘুচাব হে
(আমার) পাপ-তাপ দূরে যাবে জুড়াবে তাপিত প্রাণী।
পিরিতের শেজ, হৃদয়ে বিছাব হে,
রসে মেশামেশি হয়ে (হব) তুমি আমি, আমি তুমি॥

সঙ্গীতটি এমনই জমিয়া গিয়াছিল যে, এক ঘণ্টার অধিক কাল শ্রীশ্রীগুরুদেব এই সঙ্গীতের সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ নানাভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই কীর্ত্তনে ও সেই নৃত্যে উপস্থিত নর-নারীগণের চক্ষু-কর্ণ এরূপভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাঁহাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ একেবারে চেষ্টাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। তখন মনে হইতেছিল, যেন সমস্ত বাড়ীটি অমৃতসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে এবং উপস্থিত নরনারীগণ সেই সুধা-সাগরের হিল্লোলে ডুবিয়া, ভাসিয়া, সাঁতারিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

* সুবিখ্যাত বৈষ্ণব কবি ৺কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল গোস্বামী (ডাক নাম নেপাল গোঁসাই) মহাশয় এই সুমধুর সঙ্গীতটির রচয়িতা। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত-পুস্তকে ইহার কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্জ্জিত করিয়া গৃহীত হইয়াছে।

সে আনন্দের বিরাম কাহারও বাঞ্ছনীয় ছিল না; কিন্তু হঠাৎ গুরুদেব নৃত্যে ভঙ্গ দিয়া সিলেটে লিখিয়া দিলেন যে, এখন নামকরণ করিতে হইবে। তখনই গান-বাদ্য বন্ধ হইল, শিশুটিকে কাছে কি কোলে বসাইয়া তাহার মুখে পরমান্ন প্রদান করিলেন এবং সিলেটে নাম লিখিয়া দিলেন ঃ—"দেবরঞ্জন।"

বালকের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ হইয়া গেলে বাদ্যধ্বনি ও উলুধ্বনিতে সেই আশ্রম সদৃশ ভবনটি মুখরিত হইয়া উঠিল। ইহার পরে স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক-বালিকা সর্ব্বসমেত প্রায় তিনশত লোক পরিপাটীরূপে আনন্দে আহার করিলেন। জিনিসপত্র অনেক বাঁচিয়া গেল। সে সমস্ত কাঙ্গালীদিগকে দেওয়া হইল। যে সকল ভদ্রলোক রবাহূত হইয়া গুরুদেবকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, অনুরোধ করামাত্র তাঁহারাও আসনে বসিয়া গেলেন এবং আনন্দের সহিত আহার করিলেন। শ্রীশ্রীগুরুদেবের উপস্থিতিতে সকলের চিত্তই অভিমানহীন ও সঙ্কোচশূন্য হইয়াছিল।

যাঁহার কৃপায় তিন পয়সা মাত্র সম্বল লইয়া এই উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল, তাঁহার শ্রীচরণে কোটী কোটী প্রণিপাত করি।

সতীশচন্দ্রের চাকুরী গ্রহণ

সতীশ বাবু মনোরমার ধ্যানের সময় প্রায়শঃ তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিতেন। সমাধির অবস্থার কথা তিনি শাস্ত্রে পড়িয়াছিলেন; কিন্তু সে অবস্থাটি পূর্ব্বে কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাই মনোরমার

অবস্থা দেখিয়া তিনি শাস্ত্রীয় তত্ত্বের একটি প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দিত হইলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই সতীশ বাবু আমাদের আত্মীয়মধ্যে পরিগণিত হইলেন। তিনি মনোরমাকে "মা" বলিতেন, কিন্তু তাঁহাকে সাক্ষাৎ-ভাবে "মা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন না। আমাদের বালকগণকে তিনি ভ্রাতার মত দেখিতেন; তাহারাও তাঁহাকে খুব ভালবাসিত। আমাদের ৩ বৎসরের পুত্র যোগরঞ্জন সতীশ বাবুকে এতই ভালবাসিত যে, "নিতাই চৈতন্য বল" গানের সঙ্গে "সতীশ মুখোয্যা বল" জুড়িয়া দিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিত।

আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় সতীশ বাবু আমাদের সংসারের অবস্থা ও অযাচকবৃত্তির বিষয় জানিতে পারিলেন এবং কিরূপে তিনি মনোরমার সংসারের সাহায্য করিতে পারেন, এই চিন্তায় আকুল হইলেন। তিনি যে আমাদিগকে সু-দরিদ্র জানিয়া দয়া করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তাহা নহে, তাঁহার মনের ভাব এইরূপ ছিল যে, যাহাতে কোন প্রকারের সাংসারিক অভাব মনোরমার সাধন-বিঘ্ন জন্মাইতে না পারে, তদ্বিষয়ে তিনি যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিবেন। তিনি যে এই সকল চিন্তা করিতেছিলেন, তাহা আমরা কেহ কল্পনাও করিতে পারি নাই। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন যে, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পরামর্শে তিনি একটি চাকুরী গ্রহণ করিয়াছেন। সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন দুই ঘণ্টা করিয়া ভবানীপুর সাউথ্ সুবার্ব্বন স্কুলে পড়াইবেন, মাসিক ৬০৲ টাকা বেতন পাইবেন।

আমি তাঁহার চাকুরীর কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, এরূপ চাকুরী গ্রহণের প্রয়োজন কি? তিনি অতি সঙ্কোচের সহিত আমাকে জানাইলেন যে, সাংসারিক নানা প্রকারের কাজের মধ্যে পড়িয়া পাছে মনোরমার ধ্যান-ধারণায় ব্যাঘাত জন্মে, এই জন্য তাঁহার সেবা করার অভিপ্রায়ে তিনি এই কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। বেতনের ৬০৲ টাকার এক কপর্দ্দকও তিনি নিজে ব্যয় করিবেন না। সমস্তটাই আমাদিগের সংসার-খরচের জন্য দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সতীশ বাবু বলেন যে, মনোরমার অবস্থা দেখিয়া তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কোনও প্রকার দুরবস্থার মধ্যে পড়িয়া মনোরমার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটার সম্ভাবনা নাই, তবে অবকাশের অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা আছে—এইমাত্র।

সতীশ বাবুর কথা শুনিয়া আমি খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। যে ব্যক্তি বেশী বেতনের অধ্যাপকতা ছাড়িয়াছেন, উন্নতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও যিনি ওকালতী পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি একজনার সাধনার সাহায্য করার জন্য একটি ৬০৲ টাকা বেতনের চাকুরী গ্রহণ করিলেন, এরূপ কার্য্যের কল্পনা করাও কঠিন।

কোন ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া—কিছু প্রদান করিলে তাঁহাকে বাধা দিতে আমার অধিকার নাই, কাজেই সতীশ বাবুকে আমার বলিবার কিছুই রহিল না। মাসের পর মাস তিনি বেতন পাইয়াই সমগ্র ৬০৲টি টাকা আমাদের সংসারে দিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে শ্রীগুরুদেবের নিকট সতীশ বাবু দীক্ষা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি নিজকে এতই ছোট মনে করিতেন যে, গুরু-

দেবের কাছে দীক্ষা পাইবেন জানিয়া তাঁহার আনন্দের অবধি ছিল না।

সতীশ বাবু এক সময় সাধুসঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তখন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব দেহরক্ষা করিয়াছেন। সতীশ বাবু তাঁহার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (যিনি "ম" নাম স্বাক্ষর করিয়া "রামকৃষ্ণকথামৃত" লিখিয়াছেন এবং কথামৃতে যিনি "মাষ্টার" নামে পরিচিত) মহাশয়কে সাধু দেখাইবার জন্য বিশেষভাবে ধরিয়া বসিলেন। মহেন্দ্র বাবু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কম্বলীটোলার দিকে চলিলেন। সতীশ বাবু ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে বেলুড়ের মঠে লইয়া যাইবেন ; কিন্তু অন্য পথে চলায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা কোথায় যাইতেছেন ? মহেন্দ্র বাবু বলিলেন যে, আপনি সাধু দেখিতে চাহিয়াছেন, আমি এমন লোকের নিকট আপনাকে লইয়া যাইব, যিনি সত্য-সত্যই ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছেন। এইরূপে উভয় বন্ধু কম্বলীটোলায় পূজনীয় গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এতদিন সতীশবাবু নানাস্থানে ধর্ম্মলাভার্থ ঘুরিতেছিলেন, কিন্তু গোঁসাইজীর কথা আর তাঁহার মনে হয় নাই। মনোরমাকে সমাধির অবস্থায় দেখিয়া তিনি সেখানে তাঁহার বাঞ্ছনীয় অবস্থা দেখিতে পাইলেন এবং মনোরমার প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগুরুদেবের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি ও আকর্ষণ জন্মিল এবং বহুকাল পরে সেই বাঞ্ছিতের আশ্রয় লাভ করিলেন।

সতীশ বাবুর পিতা প্রথম প্রথম আমাদের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি হয় ত ভাবিতেন, তাঁহার বৈরাগী ছেলে আমাদের

সংসর্গে আরও বৈরাগী হইল। একদিন সতীশ বাবু নিমন্ত্রণ করিয়া মনোরমাকে তাঁহাদের বাড়ী নিয়াছিলেন; সেই হইতে তাঁহাদের পরিবারস্থ সকলেই আমাদের পক্ষপাতী হইলেন। সতীশবাবুর পিতা আমাকে এতই স্নেহ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার একটি নাতির সাংঘাতিক পীড়ায় আমাকে সারারাত্রি রোগীর কাছে বসাইয়া রাখিলেন এবং আমাকে প্রার্থনা করিতে বলিলেন। এ সকল ভাব তাঁহার পূর্ব্বে ছিল না। তিনি প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন। মনোরমাকে দেখিয়া সে বাড়ীর মেয়েরা বুঝিলেন, এই নির্ব্বাক্ এলোমেলো মেয়েটির মধ্যে সংসারের ভাব কিছুই নাই। কিছুদিনের মধ্যেই সতীশ বাবুর জননী, দুই ভগিনী, ভাগিনেয়গণ শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

যাঁর মুখে কথা নাই, অঙ্গে ভূষণ নাই, সাধুর বেশ নাই, যিনি জন্মে কখনও কাহাকেও উপদেশ দেন নাই, এমন কি, ধর্ম্মকথা কাহাকেও বলেন নাই; স্বামী, সন্তান ও আত্মীয়গণ লইয়া সংসার করিতেছেন, তাঁহারই আকর্ষণে ভবানীপুরে একটি ধর্ম্মার্থী দল গঠিত হইল। বোধ হয়, এই কার্য্যের জন্যই শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে ভবানীপুরে পাঠাইয়াছিলেন।

সতীশ বাবু আমাদিগকে কয়েকমাস সাহায্য করিলে একদিন মনোরমা আমাকে বলিলেন যে, সতীশ বাবু যে তাঁহার বেতনের সমস্ত টাকা আমাদিগকে দিতেছেন, ইহা আমার উচিত বোধ হইতেছে না।

সতীশ বাবুর দীক্ষান্তে শ্রীগুরুদেব সতীশ বাবুকে আদেশ করিলেন যে, যতদিন তাঁহার মাতা জীবিতা থাকেন, ততদিন তাঁহার বেতনের

সমস্ত টাকাই মাতাকে দিতে হইবে। যতদিন মাতা জীবিতা ছিলেন, ততদিন সতীশ বাবু গুরুদেবের আজ্ঞানুসারেই কার্য্য করিতেন। মাতার দেহত্যাগের পরে চাকুরী পরিত্যাগ করিলেন।

পদ্ম-পুকুর

কার্ত্তিকমাস হইতে আমাদের সেই আশ্রম সদৃশ ভবনে জ্বর-জ্বালা আরম্ভ হইল। মনোরমার এবং আমাদের তৃতীয় পুত্র চিত্তরঞ্জনের উগ্র জ্বর হইল। এই সময় আমার দিদি, তাঁহার পুত্রকন্যাগণ এবং বরিশালের স্ব-নামধন্য অশ্বিনীকুমারের সহোদরা ও তাঁহার সন্তানগণ আমাদের বাড়ীতে ছিলেন, ইনিও আমাদের গুরু-ভগিনী।

বিপদে স্থৈর্য্য

একদিন জ্বরের মধ্যে আমাদের ৩য় পুত্র শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জনের অকস্মাৎ এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইল যে, সকলেই বালকের শেষ অবস্থা মনে করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। আমার দিদি সহজেই অত্যন্ত কোমল-হৃদয়া, তিনি মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং ভাগিনেয়ী শ্রীমতী বসন্তকুমারী ও কুসুমকুমারী এবং আমাদের সন্তানগণ কাঁদিয়া আকুল হইল। বালক সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মুখ বাঁকা করিয়া

শ্বাস করিতেছিল, দেখিয়া স্পষ্টই মনে হইল, ঠিক যেন অন্তিমকাল উপস্থিত। সকলে কাঁদিয়া কাটিয়া তাহাকে শেষ বিদায় দিতেছিল।

মনোরমার তখন ১০৪ ডিগ্রী জ্বর। তিনি অন্য ঘরে শুইয়াছিলেন, ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিয়া তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া একেবারে চৌবাচ্চার নিকট চলিয়া গেলেন এবং একটি কলসী পূর্ণ করিয়া এক কলসী জল লইয়া আসিয়া আস্তে আস্তে বালকের মাথায় জল দিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া সকলেরই চক্ষু স্থির। তাঁহাতে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য নাই। ভাগলপুরে শ্রীমান্ নিত্যরঞ্জনকে মৃতপ্রায় বিছানায় দেখিয়াও যেরূপ অচঞ্চলভাবে কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছিলেন, আজি ঠিক সেইরূপই করিলেন। আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, কেন না, আমার মনে হইতেছিল, অনতিবিলম্বেই বালক তাহার শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে, এখন আর কোন চেষ্টা করা বৃথা।

সতীশ বাবু দৌড়াইয়া গিয়া ভবানীপুরের তখনকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার এম, বি, মহাশয়কে ডাকিয়া আনিলেন এবং নীলরতন বাবুর জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। নীলরতন বাবু অপরাহ্নে আসিলেন। রোগী-বালক তিন দিবারাত্রি অজ্ঞান অবস্থায় ছিল, পরে চেতনা ও ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিল।

স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র

এই সময় স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হইল। তিনি সতীশ বাবুর নিকট এবং তাঁহার পিতার নিকট আমার নাম শুনিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে দিন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সে দিনকার আমাদের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা শুনিলে পাঠক সহজে মিত্র মহাশয়কে চিনিতে পারিবেন।

প্রথম স্বাগত-সম্ভাষণ হইয়া গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "যে সকল সাধু-সন্ন্যাসী নির্জ্জনে ধ্যানমগ্ন থাকেন, তাঁহাদের দ্বারা জগতের কি কল্যাণ সাধিত হয়?"

তাঁহার প্রশ্নের মধ্যে এইরূপ একটি ভাব নিহিত ছিল যে, ঐ সকল সংসারত্যাগী ধ্যানমগ্ন ব্যক্তিদিগের দ্বারা সংসারের লোকের কিছুমাত্র উপকার হয় না; উঁহারা সংসারকে উপেক্ষা করিয়া শুধু আত্ম-সুখে মত্ত হইয়া আছেন।

আমি মান্যবর মিত্রমহাশয়কে বলিলাম যে, আমি তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি, উত্তর পাইলে আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব। তিনি আমাকে প্রশ্ন করিতে অনুমতি করিলেন।

মিত্র মহাশয়ের ন্যায় পদস্থ, সম্মানিত ও প্রবীণ-বয়স্ক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিতে আমার সেই বয়সে সঙ্কোচ হওয়া স্বাভাবিক ছিল; কিন্তু যাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষ হইয়া কথা বলিতে হইবে বলিয়া আমার সেরূপ সঙ্কোচ আসিল না। আমি বলিলাম,

"বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া যতদূর উচ্চ রাজকার্য্য ও রাজসম্মান লাভ করা সম্ভব, তাহা আপনি লাভ করিয়াছেন; ধন, মান, জাতি, কুল, যোগ্যপুত্র ও অনুগত পরিজন সকলই আপনার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, এই সমস্ত লইয়া আপনি শান্তিলাভ করিয়াছেন কি না?"

আমি ভাবিয়াছিলাম, আমার এইরূপ প্রশ্নে হয় ত তাঁহার অভিমানে আঘাত লাগিবে, তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া হয় ত এ কথার কোন উত্তরই প্রদান করিবেন না। কিন্তু আমার কথা সমাপ্ত হওয়া মাত্র তিনি অম্লান-বদনে বলিলেন, "না, আমি শান্তি লাভ করিতে পারি নাই।" তখন আমি বলিলাম, "আপনি যাহা ষোল আনা পাইয়া শান্তিলাভ করেন নাই, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিতরণ করিয়া কাহাকেও শান্তি দিবেন, এরূপ আশা করিতে পারেন না, কিন্তু আপনার মত ব্যক্তিগণ, যাঁহারা যথেষ্ট পাইয়াও শান্তিহারা হইয়া আছেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারাই শান্তিপথ দেখাইতে পারেন—যাঁহারা নির্জ্জনে ধ্যানস্থ হইয়া রহিয়াছেন। বুদ্ধদেব রাজপুত্র ছিলেন, তিনি জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া কতকগুলি দাতব্য চিকিৎসালয়, অবৈতনিক শিক্ষালয় ও অনাথাশ্রম অনায়াসে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন; কিন্তু সে সকল না করিয়া তিনি জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য ধ্যানস্থ হইতে গেলেন কেন? যাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহারা মানুষকে প্রকৃত শান্তিদান করিয়া থাকেন।"

আমি মনে করিয়াছিলাম, এ বিষয় লইয়া মিত্র মহাশয় তর্ক-বিতর্ক করিবেন, কিন্তু তাঁহার উত্তর শুনিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহাদিগকে (সাধুদিগকে) পাওয়া

যায় কোথায়?" তর্ক-বিতর্কের মুখে আমি এরূপ উত্তর কাহারও নিকট হইতে কখনও প্রাপ্ত হই নাই, এমন কি, প্রত্যাশাও করি নাই। এই আলোচনার পর হইতে তিনি আমাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। সতীশ বাবুর নিকট তিনি মনোরমার কথা শুনিয়া তাঁহাকে সমাধির অবস্থায় দেখিতে পারেন কি না, জানিতে চাহিলে সতীশ বাবু উত্তর করিলেন যে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবেন। মিত্র মহাশয় বলিলেন, "তুমি দেখিয়া আসিয়া আমাকে সমস্ত বিবরণ বলিবে।"

সতীশ বাবু ৮।১০ দিন মনোরমাকে যেরূপ অবস্থায় দেখিয়াছেন, তাহার বিবরণ মিত্র মহাশয়কে জ্ঞাপন করিলেন। তিনি পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, তাঁহার আর দেখিবার প্রয়োজন নাই, শাস্ত্রের সঙ্গে যখন মিলিয়া গিয়াছে, তখন আর সন্দেহের কারণ নাই।

আগন্তুক ঘটনা

যশোহর জেলার বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণ পৈতৃক বাসভূমি বিক্রয় করিয়া কাশীবাসী হইয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী এবং ১২ বৎসর-বয়স্ক একটি পুত্র-সন্তান ছিল। হাতের টাকা খরচ হইয়া গেলে কাশীতে ইনি অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন, এমন কি, সাংসারিক চিন্তায় তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধিমতী ভার্য্যা, আপনাদিগকে অত্যন্ত বিপন্ন মনে করিলেন এবং তৈজসপত্রাদি বিক্রয় করিয়া স্বামি-

পুত্র লইয়া কালীঘাটে আসিলেন এবং একটি যাত্রীর ঘরে বাসস্থান লইলেন। সেই বাড়ীর অন্যান্য ঘরে প্রতি শনিবার কলিকাতার মাতাল বাবুরা কালীপূজার ছলে আমোদ-আহ্লাদ করিতে আসিত। সতী সাধ্বী ব্রাহ্মণ-মহিলা, এই অবস্থায় সেই বাড়ীতে বাস করা অসঙ্গত মনে করিলেন। তাঁহাদের এই দুরবস্থার সময় মুক্তি-ফৌজের লোকেরা তাঁহাদিগকে খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করার জন্য প্রলুব্ধ করিল। উপায়-হীন বিকৃত-মস্তিষ্ক বাণীকণ্ঠ তাহাতে রাজী হইয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ৺হরিমোহন ঘোষাল আমাকে এই দুঃস্থ-পরিবারের সংবাদ দিলেন। আমি তাঁহাদের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিলাম এবং বলিলাম যে, উপজীবিকার জন্য তাঁহাদিগকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে না, আমি তাঁহাদের জন্য সুব্যবস্থা করিব। আমার কথা শুনিয়া বাণীকণ্ঠ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন এবং তাঁহার পুত্র ও ভার্য্যা আমাকে তাঁহাদের জন্মান্তরের বান্ধব মনে করিয়া অসঙ্কোচে তাঁহাদের সমস্ত দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। আমি বলিলাম, "কোন ভয় নাই।" তাহাতে তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্ভয় হইয়া গেলেন।

বলিতে গেলে আমি নিজে ত কপর্দ্দকশূন্য; কিন্তু ইঁহারা ভাবিলেন, আমি নিশ্চয়ই কোন ধনী ব্যক্তি। আমি অনতিবিলম্বে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট ছুটিয়া গেলাম এবং সংক্ষেপে সংবাদ জানাইলাম। তিনি আমার হাতে দশটি টাকা দিলেন, আমি কালীঘাট যাইয়া বাণীকণ্ঠ এবং তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকে গাড়ী করিয়া আমার বাসায় লইয়া গেলাম। মনোরমা এ সমস্ত কিছুই জানিতেন

না। তাঁহাকে আমি সংক্ষেপে সমস্ত বলিলাম। এই ব্রাহ্মণ-পত্নী ও বালকটিকে তিনি এমনই আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন যে, তাঁহারা অনুভব করিতে পারিলেন না যে, পরের বাড়ী উঠিয়াছেন।

আমাদের এখনও আকাশ-বৃত্তি; সুতরাং এইরূপ একটি পরিবার আমাদের সঙ্গে রাখা উচিত নয় মনে করিয়া আমাদের বাড়ীর অনতিদূরে এক শিষ্টস্বভাব স্কুল-পণ্ডিতের বাড়ীর একটি ঘর মাসিক ২৷৩ টাকায় (ঠিক মনে নাই) ভাড়া লইলাম এবং মিত্র মহাশয়ের প্রদত্ত টাকা দিয়া তাঁহাদের সংসার পাতিয়া দিলাম। মিত্র মহাশয় দয়া করিয়া ব্রাহ্মণ বালকটির পড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

পাঠক ভবিষ্যতে দেখিতে পাইবেন, এই আগন্তুক ঘটনার সঙ্গে আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

এ স্থলে স্যার মিত্র মহাশয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। তিনি আমাদের দেশের এক জন প্রধান ব্যক্তি। তাঁহার বিষয় কিছু শুনিতে আশা করি সকলেরই আগ্রহ হইবে।

তিনি অতিশয় গম্ভীর-প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহাতে একটি প্রধান গুণ এই দেখিয়াছিলাম যে, কেহ যখন তাঁহার সঙ্গে কথা বলিত, তখন তিনি এতই নিবিষ্ট-মনে শুনিতেন যে, মনে হইত, তিনি যেন কথাগুলি গিলিতেছেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া কেহ কিছু বলিতেছে, কিন্তু বক্তব্য শেষ হওয়ার পূর্ব্বে তিনি বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেন না। অথবা "কাজের কথা নয়" বলিয়া অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিতেন না। আমার মনে হয়, যে সকল গুণে তিনি উৎকৃষ্টতম বিচারক হইয়াছিলেন, এই গুণটি সে সকলের অন্যতম।

তাঁহার দ্বিতীয় গুণ—তিনি তর্কের জন্যে তর্ক করিতেন না। যখনই দেখিতেন, কেহ সত্যকথা বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট তিনি তৎক্ষণাৎ পরাজয় স্বীকার করিয়া সত্যের অন্বেষণে ব্যস্ত হইতেন। বিচার-বিতর্কের মধ্যে তাঁহার কিছুমাত্র দাম্ভিকতা ছিল না।

স্যার রমেশচন্দ্রের কোন কার্য্যে আড়ম্বর ছিল না। তিনি দেখাইয়া দান করিতেন না, কিন্তু তাঁহার গুপ্ত-দান ছিল। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, প্রথম বয়সে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, কেন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন? ব্রাহ্ম-সমাজের উপর কোন প্রকার দোষারোপ না করিয়া তিনি উত্তর করিলেন যে, উপাসনায় তাঁহার মন বসিত না, তিনি এমন কোন অবলম্বন প্রাপ্ত হন নাই, যাহা ধরিয়া থাকা যায়। মিথ্যা সহানুভূতি রাখা তিনি উচিত মনে করেন নাই।

আমার সঙ্গে যখন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ, তখন তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং সংস্কৃত শিক্ষা ও ধর্ম্মালোচনায় মনোযোগ দিয়াছেন। এই বয়সে পণ্ডিত রাখিয়া সংস্কৃত পড়িতেছিলেন।

পদ্মপুকুরের বাড়ীতে আমাদের অনেক বন্ধু ও আত্মীয় সময় সময় আসিয়া বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সেনহাটী-নিবাসী সাধু-চরিত্র অধ্যাপক ৺ত্রিগুণাচরণ সেন এম, এ আমাদের অত্যন্ত আপনার জন হইয়াছিলেন। বন্ধুবর শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুশীলা দেবী, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ রায় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র

বন্ধু ও স্নেহভাজন শ্রীমতী সরলাসুন্দরী প্রভৃতি কিছুদিন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। মনোরমার সঙ্গে বাস করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার সঙ্গে বাস করা এবং কার্য্যের মধ্যে ও ধ্যানের মধ্যে তাঁহাকে দেখার জন্য কত লোকেরই আগ্রহ ছিল।

পদ্মপুকুরের বাড়ী পরিত্যাগ ও সার্কুলার রোডে বাস

অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে আমরা পদ্মপুকুরের বাড়ী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। অনেকেরই জ্বর-জ্বালা আরম্ভ হইল। পুরাতন ম্যালেরিয়ার বিষ আবার নববল ধারণ করিল। শ্রীশ্রীগুরুদেব সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাখাল বাবুর বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অর্থাভাবে আমরা ইচ্ছামত তাঁহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছিলাম না, এইরূপ কয়েকটি কারণের একত্র সমাবেশ হওয়ায় আমাদের এই বাড়ীতে বাস করা ক্লেশকর হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীগুরুদেবকে সমস্ত বলিলাম, তাঁহার নিকটে কোন বাড়ী দেখিয়া বাসা পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম, "ভবানীপুরের বাড়ীভাড়া এবং উমাচরণবাবু ইচ্ছা করিয়া যে সকল জিনিসপত্র আনিয়া দিয়াছেন, সেই সমস্তের দরুণ আমার নিকট তাঁহার প্রায় ৮০৲ আশী টাকা প্রাপ্য হইবে, তাহা পরিশোধ না করিয়া কিরূপে আসিব?" তিনি বলিলেন যে, উহা পরে দিলেও চলিবে।

আমি ভবানীপুরে আসিয়া বাড়ীওয়ালা ভগবতী বাবুকে সমস্ত কথা বলিলাম, তিনি বলিলেন যে, গোঁসাইজী যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, সেইরূপই করিবেন।

আমরা সুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ে সারকুলার রোডে ডাক্তার দয়ালচন্দ্র সোম মহাশয়ের একটি দোতালা বাড়ী ভাড়া লইলাম এবং ভবানীপুর হইতে পরিবারবর্গ লইয়া সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। পরের দিন যখন জিনিসপত্র আনিবার জন্য ভবানীপুর গিয়াছি, তখন ভগবতী বাবু এই মর্ম্মে একখানি চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি এখন বেগার অবস্থায় আছেন, অতএব তাঁহার প্রাপ্য টাকা এখন পাঠাইলেই সুবিধা হয়। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম যে, আপনি যদি গতকল্য এ কথা বলিতেন, তবে হয় ত আমি এখন এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতাম না। কিন্তু এখন ত অনুপায় দেখিতেছি। তিনি আমার কথার উত্তরে বিশেষ কিছু বলিলেন না, আমি আমার সমস্ত জিনিসপত্র গাড়ীতে করিয়া লইয়া নূতন বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

ইহার পরের দিন আমাদের গুরুভ্রাতা শোভাবাজারের শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় আমাকে বলিলেন যে, আমি ভগবতী বাবুর বাড়ীভাড়া পরিষ্কার না করিয়া চলিয়া আসায় উমাচরণবাবু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং রাগ করিয়া আমাকে কিছু উগ্রবাক্য বলিয়াছেন। মণি বাবুর কথা শুনিয়া আমার মনে হইল যে, আমি যে ভগবতী বাবুর অনুমতি লইয়া বাড়ীপরিবর্ত্তন করিয়াছি, যে কারণেই হউক, সে কথা উমাচরণবাবু শুনেন নাই। তাঁহার ভ্রাতা হয় ত

তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তোমার একজন গুরুভাই ভাড়া না দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এরূপ কথায় উমাচরণ বাবুর দুঃখিত ও বিরক্ত হওয়া অসম্ভব নহে, কেন না, গুরুর নামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া কোন দোষ দেখাইলে উহাতে শিষ্যের হৃদয়ে আঘাত লাগা স্বাভাবিক।

মণিবাবুর কথা শুনিয়া আমি আমার "কবিতারঞ্জনের" গ্রন্থ-স্বত্ব বিক্রয় করিতে বাহির হইলাম। ভাবিলাম, ৮০৲ টাকা পাইলেই আমি উহা বিক্রয় করিব। তখন সম্পত্তির মধ্যে উক্ত পুস্তকখানা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আমার গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদারের নিকট উপস্থিত হইয়া জানিলাম যে, নূতন বাছুনীর সময় টেক্‌ষ্টবুক কমিটী আমার পুস্তকখানি তালিকাভুক্ত করেন নাই। বিশেষ তদ্বির ভিন্ন কোন পুস্তক তালিকাভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অল্পই ছিল, আমি কিছুমাত্র তদ্বির করি নাই। *

যদি এই ঘটনা না ঘটিত, তবে সেই দিনই ৮০৲ টাকায় এই পুস্তকের "গ্রন্থস্বত্ব" বিক্রয় হইয়া যাইত। যাহা হউক, জ্ঞান বাবু বলিলেন যে, "কবিতারঞ্জনের" হিসাবে তাঁহার নিকট আমার ৪০৲ চল্লিশ টাকা পাওনা আছে, আমি তাহা চাহিয়া লইলাম।

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে সেই ৪০৲ চল্লিশ টাকা দিয়া আমি বলিয়া দিলাম যে, আজ রাত্রেই তিনি উমাচরণ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এই ৪০৲ চল্লিশটি টাকা

* পরে শ্রদ্ধাস্পদ ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিশেষভাবে অনুরোধ করায় কমিটী এই পুস্তকখানিকে পুনরায় তালিকাভুক্ত করিয়াছিলেন।

দিয়া বলিবেন যে, বাকী ৪০৲ টাকা যথাসম্ভব সত্বর আমি তাঁহাকে পাঠাইব।

পরের দিন প্রাতে উঠিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিতে রাখাল বাবুর বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম, উমাচরণ বাবু গুরুদেবের খুব নিকটে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া চুপে চুপে কথা বলিতেছেন। তিনি অতি প্রত্যূষে ভবানীপুর হইতে রওনা হইয়াছেন, নতুবা এত ভোরে পৌঁছাইতে পারিতেন না। বস্তুতঃ এরূপ সময় আর কখনও তাঁহাকে আসিতে দেখি নাই। মনে হইল, যেন কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় গোপনীয় কথা বলিতে তিনি এত ভোরে উপস্থিত হইয়াছেন।

আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া দূরে দাঁড়াইলাম। উমাচরণবাবু উঠিয়া আসিয়া আমাকে নমস্কার করিলেন এবং অতি বিনয়-নম্রভাবে যোড় হস্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন, যেন তিনি আমার নিকট কোন বিশেষ অপরাধ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, তাঁহাদের যত্নে ও সাহায্যে আমি ভবানীপুরে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইয়াছি, তাঁহার ভ্রাতা ভগবতী বাবু নানা প্রকারের অসুবিধা দূর করার জন্য কত যত্ন করিয়াছেন, এখন যদি সামান্য বিষয় লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কোন প্রকারের মনোমালিন্য ঘটে, আমার দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। আমি আরও বলিলাম যে, ভগবতী বাবুর অনুমতি পাইয়াই আমি বাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম, ভাড়ার টাকা কিছু দিন পরে দিব, ইহাও বলিয়াছিলাম। উমাচরণ বাবু আমাকে আর বেশী কথা বলিতে দিলেন না, আমার কথায় বাধা দিয়া হাত যোড় করিয়া বলিলেন, "এজন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না,

এবং গত কথা কিছুই মনে রাখিবেন না, ইহাই আমার প্রার্থনা।”

আজ রাত্রি দুই প্রহরের পরে মনোরমা আমাকে ডাকিয়া ঘুম হইতে জাগাইলেন, আমি উঠিয়া শুনিতে পাইলাম, ঘরের মধ্যে ক্রুদ্ধ সর্পের ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দের মতন একটা শব্দ হইতেছে। অবিলম্বে দেখিলাম, আমাদের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দেবরঞ্জনের মুখ দিয়া সজোরে শ্বাস নির্গত হইতেছে, ছেলেটি যেন যায় যায়। তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের বাড়ীতে সংবাদ দেওয়া হইল এবং বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস (এম, বি,) মহাশয়ের নিকট একজন ছুটিয়া গেল। সুন্দরীবাবু সেই শীতকালের গভীর রাত্রে অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাদিগকে যেরূপ আত্মীয় জ্ঞান করেন, তাহাতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সঙ্কোচজনক বোধ হয়। রোগী বালকটিকে দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল যে, হয় ডিপথিরিয়া কিংবা ক্রুপ্ রোগ জন্মিয়াছে। দুইটি রোগই খুব সাংঘাতিক। যথোপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া সুন্দরী বাবু চলিয়া গেলেন। কোনরূপে রাত্রি প্রভাত হইল। ভোরে সুন্দরী বাবু ও বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য দুইজনায় একসঙ্গে রোগী দেখিলেন এবং ক্রুপ্ হইয়াছে, ইহাই স্থিরীকৃত হইয়া চিকিৎসা রীতিমত চলিতে লাগিল।

অদ্য শ্রীযুক্ত মণি বাবু আমার হাতে ২০৲ কুড়িটি টাকা দিয়া বলিলেন যে, আপনার কোন বন্ধু আপনার পুত্রের চিকিৎসার জন্য এই কুড়িটি টাকা দিয়াছেন। আমি টাকা গ্রহণ করিলাম ; কিন্তু দাতার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম না, কেননা, আমি তখন মনে করিতাম, যেখান

হইতে যাহা কিছু আসিতেছে, সকলই একজনার দান—দ্বিতীয় দাতা কেহই নাই।

দেবরঞ্জ ক্রমশঃ আরোগ্যের দিকে চলিল। পরের দিন রাত্রে মণিবাবু আবার ২০৲ কুড়িটি টাকা আমার হাতে দিয়া বলিলেন যে, গত কল্যের কুড়ি টাকা এবং অদ্যকার এই কুড়ি টাকা একুনে ৪০৲ টাকা উমাচরণ বাবু আপনাকে দিয়াছেন। মণি বাবুর কথা শুনিয়া আমার মনে অভিমানের সঞ্চার হইল, কেননা, উমাচরণ বাবু তিন দিন পূর্ব্বে তাঁহার টাকার জন্য আমাকে কিছু কটু কথা বলিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে ৪০৲ টাকা দিয়াছি, বাকী ৪০৲ টাকা শীঘ্রই পরিশোধ করার ইচ্ছা করিয়াছি, এরূপ অবস্থায় তিনিই আমাকে টাকা পাঠাইতেছেন, ইহা জানিতে পারিলে গ্রহণ করিতে হয় ত আমি সঙ্কোচ বোধ করিতাম; কিন্তু মণি বাবু যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার আর কোন কথা বলিবার থাকিল না। তিনি বলিলেন, শ্রীশ্রীগুরুদেব এই টাকা গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন এবং দাতার নাম বলিতে বলিয়া দিয়াছেন। আমি বুঝিলাম, অভিমানী শিষ্যের অভিমান চূর্ণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

কিরূপ ঘটনায় উমাচরণ বাবু টাকা ফিরাইয়া দিয়াছেন, তাহাও মণিবাবু আমাকে বলিলেন। ঘটনাটি অতি অদ্ভুত।

মণিবাবুর কথা শুনিয়া আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট গেলাম, তিনি বলিলেন যে, উমাচরণবাবুর নিজ মুখে এই বিষয়ের সবিশেষ শ্রবণ করাই ভাল। আমি বন্ধুবর ৺মোহিনীমোহন রায় মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া ভবানীপুরে উমাচরণ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি

উপর হইতে নীচের বৈঠকখানায় নামিয়া আসিয়া আমাদের কাছে বসিয়া কিছুক্ষণ কাঁদিলেন। তাঁহাকে বালকের মত রোদন করিতে দেখিয়া আমি বিস্ময়ান্বিত হইলাম। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়-প্রকৃতির লোক, রজকবংশে জন্মগ্রহণ এবং সামান্য বিদ্যালাভ করিয়া ১৫৲ পনর টাকা বেতনের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আপনার দৃঢ়-প্রকৃতি ও অধ্যবসায়গুণে প্রায় সহস্র মুদ্রা বেতনে পোষ্টাফিসের ডেপুটী ও কণ্ট্রোলার হইয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য ও প্রধান প্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এক সময় ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তখন তর্ক-যুক্তির পথেই চলিতেন, তেমন ব্যক্তিকে সহসা বালকের মতন কাঁদতে দেখিলে কেনই বা আশ্চর্য্য বোধ না হইবে ?

কিছুক্ষণ পরে আত্ম-সংবরণ করিয়া উমাচরণ বাবু যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমরাও বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। পরবর্ত্তী কোন এক সময় তাঁহার সেই জবানী আমি একখানি পত্রে লেখাইয়া লইয়াছিলাম। উক্ত পত্র অবিকল এই স্থানে উদ্ধৃত হইল।

উমাচরণ বাবুর পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব।

পাদপদ্ম ভরসা।

৪৮ নং পদ্মপুকুর রোড।

ভবানীপুর ডাকঘর।

৫ই জানুয়ারী, ১৯০১।

যথাবিহিত-প্রণতি-পূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়াছি; যে ঘটনার কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিলাম ঃ—

আপনি যখন আমার মধ্যম সহোদরের বাটী ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় উঠিয়া যান, তখন তাঁহার নিকট আপনার কিছু দেনা ছিল। তিনি সেই টাকার কথা আমার নিকট উল্লেখ করেন এবং তাহার জন্য আমি আপনাকে একখানি পত্র লিখি। পরে শুনিলাম, আপনি সেই পত্র পাইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, এমন কি, আপনার একখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তকের স্বত্ব পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যে দিন পত্র লিখি, হয় সেই দিন কিংবা তার পরদিন রাত্রিতে আমি সাধন-কার্য্য শেষ করিয়া উঠিব, এমন সময় একটি মূর্ত্তি আমার

সম্মুখে প্রকাশ হয়। মূর্ত্তির মস্তক ও স্কন্ধদেশ মাত্র আমার দৃষ্টিগোচর হয়। আমার চক্ষু তখনও মুদ্রিত, কিন্তু যিনি কৃপা করিলেন, তাঁহার প্রকাশিত অংশটুকু এরূপ আলোকিত যে, তাঁহার মস্তকের এবং শ্মশ্রুর দুই এক গাছা শুভ্রবর্ণ কেশ অতি পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইলাম। মুখখানির কথা কি বলিব, রং যদিও আমার ন্যায়, কিন্তু দৃষ্টির চাঞ্চল্যে ও মুখের গঠনে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় অপার্থিব বলিয়া বোধ হইল। ক্রমে দক্ষিণদিকের ওষ্ঠ একটু উঠিল, এবং সেই সময় দুইটি শব্দ আমার কর্ণকুহর ভেদ করিয়া হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল। কথা দুটি 'দে দাও'; অর্থ বুঝিতে পারিলাম না, কথা দুটি নিজে উচ্চারণ করিতে করিতে ঘরের বাহিরে আসিলাম, তখন হঠাৎ বিদ্যুতের আভার ন্যায় অন্তরে তাহার অর্থ-স্ফূর্ত্তি হইল। সে সময় এত বিহ্বল হইলাম যে, যদ্যপি ধরিবার একটি খুঁটি না থাকিত, পড়িয়া যাইতাম।

তৎপরদিন প্রত্যূষে গোস্বামী প্রভুর নিকট গেলাম, তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সকলই বলিলাম এবং আদেশের অর্থ নিজে যাহা বুঝিয়াছিলাম অর্থাৎ আপনার ঋণ আমাকে শোধ করিবার আজ্ঞা, তাহাও বলিলাম। তিনি একটু মনে মনে চিন্তা করিলেন এবং বলিলেন যে, আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই ঠিক এবং যিনি আমাকে কৃপা করিয়াছিলেন, তিনি কোন মহাপুরুষ। এইটি আমার হেয় জীবনে একটি বিশেষ শুভদিন। লিখিতে চক্ষে জল আসিতেছে।

কি জন্য আপনি এই ঘটনা আমার নিকট লিখাইয়া

লইলেন, জানিতে ইচ্ছা হয়। সংবাদপত্রে প্রচার হওয়া আমার ইচ্ছা নয়।

আমরা এক্ষণে এক প্রকার ভাল। আপনার কুশল-সংবাদ একান্ত প্রার্থনীয়।

শুভাকাঙ্ক্ষী—

(স্বাঃ) শ্রীউমাচরণ দাশ।

* * * * *

* * * * *

শিকদার-বাগান

সারকুলার রোডের বাড়ীতে স্থানের অসঙ্কুলান হওয়ায় এবং শ্রীশ্রীগুরুদেব কলিকাতা হইতে অন্যত্র যাওয়ায় আমরা ৩২ নং শিকদার-বাগান লেনে শ্রীযুত বরদাদাস বসু মহাশয়ের বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম। এই বাড়ীটি বরদা বাবু নিজের বাসের জন্য করিয়াছিলেন; সুতরাং বাড়ীর বন্দোবস্ত বেশ ছিল। এই বাড়ীতে শ্রীমান্ রেবতীমোহন, বেণীমাধব ও সত্যকুমার আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এখানে কোন চাকর-চাকরাণী বা রাঁধুনী ছিল না।

৺সত্যকুমার গুহ ঠাকুরতা আমার জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺দ্বারকানাথ দত্ত রায় বাহাদুরের জামাতা। সত্যকুমার বি, এ, ফেইল করিয়া গ্রাম্য স্কুলে মাষ্টারি করিতেন।

তাঁহার ন্যায় বিনম্র, ধর্ম্মপ্রাণ, মিষ্টস্বভাব, সাধু-যুবক অতি অল্পই দেখা যায়। সাংসারিক উন্নতির দিকে তাঁহার মনোযোগ ছিল না; এজন্য অনেক সময় আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াছেন। কিন্তু সেই উপেক্ষা ও অনাদর তাঁহার চিত্তবিক্ষেপ জন্মাইয়া তাঁহাকে সাধন-বিমুখ করিতে পারে নাই। প্রথম জোয়ারে গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া ভক্তেরা যেমন দুই হাতে ময়লা ও আবর্জ্জনা সরাইয়া, "মা পতিত-পাবনি" বলিয়া ডুব দেয়, ভক্ত সত্যকুমার সেইরূপ সংসারের সমস্ত অভাব ও অভিযোগ উপেক্ষা ও বিরাগকে ঠেলিয়া দিয়া ভগবানের নাম-গঙ্গায় ডুবিয়া থাকিতেন। উপরের কোন আবর্জ্জনাই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। আমাদের গ্রামের দুইটি লোক, বুক-ভরা ভালবাসা ও মুখ-ভরা হাসি লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ডাক্তার শ্রীনাথ দাস আর একজন এই সত্যকুমার; ইঁহাদের অকাল-মৃত্যুতে তখন মনে হইয়াছিল যেন, গ্রামের জ্যোৎস্না নিভিয়া গেল।

শিকদার-বাগানে একদিন আমাদের অন্নাভাব ঘটিল। রাত্রের আহার হইল না। ইহাতে সাধকদিগের কিছু সুবিধাই হইয়াছিল, কেন না, আহার না পাওয়ায় ক্ষুধাদেবী মোহদায়িনী নিদ্রাকে আসিতে দেন নাই, রাত্রি জাগিয়া নাম জপ করার সুবিধা হইয়াছে। শ্রীমান্ রেবতী, সত্যকুমার ও বেণীমাধব এক ঘরে ছিলেন। রেবতী বলিলেন, গভীর রাত্রে সত্যকুমার ধুতীর খোঁট্‌টা ঘোমটার মতন টানিয়া দিয়া একাকী নৃত্য করিতেছিলেন। নামানন্দে তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। আনন্দে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, "ভাই, ধুনাটুনা দেও, না হ'লে মহাপুরুষরা আসিবেন কেন?" অনাহারেও

যাঁহার আনন্দের ফোয়ারা উথলিয়া উঠে, তাঁহার আর দুঃখ কি? ভগবান্ দিলেন ব'লেও নৃত্য, দিলেন না ব'লেও নৃত্য। খেতেও সুখের সীমা নাই, না খেতে পেলেও সুখ উথ্‌লে উঠে। কারণ, দুটোই তাঁর খেলা ব'লে মনে হয়; এ সুখের সীমা কোথায়? পরদিন যখন আহারের সংস্থান হইল, তখন সত্যকুমার মনোরমাকে বলিলেন, "খুড়ীমা, এবেলা দুই তিন দিনের খেয়ে রাখ্‌তে হবে, আবার কবে ঘটে ঠিকানা কি?" এই কথা লইয়া আমাদের মধ্যে কতই হাসির লহরী উঠিল।

সত্যকুমারের ধনী আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিবার জন্য তাঁহাকে কত যত্ন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে থাকিয়া উপবাস করিতেই ভালবাসিতেন, তিনি ত ভাতের কাঙ্গাল ছিলেন না।

যখন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন সেই ধর্ম্মাবলম্বী পরস্পরের মধ্যে, বিশেষতঃ নব-প্রবিষ্টদিগের মধ্যে একটা অনুরাগের আকর্ষণ পড়িয়াছিল। যাহারা কোন সত্য-পালনের জন্য উৎপীড়িত বা পরিত্যক্ত হয়, তাহাদের মধ্যে অতি সহজেই সহানুভূতি উৎপন্ন হয়; কোন ধর্ম্মকে উপলক্ষ করিয়া উহা সংঘটিত হইলে সেই সহানুভূতি প্রেমে পরিণত হয়, তাই প্রথম যুগে ব্রাহ্ম-সমাজে এইরূপ প্রেমের উৎপত্তি হইয়াছিল; কিন্তু আমরা গুরু গ্রহণ করিলে গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যে যে আকর্ষণ জন্মিল, উহা অধিকতর তীব্র, তজ্জনিত ভালবাসাও অধিকতর গাঢ় এবং ইহার উৎপত্তির মূলে কোনও প্রকার বাহ্য-তাড়না না থাকায় সম্পূর্ণ রজোভাব-বর্জ্জিত, সুতরাং বিশুদ্ধ। একান্ত অপরিচিত ব্যক্তিকে গুরুভ্রাতা কি গুরুভগিনী বলিয়া জানিতে পারিলেই

আপনার ঘরের লোক বলিয়া মনে হয়, তাহার কাছে নিজের অভিমান ও মনের সঙ্কোচ কিছুই রাখিতে পারা যায় না।

"ঘর কৈনু বাহির—বাহির কৈনু ঘর
পর কৈনু আপন—আপন কৈনু পর।"

এ কথা বড়ই সত্য, তাই গুরুভ্রাতাগণ কোন দুঃখের মধ্যেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। এক সঙ্গে থাকিয়া আমরা উপবাস করিতেছি, তথাপি কেহই স্বতন্ত্র হইতে পারেন নাই।

ভবানীপুর

শিকদার-বাগান হইতে কিছু দিন পরেই আমরা ভবানীপুর ৪৯ নং চাউলপটী রোডে উঠিয়া গেলাম। আমরা যখন এই বাড়ীতে বাস করিতেছিলাম, তখন শ্রীমতী এনি বেসেণ্ট সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার আগমনে, অভ্যর্থনায় বক্তৃতায় কলিকাতা সহরে একটা নব-ভাবের জাগরণ উপলব্ধি হইয়াছিল। সেই অসাধারণ-শক্তিশালিনী পাশ্চাত্য-মহিলার বক্তৃতায় টাউন হলে লোক ধরিত না। এত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম একক্ষেত্রে প্রায়শঃ লক্ষিত হয় নাই। একে ত মেম, তাহাতে সুবক্তা, তাহাতে সাহেবের মুখে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সভ্যতার বিজয়-গান সুতরাং অমৃতযোগ ঘটিয়াছিল।

এনি বেসেণ্ট মিলন

আমাদের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডন সম্পাদক) মহাশয়ের মাথায় একটা খেয়াল চাপিল। এনি বেসেণ্টের সঙ্গে মনোরমার সাক্ষাতের জন্য তাঁহার বড়ই অভিলাষ হইল। কেন যে তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হইল, তাঁহা আমি ঠিক ঠিক বলিতে পারি না। তবে এইটুকু বুঝিয়াছিলাম যে, শাস্ত্রীয় তত্ত্ব, ব্যক্তি-মধ্য দিয়া কিরূপ ভাবে বিকশিত হয়, ইহা দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু মিলনটি বড়ই চমৎকার! একজন মহাবিদুষী, অন্যজন নিগ্রন্থা বলিলেই হয়। একজন মহতী-বাগ্‌বিভবসম্পন্না, অন্যজনাকে বোবা বলিলেও দোষ হয় না। একজন ভুবন-ব্যাপ্তযশা-পৃথিবী-পর্য্যটনকারিণী যশস্বিনী, অন্যজন অখ্যাতনামা সঙ্কোচভীতা বঙ্গ-গৃহের কুলবধূ, এরূপ উভয় ব্যক্তির মিলনের যে আবশ্যকতা কি, তাহা বুঝা যায় না।

তখন শ্রীগুরুদেব কলিকাতায় ছিলেন না; সতীশ বাবু মনোরমাকে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলেন। তিনি বলিলেন, এনি বেসেণ্টের নাম শুনিয়া তাঁহারও তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, কোন নির্জ্জন স্থানে সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছুক।

সতীশ বাবু স্যার রমেশচন্দ্রকে এই কথা জানাইলেন। তিনি উৎসাহী হইয়া এই মিলনের জন্য রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরকে পত্র দিলেন। সেন মহাশয় নিজে আমাদিগকে জানিতেন, তিনি আমাকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন।

এনি বেসেণ্ট মিলন

রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর (মিরারের সম্পাদক) স্যার রমেশ-চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পত্র দেখাইয়া সতীশ বাবুর সঙ্গে শ্রীমতী বেসেণ্টের পরিচয় করিয়া দিলেন। মিত্র মহাশয়ের পত্রমধ্যে তিনি সংক্ষেপে মনোরমার পরিচয় দিয়াছিলেন। বেসাণ্টের আগমনের কয়েকদিন পরেই বেলা ১২টার পর ১টার মধ্যে তাঁহার বিশ্রাম-ঘণ্টায় দেখার বন্দোবস্ত হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ও শ্রীমান্ রেবতী-মোহনের সঙ্গে মনোরমা বেসেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, শিশু সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাকে গৃহে থাকিতে হইল।

শ্রীযুক্ত অলকট্ সাহেব মহোদয় মেম সাহেবের ঘরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। মনোরমা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে তিনি নমস্কার করিয়া বেসেণ্টের ঘর দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীমতী বেসেণ্ট চেয়ারে বসিয়াছিলেন, মনোরমা গৃহে প্রবেশ করিলে তিনি উঠিয়া নমস্কার ও অভ্যর্থনা করিলেন এবং উভয়ে ম্যাটিংএর উপর বসিলেন। সতীশ বাবু দোভাষীর কার্য্য করিলেন।

মনোরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, মেম সাহেব কখন্ কি কার্য্য করেন? তদুত্তরে রাত্রি থাকিতে উঠিয়া স্নান করিয়া তিনি কি কি কার্য্য করেন বলিলেন। মিসেস্ বেসেণ্টও মনোরমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি সে সকলের উত্তর করিলে সতীশ বাবু খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং মেম সাহেবকে বলিলেন যে, ইনি শাস্ত্রজ্ঞা না হইয়াও কিরূপে এই সকল কথার এমন সুন্দর উত্তর দিতেছেন। মেম সাহেব বলিলেন, ইহা গুরুকৃপার ফল। কিছুক্ষণ কথোপকথনের

পরে একটি কাষ্ঠাধারকে নমস্কার করিয়া মিসেস্ বেসেণ্ট তাহা হইতে একখানি ফটো বাহির করিলেন এবং মনোরমাকে দেখাইয়া বলিলেন, ইহা তাঁহার (মিসেস্ বেসেণ্টের) গুরুদেবের ফটো, তিনি স্বদেশে থাকিয়াই ইঁহার নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছেন। মনোরমা নমস্কার করিলেন, বেসেণ্ট মহোদয়া পুনরায় ফটোখানিকে নমস্কার করিয়া বাক্সে রাখিলেন। সে ফটোখানি যাঁহার, তাঁহার মাথায় পাগড়ী এবং তিনি ভারতবাসী।

উভয়ের কথোপকথনে এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। মেম সাহেব পুনরায় নমস্কার করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার অতিথিকে বিদায় দিলেন। মনোরমা সিঁড়ির নিকট উপস্থিত হইলে একটি যুবতী মেম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার দিকে তাকাইয়া মাটীতে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক জোড়করে প্রার্থনা করিলেন যে, "আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" সতীশ বাবু সে কথা মনোরমাকে বুঝাইয়া দিলেন, মেম সাহেব পুনরায় নমস্কার করিলেন, তাঁহার নয়নপ্রান্তে জলধারা উপস্থিত হইয়াছিল।

সকলেই জানিতেন যে, ম্যাডাম ব্লাভাটস্‌কি শ্রীমতী বেসেণ্টের দীক্ষাগুরু, কিন্তু মনোরমাকে তাঁহার গুরুমূর্ত্তি প্রদর্শন করার কথা রাষ্ট্র হওয়ায় অনেকে প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, এবং নানাস্থান হইতে কয়েকজন থিয়োজফিষ্ট আমাদের ভবানীপুরের বাটীতে উপস্থিত হইয়া প্রকৃত ঘটনা জানিয়া গেলেন।

যে মেম সাহেব মনোরমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সজল-নয়নে তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কাউণ্টেস্

ওয়াকমিষ্টার (Countess. Wacht Mister) তিনি বিপুল ধনরাশির অধিকারিণী এবং ধর্ম্মপ্রাণা বিদুষী মহিলা। এরূপও রাষ্ট্র ছিল যে, তিনি কেলয়ারভয়েণ্ট (clairvoyant) অর্থাৎ যোগদৃষ্টিসম্পন্না ছিলেন। এই সকল জানিয়া আমি পরের দিন সতীশ বাবুকে তাঁহার নিকট পাঠাই-লাম, তিনি কি দেখিয়া এবং কি কারণে মনোরমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ও তাঁহার নিকট সজল-নয়নে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন, ইহা জানিবার জন্য আমার কুতূহল হইয়াছিল। সতীশ বাবু উক্ত কাউণ্টেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাহা জানিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই ;—

কাউণ্টেস বলিলেন যে, এই মহিলাটি (মনোরমা) কে এবং কেন আসিয়াছেন, তাহা কিছুই তিনি জানিতেন না। তিনি দেখিলেন, এক রমণীমূর্ত্তি অপূর্ব্ব জ্যোতিতে বিমণ্ডিতা, দেখিয়াই তাঁহার হৃদয় ভক্তিতে অভিভূত হইল, তাই তিনি প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন।

পুনরায় সে দিনও সতীশ বাবুকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন "তিনি (মনোরমা) যেন আমাকে আশীর্ব্বাদ করেন। আবার যখন আমি ভারতবর্ষে আসিব, তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আমার প্রধান কার্য্য হইবে।" ইত্যাদি।

সে সাক্ষাৎ আর হইল না।

অল্পদিনের মধ্যেই কোন বিশেষ কারণে আমরা ২৮নং চাউলপটী রোডে উঠিয়া গেলাম। এই বাড়ীতে থাকার সময় ভগবদ্ভক্ত, সুপণ্ডিত, সৌম্যমূর্ত্তি, মধুর-প্রকৃতি ৺দীনবন্ধু কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ মহাশয় অনেক সময় আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। তিনি মনো-

রমাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন, আমি তাঁহার নিকট "চণ্ডী" পাঠ করিতাম। অল্পবয়সেই দীনবন্ধু সুধী-সমাজে ও ভক্তমণ্ডলীতে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সরল-অন্বয়-যুক্ত সানুবাদ শ্রীমদ্‌ভাগবৎ গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া ইনি বাঙ্গালা দেশের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। হাবড়ায় ইঁহার আশ্রম ও পুস্তক-প্রচার-বিভাগ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

২৮নং চাউলপটী রোডে একদিন সতীশ বাবুর সঙ্গে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী (এম্, ডি) মহাশয় আমাদের বাড়ীতে আগমন করিলেন। স্ত্রী-বিয়োগ-জনিত দুঃখে তখন সুরেশ বাবুর চিত্তে বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল। তিনি সাধু-সঙ্গ-লালসায় ৺কাশীধাম গিয়াছিলেন। সেখানে কোন বাঙ্গালী সাধু তাঁহাকে মনোরমার কথা বলিয়াছিলেন। *

---

* এই সাধুটি "দ্বারকজী অর্থাৎ ৺দ্বারকানাথ পাল মহাশয়। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রম বংশবাটী (বাঁশবেড়িয়া) গ্রাম। ইনি আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সমুদয় টাকা সংস্কৃত শিক্ষার জন্য দান করেন। পরে রীতিমত ভেক গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হন্। প্রথম জীবনে ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সঙ্গে সিমলা শৈল প্রভৃতি নানাস্থানে ছিলেন। শেষ জীবনে অনেক সময় ৺কাশীধামে দুর্গাবাড়ীতে ছিলেন। সেখানে ইঁহার নাম হইয়াছিল "দ্বারকজী"। স্বামী ভাস্করানন্দ একদিন বলিয়াছিলেন যে, কাশীতে সাধু দর্শন করিতে হইলে "দ্বারকজী" কে দেখিতে হয়। অমন অমায়িক প্রকৃতি, ধর্ম্মপ্রাণ লোক জগতে অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

সুরেশ বাবু বহু অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে সতীশবাবুকে ধরিয়া আমাদের বাসায় আসিয়াছেন।

এই সময় আমার একটি খুড়তুতো ভগিনী বিশেষ রোগাক্রান্ত হইয়া আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। তাঁহার কাণের পটহ বিকৃত হইয়া যাওয়ায় সর্ব্বদা কাণের মধ্যে ভয়ানক শব্দ হইত, সেই উদ্বেগে রোগিণীকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিত, অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে শয্যাগত থাকিতে হইত। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর সঙ্গে আমাদের আলাপ হওয়ার কিছুদিন পর হইতেই মনোরমার শরীরে আবার ম্যালেরিয়া জ্বরের আবির্ভাব হইল। এইরূপ অবস্থায় ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর ন্যায় একজন অসাধারণ চিকিৎসকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বড়ই সময়োচিত ঘটনা বলিতে হইবে।

তখন বিডন স্কোয়ারে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর ডিস্পেন্সারী ছিল, তিনি প্রভাতকালে সেখান হইতে ভবানীপুরে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া মনোরমাকে দেখিয়া তবে অন্যান্য কার্য্য করিতেন। এরূপ তিনি অনেক দিন করিয়াছেন।

আমার ভগিনীটির ব্যাধি যে অসাধ্য, তাহা সকল চিকিৎসকই বলিয়াছিলেন, সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ও অসাধ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি কাণের মধ্যে কি একটি ঔষধ ঢালিয়া দিলেন, কয়েকদিন ঐরূপ করায় উদ্বেগ অনেক কমিয়া গেল, ইহার পর বহুবৎসর রোগিণী একরূপ ভালই আছেন। এই ঘটনায় সর্ব্বাধিকারীর প্রতি আমাদের অধিকতর শ্রদ্ধা জন্মিল।

সমাধির গভীরতা

মনোরমার প্রতিদিন জ্বর হইতেছিল, সেই দুরন্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। জ্বর প্রতিদিনই ১০৫° ডিগ্রীর উপরে উঠিত। উৎকট শিরঃপীড়া ও বমন এই দুইটি প্রবল উপসর্গ ছিল। এই প্রবল জ্বরাসুর প্রায় ১২ ঘণ্টা কাল শরীরটাকে যেন গ্রাস করিয়া থাকিত। শিরঃপীড়ার যন্ত্রণাই সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক ছিল। কপালের দুইদিকের শিরা ফুলিয়া উঠিত, একটা কাপড় দিয়া আমরা শক্ত করিয়া মাথা বাঁধিয়া দিতাম, যাতনায় রোগিণীর দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতে থাকিত; এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া আমরা সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত হইতাম।

একদিন আমরা পরামর্শ করিয়া জ্বর আসার একঘণ্টা পূর্ব্বে মনোরমাকে ধ্যানে বসিতে বলিলাম। আমাদের বাড়ীটার দোতলায় দুইটি বড় ঘরের মাঝখানে একটি ছোট ঘর আছে, মনোরমা সকাল ৭টার সময়ে সেই ঘরে ধ্যানে বসিলেন। যথারীতি নমস্কার করিয়া তিনি অবিলম্বে ধ্যান-সাগরে ডুবিয়া গেলেন। একঘণ্টা পরে বেলা ৮টার সময় তাঁহার শরীর উত্তপ্ত হইতে লাগিল, ১২টা ১টার মধ্যে ১০৩।১০৪° ডিগ্রী জ্বর হইল। কিছুক্ষণ পরে জ্বর ১০৫° ডিগ্রীতে উঠিল। যথারীতি কপালের দুই পাশের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে, বুঝিলাম, এই অবস্থায় অন্যান্য দিবস তিনি মাথা ধরায় কাঁদিতেন, কিন্তু আজ যিনি বেদনা ভোগ করিবেন, তিনি জাগ্রত নাই। আমরা বাড়ীর

সকলে মিলিয়া দেখিতেছিলাম আর বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছিলাম। ১৫০° জ্বর লইয়া দেহটি যোগাসনে যোড়হস্তে নিমীলিত-নয়নে স্থির ধীর প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া আছে! আজিও দুই চক্ষে দুইটি ধারা বহিতেছে; কিন্তু আজিকার এই ধারা ক্লেশের ধারা কি আনন্দের ধারা, তাহা বুঝা যায় না, কেননা, স্বভাব-শরীরে সমাধির সময়ও এইরূপ ধারা বহিত। ইহার কিছু পরে অত্যন্ত বমন হইল, আমরা দেখিতেছিলাম, শরীরটা শরীরের কার্য্য করিতেছে, দুরন্ত জ্বর ভোগ করিতেছে, শিরঃপীড়া ভোগ করিতেছে, বমন করিতেছে, আর প্রকৃত মানুষটি ব্রহ্মানন্দ-সুধাপানে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। এরূপ দৃশ্য যে জীবনে দেখিব, তাহা কখনও কল্পনা করিতে পারি নাই।

আমি অন্যান্য সকলকে ঘর হইতে সরাইয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া কাপড়-চোপড় বদলাইয়া দিলাম, মনে হইল যেন, আমি একটি মৃতদেহের বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছি। দেহটি সেই যোগাসনে যোড়হস্তে বসিয়া আছে আর আমি কাপড় ও সেমিজ কাটিয়া ছিঁড়িয়া বদলাইয়া দিতেছি! আমি দরজা খুলিয়া দিলাম। আবার সকলে বিস্মিত-হৃদয়ে সেই ধ্যানস্থা মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে সারাদিন অতীত হইয়া গেল, সম্পূর্ণ ১২ ঘণ্টা ভোগ করিয়া রাত্রি ৮টার সময় জ্বর ছাড়িয়া গেল, ইহার একঘণ্টা পরে আমি মনোরমার কাণে পুনঃ পুনঃ তাঁহার সাধন-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিলাম। তিনি যোড়হস্তে নমস্কার করিয়া চক্ষু মেলিলেন। এই যে ১২ ঘণ্টাকাল তাঁহার শরীরের উপর দিয়া একটা যম-যুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি তাহার কিছুমাত্র খবর রাখেন না। শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছিলেন, "ধ্যানের সময় যাহারা

মনোরমাকে দেখিবে, তাহাদের দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট হইবে।” বস্তুতঃ এই সকল ঘটনা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাহারা একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। দেহ এবং আত্মা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু, এ বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র সংশয় থাকে নাই। এই দিনের পর আর তাঁহার জ্বর হইয়াছিল কিনা, ঠিক মনে নাই।

প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা

বাং সন ১৩০০ সাল, মাঘ মাস।

এই সময় প্রয়াগধামে পূর্ণকুম্ভ মেলার অধিবেশন হইতেছিল। শ্রীশ্রীগুরুদেব বহু ভক্ত সঙ্গে সেখানে গিয়াছেন, আমি তাঁহাদের সঙ্গী হইতে পারি নাই। একদিন প্রাণে বড়ই টান হইল, মনোরমাকে সে কথা বলিলে তিনি সানন্দে উৎসাহ প্রদান করিলেন, কোনও প্রকারে পাথেয় জুটিল, সতীশ বাবু এবং আমি একসঙ্গে যাইব স্থির হইল।

মৌনীবাবা

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয়, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রসিদ্ধ প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জামাতা। তিনি একদিন আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার হাতে একখানি পত্র

দিলেন। কতকগুলি ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ টুকরা টুকরা কাগজে লেড্ পেন্সিল দ্বারা পত্রখানি লিখিত হইয়াছে। উহা মৌনীবাবা (৺ প্যারীলাল ঘোষ) মহাশয় তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কুঞ্জ বাবুকে "ওঙ্কারনাথ" হইতে লিখিয়াছেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে,—"সংসার সম্পর্কে তুমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আজ তোমার নিকট একটি উপকারের প্রত্যাশা করিয়া আমি এই পত্রখানা লিখিতেছি। বহু চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, আত্ম-শক্তি-বলে আমি আর অগ্রসর হইতে পারি না। এক্ষণে আমার গুরুর প্রয়োজন। বিশ্বাস করিয়া যাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারি এরূপ লোক আর দেখিতে পাই না, তাই আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে গুরুত্বে বরণ করিয়াছি। এমন বিশ্বাসী, সত্যবাদী, আর কোথায় পাইব? আমার গতায়াতের শক্তি নাই, তুমি আমার এই উপকার করিবে যে, আমার এই কথা গোস্বামী মহাশয়কে জানাইবে।"

কুঞ্জবাবু তখন শাস্ত্রী মহাশয়ের একান্ত অনুগত ভক্ত ও তাঁহার সাধনাশ্রমের একজন উৎসাহী সাধক। তিনি ধর্ম্মলাভার্থ গুরু গ্রহণ করা অত্যন্ত অবৈধ ও কুসংস্কার বলিয়া মনে করিতেন। মৌনীবাবা তাঁহার পূজ্যতম জ্যেষ্ঠভ্রাতা, তাঁহারই ধর্ম্মানুরাগের দৃষ্টান্তে ইঁহাদের সমস্ত পরিবার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠের ধর্ম্ম-পিপাসা, বৈরাগ্য, ত্যাগ ও সত্যানুরাগ তাঁহাদের আদর্শ। আজি সেই সহোদর, পুরুষকার ও সহজ পথ পরিত্যাগ করিয়া গুরু গ্রহণ করিলেন, ইহা কুঞ্জবাবুর পক্ষে অত্যন্ত বিষাদের কারণ হইয়াছিল; কিন্তু পিতৃসম পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ সহোদরের জীবনের শেষ অনুরোধ রক্ষা

করা কর্ত্তব্য; এই কর্ত্তব্যজ্ঞানেই তিনি আমার হাতে পত্রখানি প্রদান করিয়া গোঁসাইজীকে পত্রোক্ত বিষয় জানাইতে অনুরোধ করিলেন। *

মৌনীবাবার সংসারআশ্রমের নাম প্যারীলাল ঘোষ। তিনি অতি গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন। রংপুরের সপ্তপুষ্করিণী স্কুলে হেড্‌মাষ্টারী করিতে করিতে একদিন সমস্ত সার্টিফিকেটগুলি পোড়াইয়া সংসার হইতে বাহির হইলেন। চিত্রকূটে কয়েকবৎসর তপস্যা করিয়া শেষ জীবনে ওঙ্কারনাথে একটি গহ্বরে একাসনে বসিয়া মৌনী থাকিয়া বহুকাল তপস্যা করেন। এই সময় একাসনে বসিয়া বসিয়া তাঁহার চরণদ্বয় অবসন্ন হইয়া যায়, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-লাভ না করিয়া উঠিবেন না, ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল। ধর্ম্মগ্রহণের জন্য গুরুগ্রহণ করিবেন না ইহাও তাঁহার একটি প্রধান সঙ্কল্প ছিল। এই অবস্থায় তাঁহার দেব-দর্শন হইত; এই সকল কথা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের "তত্ত্ব-কৌমুদী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিণামে যে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাঁহার শেষ পত্রের মর্ম্মেই তাহা বুঝা যায়। তিনি নিজে "মৌনীবাবা" নাম গ্রহণ করেন নাই, এ নাম ওঙ্কারনাথের লোকেরা প্রদান করিয়াছিল।

* ভ্রাতার দেহত্যাগের পরে তাঁহারই পবিত্রাত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয় গুরু ও মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন।

মৌনীবাবার জীবনের অপূর্ব্ব ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া কুঞ্জবাবুর কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী নির্ঝরিণী ঘোষ "মৌনীবাবা" নাম দিয়া একখানি অতি মনোহর পুস্তিকা প্রচারিত করিয়াছেন। সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মার্থীরাই উহা পাঠ করিয়া পরমোপকার প্রাপ্ত হইবেন।

মৌনীবাবার সেই পত্র লইয়া সতীশবাবুর সঙ্গে আমি প্রয়াগধামে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবকে পত্রখানি প্রদান করিলাম। তিনি প্রথমে যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা বুঝিলাম যে, তিনি মৌনীবাবাকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য ওঙ্কারনাথ যাইবেন ; কিন্তু পরে একদিন বলিলেন, "সেখানে যাইতে হইবে না।" আমরা বুঝিলাম, তিনি সূক্ষ্মদেহে সেখানে গিয়া তাঁহাকে দীক্ষা দান করিয়াছেন। এরূপ অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করার আমাদের যথেষ্ট কারণ ছিল। এই সময়ের পরে মৌনীবাবা প্রায় বৎসরাধিককাল দেহে ছিলেন ; কিন্তু আর কখনও কোন প্রার্থনা জানাইয়া লিখেন নাই। তিনি যদি দীক্ষা না পাইতেন তবে তাঁহার ন্যায় ব্যাকুলাত্মা কখনই নিরস্ত থাকিতে পারিতেন না। আমাদের বিশ্বাসের কারণ শুধু ইহাই নহে, প্রকৃত কারণ লিখিতে ইচ্ছা করি না, কেননা, সে সকল বিশ্বাস করা বুদ্ধি-সাপেক্ষ নহে।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের সঙ্গে থাকিয়া কুম্ভমেলায় আমরা অতুল আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। তিনি আমাদিগকে অনেক মহাপুরুষের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। এই মহা-মেলার বিবরণ অবলম্বন করিয়াই আমি "প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা" নামে পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। এখানে আর সে সকল কথার উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না।

মহাপ্লাবনের সময় যেমন ক্ষুদ্র গোষ্পদটিও সমুদ্রের সঙ্গে মিলিয়া যায়, সেইরূপ এই মহা-মহোৎসবে আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণেও মহাত্মাদিগের বৈরাগ্যের ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছিল। গরম কোট, গরম গেঞ্জী, পরিধানের ধুতি, শীতের একমাত্র সম্বল, গায়ের কম্বল সকলই বিতরণ

করা হইয়াছে। একখানি ধুতি ছিঁড়িয়া দুইখানা করিয়া বহির্ব্বাস করা হইয়াছে। আর একটি বন্ধু সার্টের রূপার বোতামগুলি খুলিয়া একজনকে দিয়া দিয়াছেন। মাঘের দারুণ শীতে প্রয়াগের মতন স্থানে, গঙ্গাগর্ভে, বালুকার উপরে চাটাই বা কম্বল বিছাইয়া সকলে শয়ন করিতাম। তাঁবুতে সর্ব্বদা অগ্নিকুণ্ড থাকিত, মনের মধ্যেও উৎসাহের অগ্নি ছিল; তাহাতে নামে, প্রাণায়ামে, গুরুসঙ্গে, সাধুসঙ্গে, বন্ধুসঙ্গে, শরীর, মন উভয়ই গরম থাকিত, শীতের ক্লেশ কিছুই অনুভব করিতাম না।

কুম্ভমেলার সে আনন্দের কথা অল্প কথায় বলা যায় না, সংক্ষেপে কথা এই যে, সে কয়দিন আমরা পৃথিবীর কোনও ধার ধারি নাই, ইহারই নাম বোধ হয় স্ব-শরীরে স্বর্গভোগ।

এই মেলায় আসিয়া প্রথম আমি আমাদের ক্ষুদ্রত্ব ভাল করিয়া বুঝিলাম। এক একজন মহাপুরুষের এক একটি অপূর্ব্ব ভাব। সে ভাব, তত উচ্চ ভাব, আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। মহাত্মা অর্জ্জুনদাসের দয়ার চিত্র চিরকালের জন্য প্রাণে লাগিয়া আছে।

আমার "কুম্ভমেলা" গ্রন্থে তখন লিখিয়াছিলাম "কিসের সহিত তুলনা করিব? কি স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, কেমনে তাহার বর্ণনা করিব? এই একমাসকাল গঙ্গার চড়ায় যাহা মিলিয়াছিল তাহাকে কি বলিব? মহোৎসব বলিব, স্বর্গরাজ্য বলিব, কিছুই বলিয়াত প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না! চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! পুষ্পাভরণ-ভূষিত সেফালিকা তরু শরদের নৈশ-ঝটিকায় কুসুম-শূন্য হইয়া প্রভাতে যেরূপ শ্রীহীন ও সৌরভ-হীন হয়, মেলাবসানে ত্রিবেণী-ক্ষেত্রও সেইরূপ শ্রীশূন্য গৌরব-হীন হইয়াছে। সেই গঙ্গা-যমুনার মিলনস্থলে প্রকাণ্ড চড়াভূমিটী

মৃত-বৎসা বিধবার পতি-পুত্র-হীন-বক্ষঃস্থলের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে সম্পদ্‌শূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! এক প্রকাণ্ড মহানগর একদিনের মধ্যে মহাপ্রান্তরে পরিণত হইল। দ্বাদশবৎসর প্রয়াগ-ভূমি সতৃষ্ণ-নয়নে আবার সেই শুভদিনের প্রত্যাশায় চাহিয়া রহিল। * * * কুম্ভ-মেলা ফুরাইল, চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। কৃষ্ণ-শূন্য-বৃন্দারণ্যের ন্যায় শূন্যভূমি নীরব পড়িয়া রহিল। যে দৃশ্য দেখিয়াছি, জাগ্রতে স্বপ্নে তাহার ছায়া প্রাণের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শুষ্কতার সময় এখনও তাহা ভাবিলে প্রাণ সরস হয়। পাপে তাপে এখনও সে দৃশ্য হৃদয়কে সতেজ রাখে। মেলা ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সাধুরা দেশ-দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছেন, আমরাও বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি; কিন্তু এখনও মনে ইচ্ছা হয়, সেই পুণ্যসলিলা গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে, সেই ত্রিবেণী-ক্ষেত্রের প্রকাণ্ড চড়াভূমিতে, সেই ভক্ত-পদরজঃ-পূত প্রশস্ত পুণ্য-ক্ষেত্রে একবার "হরি হরি" বলিয়া গড়াগড়ি দিয়া তাপিত-প্রাণ শীতল করি।

মনের কথা

শ্রীশ্রীগুরুদেবকে একটি মনের কথা বলিব বলিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম। কথাটা তেমন গোপনীয় না হইলেও উহা অন্যের কাছে বলিতে আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ঠাকুরের কাছে সর্ব্বদাই লোক থাকে, তাঁহাকে একাকী পাওয়ার কিছুমাত্র সম্ভাবনা দেখিলাম

না। একদিন প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল, আজ সে কথাটা না বলিলেই নয়। শ্রীগুরুদেব সকলের সঙ্গে একত্রে আহারে বসিয়াছেন, অন্যান্য সকলের খাওয়া শেষ হইয়াছে। এমন সময় একটু একটু বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেটি অকাল-বর্ষা। মাঘের শীতল বাতে, তাহাতে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাতে বেশ শীত লাগিতেছিল, ঠাকুর সকলকে বলিলেন, "তোমাদের খাওয়া হইয়াছে, শীঘ্র উঠিয়া যাও।" তাঁহাকে ফেলিয়া কে উঠিবে?" কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সহিত আবার "সকলে উঠে যাও" বলিলেন। কাজেই সকলে উঠিলেন, আমিও আসন ত্যাগ করিলাম। কিন্তু সরিয়া গেলাম না। ধীরে ধীরে বলিলাম, "একটা কথা না বলিতে পারিয়া আমার মনে বড়ই ক্লেশ হইতেছে, অথচ সকলের কাছে বলিতে পারিতেছি না।" এতটা বলাতেই ঠাকুর বলিলেন, "তা' এতে আর ক্লেশ করা কেন? মুনিঋষিদিগেরও ইহা হইত, ইহাতে সঙ্কোচের কোনও কারণ নাই।" আরও একটু খুলিয়া বলিলেন, যাহাতে আমি নিঃসংশয়রূপে বুঝিলাম যে, আমার মনের কথা আমি খুলিয়া না বলিলেও তিনি বুঝিয়াছেন। আর তাঁহার কার্য্য দেখিয়া ইহাও বুঝা গেল যে, কোন কথা বলার জন্য আমার প্রাণের ব্যাকুলতা জানিয়াই তিনি আমাকে অবসর প্রদান করিলেন। আমি যতটুকু ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলাম, তাহাতে কেহই অনুমান করিয়া উত্তর দিতে পারে না, বিশেষতঃ উত্তরটির মধ্যে প্রশ্নটি পরিস্ফুট ছিল। যে ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা আমি এবং মনোরমা ভিন্ন অন্য কেহই জানিত না, অন্য কাহারও জানিবার সম্ভাবনাও ছিল না। শ্রীগুরুদেব আমার মনের কথা

জানিয়াছেন, সেই জন্য আমাকে গোপনে কথা বলিতে অবসর দিয়াছেন, এগুলি আমার নিকট মোটেই অলৌকিক ব্যাপার নহে। সামান্য সাধকদিগের যে সকল অসাধারণ শক্তি দেখিয়াছি, সে সমস্ত অতি আশ্চর্য্য। তবে যাঁহারা ভক্তি-মার্গ অবলম্বন করেন, তাঁহারা ঐশ্বর্য্য কামনা করেন না। বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন যে, অষ্টসিদ্ধি বৈষ্ণবের চরণ সেবা করিতে ইচ্ছুক হয় কিন্তু বৈষ্ণব তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন, কেন না, ঐ সকল ঐশ্বর্য্যের স্পর্শে নামানন্দ নষ্ট হয়। তবে তাঁহারা হাজার চাপিয়া চলিলেও সময় সময় ঘটনা উপলক্ষে উহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শেষ জীবনে মনোরমা ঘরাও কথাবার্ত্তার মধ্যে এমন দুই একটা কথা বলিয়া ফেলিতেন, মনে হইত যেন, তিনি আমার মন দেখিতেছেন। গুরুদেব সম্বন্ধে এই ঘটনাটি আমি তাঁহার অসাধারণ শক্তির দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিতেছি না, সুখে দুঃখে পাপে তাপে তিনি যে কিরূপ দরদী ছিলেন, মনের মলিনতা ধোয়াইয়া কেমন পরিষ্কার করিয়া দিতেন, তাহাই আজ মনে পড়িতেছে। এ শক্তি উপদেশের শক্তি নহে, মনের শক্তি।

যিশুখৃষ্ট বিদেহ-মুক্ত

শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন,"বিশুখৃষ্ট বিদেহ-মুক্ত" ছিলেন। এলাহাবাদে একদিন সতীশ বাবু এবং আমি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তখন তিনি সেখানে বাস করিতেছিলেন।

মিত্র মহাশয় যিশুখৃষ্ট সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয়ের মন্তব্য জানিতে পারিয়াছিলেন, তাই তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যিশুখ্রীষ্ট যদি বিদেহ-মুক্ত ছিলেন, তবে তিনি দৈনিক খাদ্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন কেন? আমার মনে তখনই একটি উত্তর আসিল, আমি বলিলাম যে, যিশু তাঁহার স্বর্গস্থ পিতাকেই একমাত্র দাতা জানিতেন। ঈশ্বর ধর্ম্মদান করিবেন এবং অন্য কেহ রুটী দান করিবে, এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না, তাই তিনি স্বর্গস্থ পিতার নিকট যেমন আত্মার জন্য দৈনিক বল চাহিয়াছেন, শরীরের জন্যও দৈনিক খাদ্য চাহিয়াছেন। তিনি এক ভিন্ন দ্বিতীয় দাতা মানিতেন না এবং সেই দাতার সঙ্গে আপনাকে অভিন্ন জ্ঞান করিতেন, সুতরাং তিনি বিদেহমুক্ত না হইবেন কেন? আমার উত্তর শুনিয়া মিত্রমহাশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে এই একটি অসাধারণ গুণ আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, কেহ তাঁহার প্রশ্নের বা সন্দেহের উত্তর দিতে পারিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিতেন। অনেক সুবিখ্যাত সজ্জনের মধ্যেও এই দোষ দেখা যায় যে, তাঁহারা নিজে যে বিষয় মীমাংসা করিতে পারেন নাই, অন্যে তাহার সদুত্তর দিলে কখন কখন তাঁহাদের অভিমান আহত হয়; কিন্তু স্যার মিত্র মহাশয়ের মধ্যে এই ভাবের বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখি নাই। এইরূপ সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা ধর্ম্ম-জীবনলাভের পরম সহায়স্বরূপ।

মেলা পরিত্যাগ

কলিকাতায় যাইব, কিন্তু সঙ্গে পাথেয় নাই, ধুতি নাই, জামা নাই, গায়ের কাপড় নাই; এ বেশে ত আর সভ্যসমাজে যাওয়া যায় না। এক গুরুভ্রাতা একটি সার্ট দিলেন। এলাহাবাদ সহরের বাসায় স্নান করিয়া মেলায় গিয়াছিলাম, সেখানে ভিজা কাপড়খানি ও জুতা জোড়াটি পড়িয়াছিল। সে বাসায় আসিয়া কাপড় ও জুতা পাইলাম; সুতরাং আর কোনও অভাব রহিল না। পাথেয়টা মনে হয় যেন যোগজীবন গোস্বামী (শ্রীশ্রীগুরুদেবের পুত্র) মহাশয় দিয়াছিলেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ রায় (১০১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট) এবং আমি এক সঙ্গে কলিকাতা রওয়ানা হইলাম।

রাস্তায় মৃজাপুর ষ্টেষণে আমরা দুই জনায় দুইটি সুন্দর কুঁজো কিনিয়া লইলাম। মৃজাপুরের সোরাই খুব বিখ্যাত। কয়েকটা ষ্টেশন অতিক্রম করার পরে একজন লোক গাড়ী হইতে তাড়াতাড়ি নামিতে যাইয়া আমার একখানি জুতো গাড়ী হইতে লাইনের উপর ফেলিয়া দিল। অবিলম্বে গাড়ী ছাড়িল, আমি অন্য জুতাটিও সেইখানে ফেলিয়া দিলাম। ভাবিলাম, দুখানি পাইলে কাহারও কাজে লাগিতে পারিবে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা হাবড়া ষ্টেশনে নামিলাম। অভয় বাবু তাঁহার তখনকার বাসাবাড়ী মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে গেলেন। আমি ট্রামে করিয়া ভবানীপুর যাওয়ার জন্য হাঁটিয়া পুল পার হইলাম। পুল

পার হইয়া ট্রাম-রাস্তার উপরে একখানি ফলের দোকান দেখিয়া ভাবিলাম, ছেলেদের জন্য কিছু নারিকেলী কুল কিনিয়া লইয়া যাই। ফলওয়ালার দোকানে সেই সুন্দর কুঁজোটি রাখিয়া কুল গণিয়া লইলাম। এমন সময় ট্রামগাড়ী আসিয়া পড়িল। ত্রস্ত হইয়া দোকানীকে পয়সা দিয়া গাড়ী ধরিলাম। অনেক দূর যাওয়ার পরে মনে হইল, সাধের কুঁজোটি কুলওয়ালার দোকানে ফেলিয়া আসিয়াছি। যে কয়টি পয়সা টিকেট করিয়া বাঁচিল, তাহা গাড়ীর বেঞ্চের উপর রাখিলাম। ভবানীপুরে জগুবাবুর বাজারে নামিবার সময় সেই পয়সা কয়েকটি ফেলিয়াই নামিলাম। এই সময় একজন বলিলেন, "মহাশয়, পয়সা ফেলিয়া যাইতেছেন," যাহা হউক, তবু শেষ রক্ষা হইল।

বাড়ীতে পৌঁছাইয়া যখন কথায় কথায় কাপড়, কোট, গেঞ্জি, জুতা, কুঁজা ও পয়সার বিবরণ বলিলাম, তখন শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে বেশ একটু হাসির লহর উঠিয়াছিল। মনোরমা হাসিয়া বলিলেন, "ভাগ্যে তোমার হাত-পাগুলি শরীরের সঙ্গে জোড়া ছিল, নৈলে আমাদের আজ বড়ই মুস্কিল হ'তো।" আমি হারিয়া যাইতে রাজি ছিলাম না, বলিলাম, "ওগো, আমার দোষ নাই, এটি সাধুসঙ্গের ফল, যে ত্যাগ, যে বৈরাগ্য দেখিয়াছি, তা'তে কি এ সকল ক্ষুদ্র জিনিসের কথা মনে থাকে?"

আবার সত্যকুমার

শ্রীগুরুদেব "কুম্ভমেলা" হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা কুমারটুলীতে ছিলেন। এখান হইতে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে গিয়াছিলেন। সত্যকুমার গুরুদেবের সঙ্গে নবদ্বীপ যাওয়ার পূর্ব্বে একদিন আমাদের বাড়ীতে আসিয়া মনোরমাকে বলিলেন, "খুড়ীমা, নারিকেল-কোরা ও চিনি দিয়া আমার চিঁড়া খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে।" মনোরমা বলিলেন, "আপনি অপেক্ষা করুন, আমি বাজার হইতে আনাইতেছি।" সত্যকুমার বলিলেন, "আজ এখনই আমাকে যাইতে হইতেছে, আমি নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনার নিকট চাহিয়া খাইব।" সত্যকুমার আর ফিরিলেন না। আমার "কুম্ভমেলা" নামক গ্রন্থ তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে গিয়া যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

"সাধুনিষ্ঠ পরলোকগত—

শ্রীমান্ সত্যকুমার গুহ ঠাকুরতা—

ভগবদ্ভক্তেষু।—

প্রিয়তম,

সংসারের সম্বন্ধে তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে গুরু-ভাই ছিলে। প্রথম সম্পর্ক লোপ হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় সম্বন্ধ অনন্তকাল থাকিবে। তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছ, মৃত্যু আমাদিগের নিকট হইতে তোমাকে পৃথক্ করিয়াছে; কিন্তু তোমার

লজ্জামাখা মধুর প্রেম, অকপট দীনহীন ভাব, একস্রোত ধর্ম্মানুরাগ, প্রাণগত সাধুভক্তি, আমাদিগের নিকট তোমাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। সংসারের আত্মীয়েরা তোমাকে চিনিতে পারে নাই; অপার্থিব ধন তুমি, অনাদরে গড়াগড়ি গিয়াছ! আমরাই কি প্রাণ ভরিয়া তোমাকে আদর করিতে পারিয়াছি? এত শীঘ্র যে তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে, তাহা আমরা ভাবি নাই। তুমি ত চলিয়া গিয়াছ, আমাদিগকে নির্জ্জনে সজল-নয়নে তোমার নাম স্মরণ করিতে হয়। তোমার ন্যায় সৌভাগ্যশালী কে? প্রয়াগধামে কুম্ভমেলায় একমাসকাল সাধুসঙ্গে থাকিয়া, তথা হইতে নবদ্বীপধামে প্রেমাবতার মহাপ্রভুর জন্মোৎসবে যোগদান করিয়া অদ্বৈতপাট শান্তিপুরে গুরু এবং গুরুভাইদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া হরিনাম শুনিতে শুনিতে তুমি শান্তিধামে গমন করিয়াছ! একটি ধর্ম্মস্রোতের মধ্য দিয়া তুমি চলিয়া গিয়াছ! এত সৌভাগ্য কাহার হয়? তোমার ন্যায় পুণ্যবান্ কে? মৃত্যুশয্যায় এমন করিয়া কে বলিতে পারে, 'মৃত্যুর জন্য আমার কোন ভয় নাই, রোগ-যন্ত্রণা ভিন্ন আমার আর কোন যন্ত্রণা নাই, আমি শান্তির সহিত যাইতেছি?' পুণ্যবান্, তোমারই পুণ্যে তোমার সাধ্বী স্ত্রী সান্ত্বনা লাভ করিবেন এবং আমরাও জুড়াইব।

"প্রিয়তম, আমাদের কুম্ভমেলার স্মৃতির সহিত তোমার স্মৃতি জড়াইয়া রহিয়াছে; বিশেষতঃ সাধুদিগের মর্য্যাদা তোমার অধিক কেই বা বুঝিবে? তাই সাধু-পদরজোমাখা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তোমারই পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম।"

আবার সত্যকুমার

যখন শ্রীগুরুদেব নবদ্বীপ হইতে আসিয়া জমিদার শিষ্য ৺রাখাল-চন্দ্র রায় মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থিত ভবনে উঠিলেন, তখন আমরা ভবানীপুর হইতে সুকিয়া ষ্ট্রীটে এক পটুয়াদের বাড়ীতে উঠিয়া আসিলাম। এই সময় সত্যকুমারের দেহত্যাগের সংবাদ আমাদের নিকট আসিল। আমরা সকলেই শোকাকুল হইলাম। মনো-রমা অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন এবং সত্যকুমারের তৃপ্তির জন্য নারিকেল-কোরা, চিনি ও চিড়া ভোগ দিয়া গুরুভ্রাতাদিগকে ভোজন করাইলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের আগমনে রাখালবাবুর বাড়ী নিত্যানন্দ ও নিত্যোৎসবময় হইয়া উঠিল। সে আনন্দের বর্ণনা হয় না। ধর্ম্ম-পিপাসু নরনারীগণ মধুক্রমে মধুমক্ষিকার ন্যায় তাঁহাকে ঘেরিয়া থাকিত। পাঠ, কীর্ত্তন, ভগবৎ-প্রসঙ্গ, নাম-জপ, ধ্যান, ধারণা দিবারাত্র চলিতেছে। এক ঘণ্টাকাল যিনি অনুপস্থিত থাকিলেন, তাঁহার লোকসানের অবধি নাই। কখন কি হইয়া যায়, তাহার ঠিক নাই। কম্বলীটোলা, শোভাবাজার প্রভৃতি স্থানের যে সকল শিষ্যগণ অল্প বেতনে আফিসে কার্য্য করেন, সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরে বাড়ী আসিয়া নাকে-মুখে ভাত গুঁজিয়া ছুটিয়া আসিতেন এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি পরিজনগণের কথা ভুলিয়া গিয়া সারারাত্রি ঠাকুরের সঙ্গ-সুখ-সম্ভোগ করিতেন। ভবানীপুর, কালীঘাট হইতেও অনেকে আসিতেন, নিকটস্থ ভক্তগণের ত কথাই নাই। এরূপ প্রাণের টান আর কোথাও দেখি নাই।

রাখাল-বাবুর দ্বিতলের বিস্তৃত হলঘরে মাদুরের ম্যাটীং ছিল।

ভক্তগণ অনেকে বিনা উপাধানে শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইতেন। উক্ত হলের একপাশে শ্রীগুরুদেবের আসন ছিল। তিনি ২৪ ঘণ্টাকাল সেই আসনে উপবিষ্ট থাকিতেন। বেলা ৯টার সময় একবার হাতমুখ ধুইতে উঠিতেন। কোন কোন দিন বিকালবেলায় অল্পক্ষণের জন্য বারান্দায় বেড়াইতেন। এতদ্ব্যতীত আর সমস্ত দিবা-রাত্রিই একাসনে উপবিষ্ট। পাঠ, কীর্ত্তন প্রভৃতি দৈনিক কার্য্য ঠিক ঠিক ঘড়ি ধরিয়া চালত, আগন্তুক কোনও ঘটনাই নিয়মভঙ্গ করিতে পারিত না। এই সময় শ্রীগুরুদেব মৌনী ছিলেন।

জমিদার রাখাল বাবু এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী "প্রেমলতা", "স্নেহলতা" প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িত্রী, ৺কুসুমকুমারী রায় যেরূপভাবে গুরুদেবের ও তাঁহার সঙ্গীয় শিষ্যবর্গের সেবা করিয়াছেন, তাহা অতীব আনন্দের বিষয়। শিষ্যগণ একমাত্র গুরু ভিন্ন জগতের আর কোনও মনুষ্যের ধার ধারেন না, সাংসারিক পদগৌরব (position) তাঁহাদের গ্রাহ্যের মধ্যে নহে। এমন একটি দলকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইলে ধনী ব্যক্তিদিগকে সকল প্রকারের বড়মানুষী ও দেমাক পরিত্যাগ করিয়া কতদূর নম্র হইতে হয়, কতটা সহিয়া যাইতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিবে না। কিন্তু রাখাল বাবু এ ক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। আপনাদিগের পদমর্য্যাদা ও অবস্থা ভুলিয়া গিয়া ভক্তের ভাবেই তাঁহারা গুরুসেবা ও ভক্তসেবা করিয়াছেন।

আমাদের বাটীতেও অনেক আত্মীয়স্বজন ও গুরুভ্রাতা এবং সাধনপ্রার্থীদিগের সমাগম হইয়াছিল। বাড়ীতে লোক ধরিত না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহারা অধিকাংশই গুরুদেবকে দেখার

জন্য বিদেশ হইতে আসিয়াছেন। আমাদের বাড়ীতেও তখন আনন্দ ধরিত না। আমাদের যাহা কিছু অভাব ছিল অন্নবস্ত্রের, কিন্তু এ সময় নানারূপে সে অভাব পূরণ হইয়া যাইতেছিল।

আমার সহোদরা ভগিনী, তাঁহার পুত্রকন্যাগণ লইয়া আসিয়াছেন। মনোরমার সহিত বাস করিতে দিদির আনন্দের সীমা থাকিত না। আমার ভাগিনেয়ী শ্রীমতী বসন্তকুমারী ও শ্রীমতী কুসুমকুমারী গোঁসাইজীর মন্ত্রশিষ্য।

৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর

আমরা যখন শ্যামবাজারে, তখন বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য একদিন ভবানীপুর পদ্মপুকুর হইতে হাঁটিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হইলেন এবং জানাইলেন যে, তাঁহার খরচের টাকা নাই। সে দিন আমি অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে (কি তাঁহার ছেলেকে) লইয়া ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে গেলাম।

উক্ত জমীদার মহাশয়ের সহিত পূর্ব্বে কখনও আমার সাক্ষাৎ ঘটে নাই, কিন্তু তিনি আমাকে পরোক্ষভাবে জানিতেন। আমার ইচ্ছাশক্তি (will force) ও মেসমেরিজাম প্রভৃতির সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছিল, মনোরমার ধ্যান-ধারণার কথাও তিনি জানিয়াছিলেন। পাঠক ১ম খণ্ডে সে বিষয়ের পরিচয়ও পাইয়াছেন।

এই সময় উক্ত ঠাকুর মহাশয় সাধুসঙ্গ ও ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ ভালবাসি-

তেন, তাঁহার বাড়ীতে অনেক সাধু আশ্রয় পাইয়াছিলেন, এই সকল সাধুসেবার জন্য তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

আমি আমার নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিলে অবিলম্বে শ্রীমান্ মহেন্দ্র ও শ্রীমান্ ভানু (ঠাকুরবাবুর দুটি প্রিয়পাত্র) আমাকে আদর সহকারে ঠাকুর বাবুর নিকট উপস্থিত করিল। দেখিলাম, শ্রদ্ধাস্পদ ৺রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং মজিলপুরের শ্রদ্ধাস্পদ ৺কালীনাথ দত্ত মহাশয় তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন; আমি তিন জনাকেই প্রণাম করিলাম। বিদ্যারত্ন মহাশয় অথবা দত্ত মহাশয় ইঁহাদের মধ্যে (আমার ঠিক মনে নাই) একজন আমাকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বাবুকে বলিলেন যে, "লোক ভাল।" ঠাকুর বাবু বলিলেন, "প্রথম প্রথম অনেকেই 'ভাল' থাকে, শেষে 'কালো' হইয়া যায়।" কথাটা শুনিয়া আমার মনে হইল যে, এখানে বেশীক্ষণ বসা উচিত নহে।

ধনী লোকদিগের সহিত আমরা ঘনিষ্ঠভাবে মেশামেশি করি, শ্রীগুরুদেবের সেরূপ ইচ্ছা ছিল না। কাকিনীয়ার রাজা বদান্যবর ৺মহিমারঞ্জন রায় মহাশয় আমাকে বিশেষ ভালবাসিতেন, এমন কি, তিনি আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, "আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আপনার বক্তৃতা ও কথা শুনিতে পারি।" তিনি আমাকে কাকিনীয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া একবার মণিঅর্ডার যোগে পাথেয় পাঠাইলেন। আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট রাজাবাহাদুরের আমার উপর ভালবাসার কথা ও প্রেরিত মণিঅর্ডারের কথা বলিলে, তিনি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, সেখানে না যাওয়াই ভাল।

আমি মণিঅর্ডারের টাকা ফিরাইয়া দিয়া রাজাবাহাদুরকে পত্র লিখিলাম যে, বিশেষ কারণে আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের "ভাল লোক কালো" হওয়ার মন্তব্য শুনিয়া আমার মনে সেই কথা জাগিল। আমি যে কার্য্যে গিয়াছিলাম, অবিলম্বে তাহা ঠাকুর বাবুকে জ্ঞাপন করিলাম। তিনি সেই অনাথ-পরিবারের (বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের) সাহায্যার্থ দশটাকা দান করিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেছিলাম, কিন্তু তিনি অনুরোধ করিয়া আমাকে বসাইলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে একখানি পদ্যপুস্তক আমার হাতে দিয়া বলিলেন যে, "এই গ্রন্থকার কিছু সাহায্য চাহিতেছেন, শুনিয়াছি, তুমি সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া থাক ; এই পুস্তকখানি পড়িয়া আমাকে বলিয়া যাইবে যে, গ্রন্থকার সাহায্য পাইবার যোগ্য কি না ?"

আমি বুঝিলাম যে, এই কার্য্যব্যপদেশে তিনি আমাকে পুনরায় তাঁহার নিকট যাইতে বাধ্য করিলেন। আমি কয়েক দিন পরে তাঁহার নিকট যাইয়া উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে আমার মন্তব্য প্রকাশ করিলাম ; গ্রন্থকার অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। এই দিন ঠাকুর বাবু আমার সঙ্গে নানা প্রকারের প্রসঙ্গ করিলেন ; তন্মধ্যে প্রেততত্ত্ব ও ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় কথা ছিল। আমি বুঝিলাম যে, এই সকল চর্চ্চা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অনুরাগী। ইহার পরে তিনি মাঝে মাঝে আমাকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি একদিন পরম প্রীতিভাজন শ্রীমান্ রেবতীমোহন সেনকে সঙ্গে

করিয়া ঠাকুর বাবুর নিকট গিয়াছিলাম, শ্রীমানের মধুর সঙ্গীতে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

একদিন ঠাকুর বাবু আমাকে বলিলেন, "গোঁসাইজীর সঙ্গে একবার আমার দেখা করাইতে পার?" আমি বলিলাম, "তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে প্রতিবন্ধকতা ত কিছুই নাই, সকলেই যখন-তখন যাইতেছেন।" তিনি বলিলেন, "তুমি গোঁসাইজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিবে।"

এইখানে একটু পূর্ব্ব-ইতিহাস বলিতে হইল। এই সময়ের প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে ঠাকুর বাবু গোঁসাইজীকে তাঁহার বাড়ীতে নিয়া যাওয়ার জন্য শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন (সন্ন্যাসের নাম রামানন্দ স্বামী) মহাশয়কে গুরুদেবের নিকট পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তখন যাইতে স্বীকৃত হন নাই। কেননা, বিশেষ কারণ ব্যতীত তিনি আসন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতেন না। ইহার পরে ঠাকুর বাবু বলিয়া পাঠান যে, তিনি নিজেই সাক্ষাৎ করিয়া নির্জ্জনে কিছু কথা বলিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীগুরুদেব প্রত্যুত্তরে বলেন যে, তাঁহার ঘরে সকলে ইচ্ছামত আসে, বসে এবং গমন করে, সেখানে কাহারও স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া হয় না। সুতরাং ঠাকুর বাবু যখন আসিবেন, তখন যে ঘর নির্জ্জন হইবে, এমন কোন কথা নাই। আরও বলিলেন যে, তিনি অতি সামান্য ব্যক্তি, ঠাকুর বাবুর আশ্রয়ে কত সাধু বাস করিতেছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা তিনি অধিক কি বলিবেন?

অভিজাত সম্প্রদায়ের এত বড় একজন প্রসিদ্ধ ধনী ও ভূম্যধি-

কারীর ইহাতে অভিমানে আঘাত লাগা খুবই স্বাভাবিক ; কিন্তু কালী-কৃষ্ণ বাবুর হৃদয়ের গঠন ভিন্ন-প্রকৃতির ছিল। যে দিকে তাঁহার মন একবার ধাবিত হইত, কোন প্রকারের বাধাই সেই মনের গতি প্রতিরোধ করিতে পারিত না ; সুতরাং গোঁসাইজী বাহ্যতঃ যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে ঠাকুর বাবুর মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল না, বরঞ্চ দর্শন-লালসাকে অধিকতর তীব্র করিয়া তুলিল। প্রথম বারে নিজ ভবনে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব, দ্বিতীয় বারে নির্জ্জন সাক্ষাতের প্রস্তাব, তৃতীয় বারে চুক্তি-শূন্য-সাক্ষাতের প্রস্তাব, আকর্ষণের ক্রম-বিকাশ দেখাইতেছে।

আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবকে ঠাকুর বাবুর অভিলাষ জানাইলাম, তিনি বলিলেন যে, আগামী কল্য সকাল ৭টার সময় আসিতে পারেন। ৮টার পরে তাঁহার পাঠের সময়, এই জন্যই বোধ হয় সাতটার সময় আসিতে বলিলেন।

ঠাকুর বাবু আমার মুখে এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং প্রভাতে ৭টার পূর্ব্বে আমাকে তাঁহার বাড়ী যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি পরদিবস যথাসময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। গাড়ী প্রস্তুত ছিল, তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে রওনা হইলেন। আমাদের সঙ্গে মনে হয় ভানু কিম্বা মহেন্দ্র ছিল। শ্রীমান্ ভানু মহেন্দ্রের মতনই ঠাকুর বাবুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে তখন শ্রীগুরুদেব থাকিতেন। আমি নীচের তলায় সিঁড়ির নিকটে জুতা ছাড়িলাম, ঠাকুর বাবু এবং তাঁহার সঙ্গীও সেইখানে জুতা ছাড়িয়া উপরে উঠিলেন।

শ্রীগুরুদেব মর্য্যাদা-রক্ষার দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য তাঁহাকে একখানা আসন দিতে বলিলেন। একজন শিষ্য আসন বিস্তৃত করিয়া দিলে, ঠাকুর বাবু গোঁসাইজীকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া স্বহস্তে আসনখানি সরাইয়া রাখিয়া ভূমিতে উপবেশন করিলেন; বলা বাহুল্য যে, তাঁহার ব্যবহারেও আমরা সকলে মর্য্যাদা-রক্ষার উপদেশ পাইলাম। বস্তুতঃ যে সৌভাগ্যশালীর হৃদয়ে সাধু-ভক্তির সঞ্চার হয়, সেই ভক্তির দ্বারাই তাঁহার অন্তরের অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়া যায়। বিষয়-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ মাথা নীচু করার এমন স্থান আর কোথায় পাইবেন? শ্রীকবির সাহেব বলিয়াছেন যে, সাধুর চরণে মস্তক অবনত করিলে পাপের সমস্ত গাঁটুরী-মুটুরী মাথা হইতে পড়িয়া যায়।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল ঠাকুর বাবুর সঙ্গে শ্রীগুরুদেবের কথোপকথন হইল। পরে তিনি প্রণাম করিয়া উঠিলেন এবং আমাকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। বাড়ীতে পৌছাইয়া আমাকে বলিলেন, "দেখ, আমি ৪৫ পঁয়তাল্লিশ জন সাধু কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছি, হৃদয়ে যা' কিছু সাধু-ভক্তি জন্মিয়াছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তুমি তোমার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিবে, সাধু চিনিয়া লওয়ার উপায় কি?"

আমি ফিরিয়া আসিয়া গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন যে, সাধু চিনিয়া লওয়া বড়ই কঠিন কার্য্য, তবে বাহিরের পাঁচটি লক্ষণ দ্বারা কতকটা বুঝা যাইতে পারে। (১) প্রকৃত সাধু কখনও কোন ধনীর আশ্রয় গ্রহণ করেন না, (২) পরনিন্দা করেন

না, (৩) আত্ম-প্রশংসা করেন না, (৪) কোন প্রকারের বুজরুকী করেন না, (৫) কাহারও ধর্ম্ম-বিশ্বাস নষ্ট করেন না।

আমি এই পাঁচটি লক্ষণ লিখিয়া লইয়া ঠাকুর বাবুকে দিলাম, তিনি পাঠ করিয়া একজন উচ্চ কর্ম্মচারীকে আদেশ করিলেন, 'কাগজ-খানা সাবধানে রাখিয়া দাও।' আমি শ্রীগুরুদেবকে এ কথাও বলি-লাম, তিনি হাসিয়া বলিলেন, "একে সরল-চিত্ত, তাহাতে ধনী ; সুতরাং তাঁহাকে অনেক ঠকিতে হইবে।"

মনোরমার জীবন-চিত্রে ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় সম্বন্ধে এত কথা বলিবার প্রয়োজন কি, অনেকের মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রয়োজন এই যে, এই ঘটনা হইতে আমাদের সাংসারিক জীবনের একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। বিশেষতঃ গুরুদেব-সম্বন্ধীয় কথা আসেপাশে পাইয়া ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না।

মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট

৯১।১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে মাসিক ২০৲ টাকায় একটি এক-তলা বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। এই বাড়ীতে পূর্ব্বে বন্ধুবর শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী থাকিতেন। চট্টগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া অসুস্থ অবস্থায় বন্ধুবরের এই বাসা-বাড়ীতেই চিকিৎসিত হইয়াছিলাম। (১ম খণ্ডে সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে) এখন কলেজ ষ্ট্রীটের প্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয় এই বাড়ী খরিদ করিয়া ইহার

উপরে দ্বিতল ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মৃজাপুর ষ্ট্রীট হইতে একটি সংকীর্ণ গলি এই বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন পশ্চিমদিকের দোতলা বাড়ীতে শ্রীযুক্ত (বর্ত্তমানে রায় বাহাদুর) ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় থাকিতেন, তিনি তখন বোধ হয়, প্রেসিডেন্সি বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণীর সঙ্গে মনোরমার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। ঈশান বাবুর সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা ছিল এবং তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র (বর্ত্ত-মানে প্রেসিডেন্সি কলেজের অন্যতম অধ্যাপক) আমার পুত্রগণের বন্ধু হইয়াছিল, সে ভাব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বাড়ীর সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া-ছিল। আমাদের বাড়ীর পশ্চাতে উত্তর-পশ্চিম-কোণে একটি প্রকাণ্ড বাড়ীর অর্দ্ধাংশ ভাড়া লইয়া শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় (ডাক নাম অভয় বাবু) ও হরিনারায়ণ রায় উভয় ভ্রাতা বাস করিতেন। অভয় বাবুর সহধর্ম্মিণী এবং হরিনারায়ণ বাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। হরিনারায়ণ বাবুর সহধর্ম্মিণী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি ভজনঘাট-নিবাসী ৺কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের দুহিতা। ইঁহাদের বাড়ীর সকলের সঙ্গেই আমাদের অত্যন্ত বান্ধবতা জন্মিল। মনোরমাকে ইঁহারা সকলেই ভালবাসিতেন এবং আমাদের বালক বালিকাদিগকে আত্মীয়ের ন্যায় স্নেহ করিতেন। হরিনারায়ণ বাবুর বালিকা কন্যা শ্রীমতী রাধিকার সহিত আমাদের তৃতীয় বালক শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জনের অত্যন্ত ভাব হইয়াছিল।

বাড়ীর নম্বর এবং সন তারিখ ভুলিয়া যাওয়া আমার স্মরণ-শক্তির একটি বিশেষ রোগ। অন্য হাজার কথা, হাজার গল্প একবার শুনিয়া মনে রাখিতে পারিতাম, কিন্তু বাড়ীর নম্বর ও সন তারিখ মনে রাখিবার সময় আমার স্মৃতি-শক্তি একেবারেই বিলুপ্ত হইত। এই "জীবন-চিত্র" লিখিতে এখন বাড়ীর নম্বরগুলি খুঁজিয়া জানিয়া লইতে হইতেছে; কিন্তু ৯১।১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের নম্বর কখনও ভুলি নাই, ইহার একটি বিশিষ্ট কারণ ছিল। আমাদের চতুর্থ পুত্র যোগরঞ্জনের বয়স তখন অনধিক পাঁচ বৎসর। পাছে বালকটি রাস্তায় বাহির হইয়া বাড়ীর পথ ভুলিয়া যায়, এই জন্য তাহাকে একটি ছড়া মুখস্থ করান হইয়াছিল। সেটি এই :—

বাবার নাম মনোরঞ্জন মায়ের নাম মনা (মনোরমা)
দিদির নাম প্রেমলতা, ভাইটি "টুলু" সোণা।
দাদার নাম সত্যরঞ্জন সবাই ডাকে সতু,
মেজ দাদা নিত্যরঞ্জন সেজ দাদা চিতু। (চিত্তরঞ্জন)
আমার নাম যোগরঞ্জন বাড়ী আমাদের ঠিক্,
একানব্বই এক নম্বর মেছবাজার ষ্ট্রীট্॥

বালক যোগরঞ্জন এই ছড়াটা মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল, এবং বাড়ীর কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই ইহা আওড়াইত। এই জন্যই স্মৃতিশক্তি ৯১।১ নম্বর মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই।

এই বাড়ীতে আমাদের পরিবারে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। কখন কখন এই ছোট বাড়ীটিতে অতিথি-অভ্যাগত লইয়া

২০।২২ জন লোকও বাস করিয়াছেন। শ্রীমান্ রেবতীমোহন সেন, বেণীমাধব দে, বিহারীলাল রায়, বন্ধুবর ৺মোহিনীমোহন রায়, বরিশালের রসিক কবি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি পুরুষগণ এবং মনোরমার জেঠাই-মা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী সুকুমারী প্রভৃতি আত্মীয়গণ বাস করিতেন। মনোরমার সংসারে কাহারও সঙ্কোচ ছিল না। স্থানের সঙ্কুলন হউক বা না হউক, মাটীতে গায়ে গায়ে শুইয়া এবং ডালভাত খাইয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হইতেন। সুখে বাস করার সুবিধা সত্ত্বেও কেহ অন্যত্র যাইতে চাহিতেন না। আমাদের কি সুখের সংসার ছিল, এখনও তাহা মনে করিয়া আনন্দে হৃদয় অভিভূত হয়।

রাঁধুনীর চতুরতা ও মনোরমার ব্যবহার

এই বাড়ীতে গোকুল নামে আমাদের একটি চাকর এবং একটি কায়স্থ-কন্যা রাঁধুনী ছিল। গোকুল বিশ্বস্ত ও অত্যন্ত অনুগত ছিল। রাধুনীটি কথাবার্ত্তায় বড় শিষ্ট, কিন্তু তাহার পেটে পেটে কুবুদ্ধি ছিল। মাঝে মাঝে তাহার হাতখানি ম্যাজিক খেলিত। পাকশালের জিনিসপত্র কি কৌশলে বাহিরে চলিয়া যাইত, কেহ বুঝিতে পারিত না। একদিন কিছু চাউল, আলু ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু একখানি জীর্ণবস্ত্রে বাঁধিয়া একটা ডালা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। ঘরে যাওয়ার সময় কাপড়ে ঢাকিয়া লইয়া যাইবে, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। যখন সে কার্য্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিল, তখন মনোরমা সেই ডালাটি সরাইতে

গিয়া রাঁধুনীর কার্য্যপ্রণালী বুঝিতে পারিলেন ; কিন্তু কাহাকেও কিছু না বলিয়া পূর্ব্ববৎ ডালাখানি দ্বারা জিনিসগুলি ঢাকিয়া রাখিলেন। কার্য্যাবসানে রাঁধুনী কাপড়ের মধ্যে পুঁটলিটি লুকাইয়া লইয়া গেল। মনোরমা দূরে থাকিয়া তাহাও দেখিলেন, কিন্তু তিনি যে জানিয়াছেন, তাহা রাঁধুনীকে জানিতে দিলেন না। রাঁধুনী চলিয়া গেলে তিনি আমাকে এই ঘটনাটি বলিলেন। আমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলাম, "তুমি ত বেশ লোক দেখিতেছি, ঘরের জিনিস চুরী করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া বাধা দিলে না এবং চোরকে কিছুই বলিলে না, এরূপ গৃহিণীপণা কোথায় শিখিয়াছ? চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত? যদি কিছু বলিতে কিংবা হাতে পাতে ধরিতে তোমার সঙ্কোচ জন্মিয়াছিল, তবে যখন দেখিয়াছিলে, তখন জিনিসগুলি সরাইয়া রাখিলে না কেন? তোমার এরূপ ব্যবহার অতি আশ্চর্য্য!"

আমার কথা শুনিয়া মনোরমা ঠোঁট টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "এরূপ দয়া এবং ক্ষমা দেখাইলেই গরীবের সংসার চলিবে ভাল!" তিনি বলিলেন, "দয়া কিংবা ক্ষমার কথা নহে, নিজদের ভাল ভাবিয়াই আমি এরূপ করিয়াছি। আমি যদি জানিতে দিতাম যে, তাহাকে আমি চোর বলিয়া জানিয়াছি, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে জবাব দেওয়া কর্ত্তব্য হইত। অবিশ্বাস জানিতে দিয়া কাহাকেও কাজে রাখিতে নাই। সেরূপ করিলে লোক-জনের সঙ্কোচ নষ্ট হইয়া যায় এবং মুনিবের প্রতিও তাহারা ভালভাব রাখিতে পারে না। এই ভাবে থাকিয়া কার্য্য করিলে মুনিব চাকর কাহারও প্রাণেই শান্তি ও সুখ থাকে না। দাস-দাসীর সঙ্গে মুনিবের এরূপ ভাব থাকা

উচিত, যাহাতে উভয় উভয়কে দরদী বলিয়া মনে করিতে পারে, সে ভাব ভাঙ্গিয়া গেলে পরস্পরের কার্য্য পরস্পরের নিকট বিষের মতন বোধ হয়” ইত্যাদি।

আমি বলিলাম, “তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাড়াইয়া দিলে না কেন?” মনোরমা যাহা বলিলেন, তাহার অর্থ এই যে, আমাদিগকে না জানাইয়া এতগুলি পরিজনকে নানা প্রকারের অসুবিধায় ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি কেমন করিয়া রাঁধুনীকে ছাড়িয়া দিবেন? নিজের শরীর অশক্ত, জেঠাই-মা খাটিয়া খাটিয়া হয়রাণ, এরূপ অবস্থায় অন্য একটি লোক না দেখিয়া উহাকে ছাড়ান কিছুতে কর্ত্তব্য নহে। যে কয়দিন এই রাঁধুনী থাকিবে, ততদিন একটু সাবধান হইয়া চলিলেই চলিবে। আমি বলিলাম, “তোমাকে, এই রাঁধুনীটা চিরকাল বোকা-গৃহিণী বলিয়া মনে করিবে।” মনোরমা হাসিয়া বলিলেন যে, “তাহাতে আর কতই বা ক্ষতি হইবে।” বলা বাহুল্য এই রাঁধুনীকে আর বেশী দিন রাখা হয় নাই। চাকর গোকুল মনোরমাকে মায়ের মতনই ভক্তি করিত ও ভালবাসিত।

বিষম সঙ্কট

এই বাসায় থাকিতে একটি সাংসারিক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। ঘটনাটি বিশেষভাবে বলিতে গেলে অনেক কথা লিখিতে হইবে এবং সে সকল কথা পাঠক-পাঠিকার ভাল লাগিবে না। মোট কথা এই যে, বিষম সঙ্কট, তিন শত টাকার যোগাড় না হইলে আমার একটি

বিশেষ বন্ধুকে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইবে, আমিই সেই বিপদের মূলীভূত কারণ হইব। এই বিপদ্‌টি অন্নাভাবের বিপদ্ অপেক্ষাও গুরুতর। "কবিতারঞ্জন" পুস্তকখানিই আমার অসময়ের বান্ধব ছিল, ভাবিলাম, গ্রন্থস্বত্ব বিক্রয় করিয়া তিন শত টাকা সংগ্রহ করিব। পুস্তক-বিক্রেতা সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু (এস, সি, বসু) মহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ করিয়া এই কার্য্যে নিয়োজিত করিলাম। উক্ত বসু মহাশয় আমার গুরু-ভ্রাতা এবং বন্ধু ব্যক্তি। বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন পূজার সময় আসিয়া পড়িয়াছে, কোন কোন দোকানদার বলিলেন যে, পূজার পূর্ব্বে তাঁহারা কিছুই করিতে পারিবেন না, পরে হয় ত ক্রয় করিতে পারেন। আমার গলায় ঘা, প্রাণ কণ্ঠাগত, ছয় মাসের পথে যদি ঔষধ থাকে, তাহাতে আমার লাভ কি ? মানসিক যাতনায় অধীর হইয়া পড়িলাম। আশা থাকিলে লোক তাহা অবলম্বন করিয়া বাঁচিতে পারে, নিরাশায় সান্ত্বনা কি ? যত দিন সুরেন্দ্র বাবু চেষ্টা করিতেছিলেন, তত দিন প্রতিক্ষণে আশা ছিল ; কিন্তু তাঁহার শেষ জবাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগৎ অন্ধকার দেখিলাম। কত প্রকার দুঃখ, দৈন্য ও বিপদের মধ্য দিয়া পার হইয়া আসিয়াছি, কিন্তু আজ মনে হইল যেন, আশার আলোক একেবারে নিভিয়া গিয়াছে। আত্মশক্তি সম্পূর্ণরূপে পরাভূত না হইলে নির্ভরের অবস্থা উপস্থিত হয় না, আজ ভাবিলাম, শ্রীশ্রীগুরুদেবকে সকল কথা খুলিয়া বলিব।

মনোরমা আমার এই সঙ্কটের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। আমার চাঞ্চল্য ও অশান্তি দেখিয়া তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা জানিতে কিংবা লক্ষ্য করিতে আমার ইচ্ছা বা অবসর ছিল

না। আহারান্তে তিনি গুরুদেবকে দেখিতে যাইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার "ইচ্ছা" শব্দের অর্থ, পরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, তাহা আমরা জানিতাম। সুতরাং একখানা গাড়ী করিয়া তাঁহাকে সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে গুরুদেবের ভবনে লইয়া গেলাম। বিকাল-বেলায় সেখানে কীর্ত্তন হইতেছিল। অনেকে নৃত্য করিতেছিল, আমি প্রাণের যাতনায় গুরুদেবের পাদপদ্মের নিকট সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে মনে হইল, যেন আমার পিঠের উপর তাল পড়িতেছে, একটু মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সাধু সরলনাথ আমার পিঠের উপর উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। সরলনাথ জ্ঞাতি সম্পর্কে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। সে আমাকে পিতার ন্যায় মান্য করে, বিন্দুমাত্র বাহ্যজ্ঞান থাকিলেও আমার পিঠে উঠিয়া নৃত্য করিতে পারে না। আমি তাহার নৃত্যে বাধা জন্মাইলাম না। মরার মত পড়িয়া রহিলাম, ভাবিলাম, এই স্বভাব-সাধু ভক্ত-যুবকের পদাঘাতে আমার পাপ প্রাণের জ্বালা ও দেহের মলিনতা নষ্ট হইয়া যাউক। যদিও আমার শরীরে খুবই আঘাত লাগিয়াছিল, তথাপি কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন ভক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রের কল্যাণে আমার প্রাণের জ্বালা অনেকটা নিবারিত হইল। সরলনাথ বাহ্য-জ্ঞান লাভ করিয়া আমার চরণে মাথা রাখিলেন। এই ঘটনা শুনিয়া মনোরমা সহাস্যে বলিয়াছিলেন যে, তিনি জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিলেন যে, সরলনাথ অনেকটা উর্দ্ধে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে। ভাবিতেছিলেন, সরলনাথ কি করিয়া এতটা উচু হইল? এই নৃত্যের কথা লইয়া কত সময় আমরা কতই আনন্দলাভ করিয়াছি।

সঙ্কট-মোচন।

কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে অন্যান্য সকলেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, গুরুদেব আসনে বসিয়া আছেন, আমি খুব নিকটে গিয়া বসিলাম, এতটা নিকটে আর কখনও বসি নাই। আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে জানিয়া তিনি আমার দিকে চাহিলেন। আমি সংক্ষেপে বলিলাম, "নারায়ণগঞ্জে দেখিয়াছি, রাশিকৃত প্লাটকে কলে চাপিয়া নিরেট গাঁট বাঁধা হয়, আমার প্রাণে আজি ক্লেশের বোঝা সেইরূপ নিরেট চাপ বাঁধিয়া রহিয়াছে!" গুরুদেব প্রসন্নভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে বলিলেন, "ও সব কিছু নয়, সকল ক্লেশই কাটিয়া যাইবে।" আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এই কথা নির্গত হওয়া মাত্র আমার হৃদয় একেবারে পরিষ্কার হইয়া গেল, প্রাণে বিন্দুমাত্র ক্লেশ বা চিন্তা রহিল না। যদি সেই সময় ঊর্দ্ধ হইতে তিনশত টাকার একটি তোড়া আপনি আসিয়া পড়িত, তথাপি আমি এতটা আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম না, কিন্তু সেই অভাব, সেই লাঞ্ছনার ভয়, সমস্তই রহিয়াছে, অথচ মন একেবারে চিন্তা ও উৎকণ্ঠাশূন্য হইয়া গেল, ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, উদ্বেগের কারণ সম্পূর্ণ বিদ্যমান থাকিতেও কিরূপে উহার কার্য্যফল নষ্ট হইল, ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।*

* কয়েক বৎসর পরে আমি একদিন গুরুদেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধা দেবীকে এই ঘটনার কথা বলায় তিনি বলিলেন যে, তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর দেহ ত্যাগের পরে যখন তিনি শোকে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন, তখন শ্রীগুরুদেব তাঁহার দিকে প্রসন্ন নেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "কি শান্তি, এত কাতর হয়েছিস্ কেন?" পরক্ষণেই শান্তিদেবীর সমস্ত শোক বিদূরিত হইল, হৃদয়-ভার একেবারেই হাল্‌কা হইয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মনোরমাকে লইয়া ঘরে ফিরিলাম। বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু (এস সি বসু) আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "শীঘ্র চলুন, একজন লোক তিনশত টাকা লইয়া আপনার জন্য আমার দোকানে বসিয়া আছেন।" আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপারখানা কি?" তিনি বলিলেন, "বালিগঞ্জের * * * ভট্টাচার্য্য নূতন একখানি পুস্তকের দোকান খুলিয়াছেন।" আমি আপনার 'কবিতারঞ্জন' সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়াছিলাম, পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব বিক্রয়ের কথা তাঁহাকে বলি নাই। তিনি আপনার পুস্তকের প্রকাশক হইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তিনি শুধু শতকরা ২৫৲ পঁচিশ টাকা কমিশন লইবেন এবং আপনাকে তিন শত টাকা অগ্রিম দিবেন। তিনি এক বণিক্ অফিসে কার্য্য করেন, টাকা সঙ্গে লইয়া আমার দোকানে বসিয়া আছেন। আপনাকে টাকা দিয়া বালিগঞ্জ যাইবেন।" আমি কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া বসু মহাশয়ের সঙ্গে কলেজ ষ্ট্রীটে তাঁহার দোকানে গেলাম এবং একখানি রসিদ লিখিয়া দিয়া তিন শত টাকার তোড়াটি লইয়া ঘরে ফিরিলাম। আমার বিষম সঙ্কটের মোচন হইল।

যে সময়ে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আমার পরিচিত পুস্তক-বিক্রেতাগণ আমার পুস্তকখানির গ্রন্থস্বত্বের বিনিময়ে তিন শত টাকা দিতে রাজি হইলেন না, সেই বাজারে শুধু পঁচিশ টাকা কমিশন পাওয়ার জন্য একজন অপরিচিত লোক অগ্রিম তিন শত টাকা দিয়া গেলেন এবং সেই দিনই সেই টাকাগুলি আমাকে না গছাইয়া ঘরে যাইতে পারিলেন না, ইহা খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার। অনেক লোক এমনই কুতার্কিক

যে, তাহারা কোন দানকেই ভগবানের দান বলিতে চাহে না, উহা বলিলে যেন তাহাদের বিচার-বুদ্ধির হানি হয়। কিন্তু ভগবান্‌কে অত দূরস্থ মনে করার কোনও কারণ নাই। অন্ধ-শিশু মায়ের কোলে থাকিয়া মাতৃ-স্তন্য পান করে, কিন্তু মায়ের প্রফুল্ল মুখ দেখিতে পায় না, আমরাও প্রতি মুহূর্ত্তে বিশ্ব-জননীর নিকট হইতে অজস্র দান পাইতেছি, কিন্তু সেগুলি একান্তই স্বাভাবিক হইয়া যাওয়ায় সে সকলের মধ্যে মায়ের প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাই না। যখন কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটে, তখন আমাদের চক্ষু কতকটা প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্যবশতঃ যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া সেই দৃষ্টিকেও নানা প্রকারের আবরণে আবৃত করিতে চেষ্টা করি, ইহাই মহামায়ার মহামায়া! সেই দিন আশার অতীত ভাবে তিন শত টাকা পাইয়া আমার উদ্ধত মস্তক ভক্তিভারে অবনত হইয়াছিল ; কিন্তু টাকা পাওয়া অপেক্ষাও শ্রীগুরুদেবের কৃপাদৃষ্টিতে যে, সমস্ত অভাব ও উদ্বেগের কারণ সত্ত্বেও আমার মন নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইয়াছিল, সেইটিই আমার হৃদয়ে উজ্জ্বলতররূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমার এই বিষম সঙ্কটে এবং সঙ্কটমোচনে মনোরমার মনের ভাবের কিংবা মুখ-শ্রীর কিছু পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে পারি নাই। তবে আমি যখন টাকাগুলি লইয়া আসিয়া সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে বলিলাম, তখন তিনি সহাস্যমুখে একদৃষ্টে আগ্রহের সহিত আমার মুখের পানে তাকাইয়াছিলেন।

এই বাড়ীতে (৯১।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে) আমাদের সপ্তম সন্তান (কন্যা) জন্মগ্রহণ করে। মেয়েটি পাদুকা অর্থাৎ উল্টা হইয়াছিল।

কলিকাতার কোরীচার্চ্চ লেইনের সুপ্রসিদ্ধা এবং ধর্ম্মপরায়ণা ধাত্রী ৺বদনমণি আপনার বুদ্ধি-কৌশলে ও অভিজ্ঞতা-বলে নিরাপদে প্রসব করাইলেন। এই ধাত্রী-শিরোমণি এক সময় মাসিক সহস্রাধিক টাকা উপার্জ্জন করিতেন। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ধনি-পরিবারে তাঁহার সমাদর ছিল। তিনি, তাঁহার কন্যাগণ, দৌহিত্রগণ ও জামাতা প্রভৃতি শ্রীশ্রীগুরুদেবের অনুগৃহীত মন্ত্র-শিষ্য। মনোরমাকে তিনি ভালবাসিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন। মায়ের মতন যত্ন-সহকারে তিনি তাঁহার প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই পরিবারের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ আছি। শ্রীশ্রীগুরুদেব আমার প্রার্থনামতে এই কন্যাটির নাম রাখিয়াছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া বলিলেন, "ইহার জন্য এই নামটি আসিল—নাম—বিন্ধ্যবাসিনী।"

আমার পাগ্‌লামী।

এই বাড়ীতে থাকিতে একদিন আমি একটা বেজায় পাগ্‌লামী করিয়াছিলাম। সকালবেলায় কোন কারণে হাওড়া ষ্টেশনে যাইয়া দেখিলাম, তারকেশ্বরের গাড়ী যাইতেছে, আমি একখানা টিকেট করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম, সঙ্গে যাহা সম্বল ছিল, তাহাতে রিটার্ণ টিকেট হয় না, শুধু যাওয়ার টিকেট করিয়া দুই চারিটা পয়সা ছিল, ফিরিবার উপায় কি হইবে, কিছুই তখন ভাবিলাম না, মনে হইল, ভগবান্ এক-রূপে নিয়া আসিবেনই, ঠেকিয়া থাকিব না, প্রথমখণ্ডে আমার গোঁয়ার-তামীর কথা বলিয়াছি, এই ঘটনাটি তাহারই একটি পরিচয়।

যথাসময়ে তারকেশ্বর উপস্থিত হইলাম। হাতে যে কয়টি পয়সা ছিল, তাহা গরীব-দুঃখীদিগকে দিয়া ফেলিলাম, একেবারে রিক্তহস্ত হইলাম। সেই বৎসরই তারকেশ্বরের গদি লইয়া ৺ মাধবগিরির দুই শিষ্যে বিবাদ-বিসংবাদ ও লাঠালাঠি চলিতেছিল, তখন সতীশচন্দ্র গদি লাভ করিয়াছেন।

অন্যান্য যাত্রীদিগের ন্যায় আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া চারিদিক্ দেখিতে লাগিলাম। হাতী দেখিলাম, প্রকাণ্ড ষণ্ড দেখিলাম, চরণামৃত মাথায় দিলাম। যাহারা নানাবিধ ব্যাধি হইতে মুক্তি-কামনায় নিজের জন্ম এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য ধন্না বা হত্যা দিয়াছে, তাহাদিগকে অনেকক্ষণ ধরিয়া বিশেষভাবে দেখিলাম। তাহারা বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ সম্পূর্ণ নিরাহারে, কেহ চরণামৃতপানে, কেহ ফলাহারে ধন্না দিয়া পড়িয়া আছে। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে বেলা যখন দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, তখন ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। তখন ৩৮ বৎসর বয়স, শরীর সুস্থ-সবল, আগুনের মতন ক্ষুধা, গ্রীষ্মকালের দীর্ঘ দিবা অতিবাহিত-প্রায়, ক্ষুধানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, কিন্তু একটি পয়সা সঙ্গে নাই, ভিক্ষা করিতেও শক্তি নাই, কেননা, কি বলিয়া ভিক্ষা করিব? ভদ্র-পরিচ্ছদধারী হৃষ্ট-পুষ্ট ব্যক্তি কিরূপে ভিক্ষা করিতে পারে? নিজের গোঁয়ারতামীর ফল নিজেই ভোগ করিতে লাগিলাম। এমন সময় বিধাতা পুরুষ প্রসন্ন হইলেন। তিনি আজি আমার জন্য যাহা মাপিয়া রাখিয়াছেন, কে আমাকে তাহাতে বঞ্চিত করিতে পারে? আলিপুরের একজন উকীল (ব্রাহ্মণ) হত্যা দিয়াছিলেন, তিনি ফলাহার-শ্রেণীর "ধন্না"-ধারী। দুইটার পরে তাঁহার সঙ্গীয় লোকেরা তাঁহার জন্য লুচি,

সন্দেশ প্রভৃতি নিয়া আসিল, তিনি ভূমিতল পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। আমি সেই নাট-মন্দিরের মধ্যেই পাইচারি করিতেছিলাম। উক্ত উকীল-রোগী কয়েকবার আমার মুখের দিকে তাকাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কিছু জলযোগ করিবেন?" আমি বলিলাম, "আপনি কেন আমাকে এরূপ প্রশ্ন করিলেন? আপনি কি আমাকে নিরাশ্রয় কিংবা ক্ষুধাতুর বলিয়া মনে করিয়াছেন?" তিনি বড়ই লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত হইলেন, কেননা, আমার আকারে প্রকারে কিংবা পোষাক-পরিচ্ছদে আমাকে হীন কিংবা দুস্থলোক বলিয়া ভাবিবার কারণ ছিল না। উক্ত উকীল মহাশয় অতি নম্রতার সহিত সলজ্জভাবে বলিলেন, "তাহা নহে, আপনার মুখের দিকে চাহিয়া আমার প্রাণে একটা শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব উপস্থিত হইয়াছে। আমি রোগী—আরোগ্য লাভ করিব কি না জানি না, যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার এই সামান্য অভিলাষ পূর্ণ করিতেন, তবে সুখী হইতাম, আপনাকে কিছু খাওয়াইতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে।"

কর্ত্তাটির লীলা অনন্ত, একভাবে আমাকে নিঃসম্বল করিয়াছেন, অন্যদিকে পেটে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছেন, আবার আর একদিকে খাওয়ার জন্য জেদবাদ করিতেছেন, বাহিরে আবার একটা অভিমান জন্মাইয়া বাধা দিতেছেন। এতগুলি শক্তির মধ্যে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা" সেই মহাশক্তিই জয়যুক্ত হইলেন। আমি সহাস্য-বদনে বলিলাম, "আপনার ইচ্ছা পালন করিতে আমার কোনও আপত্তি নাই।" পেট আমাকে ধমক দিয়া বলিতেছিল, "সাবধান, এবার যদি এই সাধালক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া দাও, তবে আর তোমার সোয়াস্তি নাই।" অবিলম্বে বাবুটির

আদেশমতে তাঁহার সঙ্গীয় লোক একপোয়া লুচি ও কয়েকটি সন্দেশ আনিয়া একখানি পাতায় করিয়া সযত্নে আমাকে দিল। তখন একসের হইলেও অনায়াসে গলাধঃকরণ হইত, কিন্তু দাতা ভাবিলেন যে, আমি শুধু অনুরোধ-রক্ষার জন্য খাইতেছি বই ত নয়; সুতরাং একপোয়াই যথেষ্ট। আমিও সেই অবস্থায় ভগবানের এই অযাচিত দানকে যথেষ্টই মনে করিলাম।

ক্ষুধার দায়ে রক্ষা পাইলাম, কিন্তু যাত্রীদিগের বাড়ী ফিরিবার সময় হইয়াছে, সকলে ষ্টেশনের দিকে চলিল। ঠিক মনে নাই, বিকাল ৪টা কি ৫টায় ট্রেণ ছাড়িবে। আমিও অন্যান্য যাত্রীদিগের সঙ্গে ষ্টেশনে আসিলাম, যাহাদের টিকেট ছিল না, তাহারা টিকেট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিল। আমার হাতে একটিও পয়সা নাই, আমি প্লাটফরমে পাইচারি করিতে লাগিলাম। এইবারে মন বড়ই চঞ্চল হইল। যদি এই ট্রেণে পৌঁছাইতে না পারি, তবে সমস্ত পরিজনগণ বিশেষতঃ মনোরমা অত্যন্ত চিন্তিত হইবেন। আমি সকালে বাহির হইয়া মাঝে মাঝে ভবানীপুরে কিংবা কোন বন্ধুর বাড়ীতে কখনও কখনও মধ্যাহ্ন-ভোজন করিয়াছি; কিন্তু রাত্রে কখনই অন্যত্র বাস করি নাই। একে ত কলিকাতা সহর, রাস্তাঘাটে বিপদের অন্ত নাই, কোথায় কে কাটা গেল, মারা গেল, কে কাহার খোঁজ রাখে? সারা দিনরাত্রি অনুপস্থিত থাকিলে বাড়ীর লোকেরা নিশ্চয়ই বিপদ্ গণিবে এবং ছুটাছুটি করিবে, থানায় খবর দিবে। মনোরমা যে আমার দোষে অনর্থক চিন্তায় পড়িবেন, ইহা আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লেশের কারণ হইল। আমি মানস-নেত্রে তাঁহার উৎকণ্ঠা-পূর্ণ চক্ষু ও মলিন-মুখ কল্পনা করিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন

হইলাম। বিশেষতঃ কাহারও নিকট পয়সা চাহিব না, সুতরাং আমাকে হাঁটিয়া কলিকাতায় যাইতে হইবে, সেরূপে পৌছাইতে অন্তত দুই দিন লাগিবে। এখন কি করি? উপায় কিছুই নাই। একটিও পরিচিত লোক দেখিতে পাইতেছি না, যাহার নিকট চাহিলে পয়সা পাইব। যখন দ্বিতীয়বার ঘণ্টা বাজিল, তখন বুকটার মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। রথের চাকা একবার ঘুরিলে আর উপায় নাই। শেষ ঘণ্টার সময় হইয়া আসিল, এমন সময় একটি যুবক হঠাৎ আসিয়া আমার চরণ স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিয়া এক নিশ্বাসে বলিল, "আপনি কি এই ট্রেণে যাইবেন? টিকেট করা হইয়াছে কি?" আমি মাথা নাড়িলাম। যুবক আমাকে বলিল, "শীঘ্র আপনি গাড়ীতে উঠিয়া বসুন, আমি দৌড়াইয়া টিকেট কিনিয়া আনিতেছি, গাড়ী ছাড়ার আর বিলম্ব নাই।" আমি নিশ্চিন্ত হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, অবিলম্বে যুবক টিকেট লইয়া দৌড়াইয়া যাই গাড়ীতে উঠিল, অমনি বাঁশী বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে ট্রেণখানি চলিতে লাগিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে আমি যুবককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে আমার একজন বিশেষ ভক্ত, আমার "কুম্ভমেলা" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া এবং কয়েক স্থানে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনিয়া সে আমাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে ভাবিয়াছিল যে, আমি ভাবুক মানুষ, অন্যমনস্ক হইয়া প্লাটফরমে বেড়াইতেছি, টিকেট করার কথা বোধ হয় আমার মনেই নাই। পাছে আমি ভাবে বিভোর হইয়া ট্রেণ ফেল করি, এই ভয়ে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দৌড়াইয়া টিকেট আনিয়া দিয়াছে। আমি ভাবিলাম, পাছে মনোরমা

উদ্বিগ্ন হন, এই জন্যই ভগবান্ এই যুবককে এই সময় ঠেলিয়া পাঠাইয়াছেন।

আমাদের গাড়ী যখন লিলুয়া ষ্টেশনে পৌছাইল, তখন আমি যুবকটিকে বলিলাম, "কোন বিশেষ কারণে আমি নিঃসম্বলভাবে এখানে আসিয়াছিলাম, তুমি এই সময় স্বপ্রণোদিত হইয়া আমাকে টিকেট করিয়া না দিলে আজ আমাকে এইখানেই থাকিতে হইত।" যুবকটি আমার কথা শুনিয়া অবাক্ হইল। আমি তাহার চাঁপাতলার বাসার ঠিকানা লিখিয়া লইলাম। পরের দিন তাহাকে তাহার প্রাপ্য পয়সা পাঠাইয়া দিলাম।

প্রথম খণ্ডে এ কথা বলিয়াছি যে, মনোরমার নির্ভর এবং আমার গোঁয়ারতামী একসঙ্গে মিলিয়া আমাদের উভয়ের জীবনকে অবিরোধী করিয়াছিল।

মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ৩টি মাত্র শয়ন-ঘর ছিল, কিন্তু সময় সময় এই বাড়ীতে আমরা ২০ জন লোকও বাস করিয়াছি। মনোরমার জেঠাই মা, সন্তানগণসহ আমার সহোদরা (দিদি), মনোরমার ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী সুকুমারী প্রভৃতি স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাগণসহ সসন্তান মনোরমা, সকলে মিলিয়া দুইটি ঘরে ও বারেণ্ডায় শয়ন করিতেন। আমরা ৫।৬ জন পুরুষ বাহিরের ঘরে থাকিতাম। ঢালা বিছানা করিয়া গায়ে গায়ে সকলে শয়ন করিতাম। দুঃখে বা অভাবে পড়িয়া কেহ যে এরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতেন, তাহা নহে, অন্যস্থানে সুখে থাকার সম্ভাবনা ছাড়িয়াও মনের আনন্দে সকলে এই ভাবে এক সঙ্গে ছিলেন।

আমাদের এই দরিদ্র পরিবারটির এবং পরিবারের পরিজনগণের

প্রতি সকল লোকেরই শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি ছিল। কেহই গরীব বলিয়া দয়ার চক্ষে দেখিত না; এ দিকে সকলেরই প্রাণের টান ছিল। এত-গুলি পর লইয়া এমন নিখুঁতভাবে ঘর করিতে কেহ কোথাও দেখেন নাই, এ কথা অনেকের মুখেই শুনা যাইত।

হাজারীবাগ গমন

আমাদের সন্তানগণ তখনও ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিতেছিল। বিশেষতঃ এই সময় (ইং ১৮৯৫ সনে) কলিকাতায় বসন্তরোগ ভয়ানক-রূপে সংক্রামিত হইয়া উঠিল। আমাদের বাসাবাটীর (৯০।৯১নং মেছুয়া-বাজার ষ্ট্রীট) চারিদিকেই ঘরে ঘরে বসন্তরোগী। আমরা স্থান-পরিবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হইলাম; কিন্তু অল্প ভাড়ায় বাড়ী কোথায় পাইব?

এই সময় ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে একবার দেখা করিতে যাই, তিনি আমাদের অবস্থা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার কোন বাড়ী খালি আছে কি না? সকল বাড়ীতেই ভাড়াটিয়া আছে জানিয়া আরও যেন চিন্তিত হইলেন এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহা-শয়ের দৌহিত্রকে একখানি চিঠি লিখিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে,—"পত্র-বাহক আমার বন্ধুব্যক্তি, সপরিবার বাসের জন্য ইঁহার একটি বাড়ীর প্রয়োজন, আমার নিজের কোন বাড়ীই খালি নাই, যদি তোমাদের

কোন বাড়ী থালি থাকে এবং ইঁহাকে বাসের জন্ম দিতে পার, তবে আমি সুখী হইব।"

আমি ঠাকুর বাবুর ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইলাম। বস্তুতঃ তিনি যাহার জন্ম যাহা করিতেন, সমস্তই ষোল আনা প্রাণের সঙ্গে করিতেন। তাঁহার অনুভূতি অত্যন্ত তীব্র ছিল। যাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার উপর ষোল আনা নির্ভর করিতেন, আবার তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস জন্মিলে একেবারে ষোল আনাই অবিশ্বাস করিতেন। যাহাকে যখন ভালবাসিতেন, প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। অল্প-দিনের পরিচয়ে তিনি আমার জন্ম যাহা করিলেন, তাহা অন্য কোন ধনীলোকের পক্ষে সম্ভব হইত কি না জানি না।

ঠাকুর বাবুর পত্র পাইয়া পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ বেণীমাধব দে ও আমি মহারাজার বাড়ীতে গেলাম। কালীকৃষ্ণ বাবুর পত্র, এই কথা শুনিয়াই মহারাজার দৌহিত্র (তিনি তখন মাতামহের সংসারে একরূপ কর্ত্তা ছিলেন) চিঠিখানা মস্তকে ধারণ করিলেন, এবং পত্রপাঠান্তে একজন লোক সঙ্গে দিয়া আমাদিগকে একটি বাড়ী দেখিতে পাঠাইলেন। উক্ত বাড়ীটি ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগে একটি পরিপাটী দ্বিতল ভবন। আমি বাড়ী দেখিয়া পছন্দ করিলাম এবং সেখানে ইচ্ছামত বাসের অনুমতি পাইলাম। ঠাকুর বাবুকে এ কথা জানাইলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

এতটা করিয়া বাড়ী ঠিক হইল বটে, কিন্তু মনোরমার এক কথায় আমাদের সমস্ত যত্ন-চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। সমস্ত কথা শুনিয়া

মনোরমা বলিলেন, "কোথায় কোন্ বড় লোকের বাড়ীতে যাইব, আমার ইচ্ছা হইতেছে না।" মোকদ্দমাটা এইখানেই হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হইয়া গেল। এজন্য আর প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করিলাম না শ্রীগুরুদেবের নিকট এ কথা আর তুলিলাম না।

ঠাকুর বাবু যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়া আমার জন্য বাড়ী ঠিক করিয়াছিলেন, তাহাতে মনোরমার অভিমত তাঁহাকে জানাইতে আমার একটু সঙ্কোচ উপস্থিত হইয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম, তিনি হয় ত বিরক্ত কি দুঃখিত হইবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ সেরূপ কিছুই ঘটিল না। আমার কথা শুনিয়া তিনি কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তোমাদের ছেলেপিলেগুলি ম্যালেরিয়া রোগে রুগ্ন, যখন কলিকাতায় বাড়ী পাওয়া গেল না, তখন বোধ হয়, এক কাজ করিলে ভাল হয়। হাজারীবাগে আমার একটা বাড়ী আছে, যদি এক বৎসরের জন্য সেখানে গিয়া থাক, তবে সকল প্রকারেই ভাল হইতে পারে।" আমি বলিলাম, এ কথা শ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিব।

শ্রীগুরুদেব এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন, তিনি পূর্ব্বে আমাদিগকে যে যে স্থানে থাকিতে বলিয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যে হাজারীবাগ ও বৈদ্যনাথ বাকী ছিল।

আমরা হাজারীবাগ যাইতে স্বীকৃত হইয়াছি এবং গুরুদেব অনুমতি দিয়াছেন শুনিয়া ঠাকুর বাবু যেন নিশ্চিন্ত হইলেন, মনে হইল যেন, তাঁহার শির হইতে একটা চিন্তার ভার নামিয়া গেল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খরচপত্রের কি হইবে?" আমি বলিলাম, "সে সব আমি জানি না, গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিব।"

তিনি বলিলেন যে, সেখানে যাওয়ার ও এক বৎসর থাকার সমস্ত খরচ তিনিই দিতে ইচ্ছা করেন। আমি একটু সঙ্কুচিত হইলাম। তখন আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি যে কয়েকটি কথা বলিলেন, উহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। তিনি বলিলেন, "তুমি সঙ্কোচ করিতেছ? ইহা তোমার একান্তই ভুল। দান করিয়া যে ব্যক্তি মনে করে যে, আমি দান করিলাম, সে যেমন নিকৃষ্ট, দান পাইয়া যে ব্যক্তি মনে করে, অমুক আমাকে দান করিলেন, সে ব্যক্তিও সেইরূপ হীনমনা। ভগবান্‌ই এক হাতে দান করিয়া অন্য হাতে গ্রহণ করেন, মাঝখানে অন্নদাতা বা গৃহীতা নাই।"

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। কেননা, ইতিপূর্ব্বে আমি কোন বিষয়ী লোকের মুখে এরূপ কথা শুনি নাই। আমি বলিলাম, "আপনি যাহা বলিলেন, সমস্ত কথা আমি গুরুদেবকে বলিব, তিনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, সেই আজ্ঞাই প্রতিপালন করিতে হইবে।"

ঠাকুরবাবু আরও বলিলেন, "কত টাকা মাসিক খরচে তোমার সংসার চলিবে?" আমি বলিলাম, "তাহাও আমি বলিতে পারি না।"

তিনি বলিলেন, "যাহারা এত তেল, এত ঘি, এত দুধ এইরূপ হিসাব করিয়া খরচের বরাদ্দ করে, তাহাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। তোমাদের গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিও, তোমাদের খরচের জন্য মাসিক কত টাকার দরকার।"

আমি শ্রীগুরুদেবকে সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, 'মাসিক একশত টাকা হইলেই চলিবে।"

ঠাকুর বাবু আমাদের হাজারীবাগ যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। গিরিডির জশিমুদ্দিন কোম্পানীর স্বত্বাধিকারীকে নিজে পত্র দিলেন, যাহাতে গিরিডি হইতে হাজারীবাগ যাইতে আমাদিগকে কোন ক্লেশ পাইতে না হয়। কালীকৃষ্ণ বাবুর পত্র পাইয়া স্বত্বাধিকারী আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

কলিকাতা-পরিত্যাগ

কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে আমরা বিশেষ হৃদয়-বেদনা পাইয়াছিলাম। শ্রীমান্ রেবতীমোহনকে আমাদের একটি আত্মীয় গুরুভাই শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পরিবারভুক্ত করিয়া রাখিয়া গেলাম। রেবতীর সংসর্গে উমেশবাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সরলা অত্যন্ত সুখী হইলেন। শ্রীমান্ বেণীমাধব, শ্রীগুরুদেবের পরিচর্য্যার অংশ গ্রহণ করিলেন। শ্রদ্ধেয় বন্ধু ৺ মোহিনীমোহন রায় প্রভৃতি বিভিন্ন বাসায় প্রবেশ করিলেন। আমরা একটি সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া দিয়া হাজারীবাগ চলিলাম। বিশেষতঃ আর কত দিন পরে শ্রীগুরুদেবকে দেখিব, ইহা ভাবিয়া আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হইল। যদি পূর্ব্বেই শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে অনুমতি না লওয়া হইত, তবে হাজারীবাগ যাওয়া সম্বন্ধে মনোরমা কি অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন বলা যায় না। এই সময় শ্রীগুরুদেব বৃন্দাবন চলিলেন।

যাহারা গুরু-শিষ্যের প্রকৃত সম্বন্ধ জানে না, তাহারা মনে করিতে পারে; গুরুর আজ্ঞা যদি শিষ্যের মত-বিরুদ্ধ হয়, তবে শিষ্য, গুরুর আজ্ঞা পালন করে বটে, কিন্তু মনে ক্লেশ পায়। প্রকৃত পক্ষে প্রকৃত ভালবাসা বা ভক্তির ধর্ম্ম সেরূপ নহে। গুরুর আজ্ঞা শ্রবণমাত্র শিষ্যের হৃদয় সেই আজ্ঞার অনুগামী হয়; সেই আজ্ঞা পালন করিয়া আনন্দ অনুভব করে, কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞানে নহে, শিষ্য উৎফুল্ল হইয়াই গুরুর আজ্ঞা পালন করে।

হাজারীবাগ-যাত্রা

যে দিন হাজারীবাগ রওনা হইব, জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা হইয়াছে, বিকালবেলায় হঠাৎ আমি শিরঃপীড়ায় এমনই কাতর হইয়া পড়িলাম যে, সে দিন যাওয়ার কোনই সম্ভাবনা রহিল না। সেই সময় একজন পরিচিত পেশোয়ারী গরম কাপড় বিক্রয় করিতে আমাদের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে অসুস্থ দেখিয়া বলিলেন, বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত হাঁটুর নীচের স্থূল মাংসে কিছুকাল মালিশ করিলেই শিরঃপীড়া ছাড়িয়া যাইবে। সত্য সত্যই তাঁহার কথামত ঘৃত মালিশ করিয়া দুই ঘণ্টার মধ্যেই আমি অনেকটা সুস্থ হইলাম। আজ সেই বস্ত্র-বিক্রেতা পেশোয়ারী বন্ধুর নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তিনি উপদেশ দ্বারা এই উপকার না করিলে সে দিন আমরা হাজারী-

বাগ যাত্রা করিতে পারিতাম না। আজ আমি তাঁহাকে উদ্দেশে নমস্কার করি।

বন্ধুগণ সজলনেত্রে আমাদিগকে হাবড়া ষ্টেশনে বিদায় দিলেন, আমরাও সজলনেত্রে বিদায় লইলাম। মনোরমার স্নেহ সকলেরই জন্য, তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতিতে সেই স্নেহ যেন মাখা-জোখা হইয়াছিল। মুখে কথা ছিল না, কিন্তু মুখশ্রীতে সমস্ত ভাব স্পষ্ট অঙ্কিত থাকিত।

মনোরমার জেঠাই মা, আমাদের সাতটি সন্তান ও শ্রীমান্ বিহারীলাল রায় এবং আমরা স্বামী-স্ত্রী হাজারীবাগের যাত্রী হইলাম। শ্রীমান্ বিহারী আমাদের গুরু-ভাই এবং স্নেহ-পাত্র।

গিরিডি

সন্ধ্যার সময় আমরা গিরিডি পৌঁছিলাম। জশিমুদ্দিন কোম্পানীর লোক ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। সে আমাদিগকে লইয়া গিয়া তাহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘরটি ছাড়িয়া দিল। সেখানে সপরিবার বাস করার সুবন্দোবস্ত ছিল। পরদিন মধ্যাহ্নের আহারান্তে আমরা মানুষের টানা পুস্‌পুস্ গাড়ীতে হাজারীবাগ রওনা হইলাম। তিনখানি পুস্‌পুস্ ভাড়া করা হইয়াছিল।

গিরিডি হইতে হাজারীবাগ ৭২ মাইল ব্যবধান। পুস্‌পুসে পৌঁছাইতে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে, কিন্তু পথে স্নানাহার করিতে

বিলম্ব হইলে বেশী সময় লাগিবে। রাস্তায় মাঝে মাঝে বাজার ও চটী আছে, যাত্রিগণ সেই সকল স্থানে ইচ্ছামত স্নানাহার ও বিশ্রাম করিতে পারে, তজ্জন্য যতই বিলম্ব হউক না কেন, অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয় না।

আমরা মনের আনন্দে এই ১২ মাইল রাস্তা অতিবাহিত করিলাম। গিরিডি হইতে হাজারীবাগ যাইতে পর্ব্বতমালা ও বন-রাজী অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। রাস্তার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন-প্রাণ মোহিত হয়। প্রকৃতি সুন্দরী যেন আপনার অন্তঃপুরে অসঙ্কোচে উন্মুক্ত গাত্রে আপনার মনে আপনি হাসিতেছেন! এখানে মানবীয় সভ্যতা তাঁহার শরীরে কোন প্রকারের কৃত্রিম আবরণ প্রদান করে নাই। দুই পাশে জঙ্গলের পর জঙ্গল রাখিয়া অপ্রশস্ত স্রোতের ন্যায় আঁকা-বাঁকা পথ বাহিয়া আমা-দের পুস্‌পুস্‌ চলিতে লাগিল। কখন পর্ব্বতের গাত্রে গাত্রে ঊর্দ্ধদিকে উঠিতেছে, কখনও নিম্নদিকে অবাধ্য বালকের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে। এক একটা চটীর নিকটে আসিলে কুলীগণ "কালীমাইকী জয়" বলিয়া এমন ভাবে চীৎকারের পর চীৎকার করে যে, আমাদের কাণে সে সকল বিশেষ নূতন রকম ঠেকিয়া-ছিল। তাহারা নিরর্থক চীৎকার করে না, এই চীৎকার শুনিয়া নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে নূতন কুলীরা ছুটিয়া আসে এবং পুরাতন কুলীগণ তাহাদের হাতে কার্য্যভার অর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করে, এবং প্রতি জনে একটি করিয়া পয়সা বক্‌সিস পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যায়।

৭২ মাইল যাইতে আমাদের ৩৬ ঘণ্টার উপরে লাগিয়াছিল। সমস্ত রাস্তাটাই আমরা মনের আনন্দে অতিবাহিত করিয়াছি। এক চটীতে দোকানদারের প্রাপ্য পয়সা দিতে একখানা দশ টাকার নোট ভাঙ্গাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, দোকানদার বলিল, দুই টাকা বাটা না দিলে সে নোটের টাকা দিবে না। কয়েক আনা পয়সার জন্য দুই টাকা বাটা দেওয়া অসঙ্গত মনে করিলাম, বোধ হয়, আট আনা দিতে' চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে সে রাজি হইল না। এমন সময় একখানা পুস্‌পুসে হাজারীবাগ হইতে একটি বাঙ্গালী বাবু সেই চটীতে উপস্থিত হইলেন এবং আমার অবস্থা জানিয়া তিনি আমাকে নোটের টাকা দিয়া দিলেন। দোকান-দার ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া থাকিল, অনর্থক আট আনা হারাইল। ইহাকেই বলে, "অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।"

মনোরমা সর্ব্বদাই গুরুদত্ত নামে নিমগ্ন থাকিতেন। তাহাতে তাঁহার মুখশ্রীতে সর্ব্বদাই একটা আনন্দের ভাব ফুটিয়া উঠিত। এই জঙ্গলময় পার্ব্বত্য পথের শোভা-সৌন্দর্য্য তাঁহাকে আরও আনন্দে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। আমরা এই দীর্ঘপথ শীঘ্র শীঘ্র অতিবাহিত করার চেষ্টা করি নাই; এই পরী-রাজ্যের সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ করার জন্য স্থানে স্থানে বিলম্ব ও বিশ্রাম করিয়াছি।

হাজারীবাগ

হাজারীবাগে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের যে বাড়ী আছে, সে বাড়ীর নাম "জুলুপার্ক," কিন্তু সচরাচর লোকেরা উহাকে "রাজাবাংলা" বলে। রাত্রে আমাদের গাড়ী রাজাবাংলায় প্রবেশ করিল। পোষ্ট-আফিসের তখনকার হেড-ক্লার্ক বৈকুণ্ঠ বাবুর উপর এই বাড়ীর ভার ন্যস্ত ছিল। ঠাকুর বাবু পূর্ব্বেই পত্র দ্বারা তাঁহাকে আমাদের বিষয় জানাইয়াছিলেন; আমরা বাংলায় প্রবেশ করিলে অবিলম্বে তিনি উপস্থিত হইলেন। বন্দোবস্তের কিছুই ত্রুটী ছিল না। আমরা আহারাদি করিয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রিত হইলাম।

জুলু পার্ক

প্রভাতে মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া ভাল করিয়া বাড়ীটি দেখিয়া লওয়াই আমাদের প্রথম কার্য্য হইল। বাড়ীটির কম্পাউণ্ড গভর্ণমেণ্ট বিঘার প্রায় দেড়শত বিঘা হইবে। এই প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের অধিকাংশ স্থানই নানাবিধ ফলকর-বৃক্ষে ও পুষ্পোদ্যানে পরিশোভিত। পশ্চাদ্দিকের বাগানে একটি লিচুগাছ একটা বটগাছের ন্যায় প্রকাণ্ড। এত বড় লিচুগাছ অনেকেই দেখেন নাই। খুব বড় বড় সুমিষ্ট ফলে এই

গাছ ঝাঁপিয়া পড়ে। আম্র, পিচ্, আতা ও পেয়ারা গাছ অনেক আছে। পুষ্পোদ্যানে খুব বড় বড় গোলাপ ও অন্যান্য প্রকারের মনোহর পুষ্পরাজি সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে প্রাণ আকুল করে। বড় ফটকের দুই পাশে দুইটি প্রকাণ্ড সেগুন বৃক্ষ, অন্যান্য বহু বৃক্ষ বাগানের শোভা-সম্পাদন করিতেছে। কম্পাউণ্ডে ভ্রমণ করিতে সর্ব্বত্রই সুন্দর রাস্তা রহিয়াছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট লতাকুঞ্জ ও একস্থানে বসিবার একটি উচ্চ মঞ্চ আছে। বাড়ীতে চারি পাঁচটি ইন্দারা। বড় ইন্দারাটির জল অত্যুৎকৃষ্ট। এই বাড়ীকে তখন হাজারীবাগের লোকেরা ছোট-খাট একটি ইডেন-গার্ডেন বলিত। গরমের দিনে অপরাহ্নে এখানে অনেক ভদ্রলোক বেড়াইতে আসিতেন; বাগানের মধ্যে স্থানে স্থানে বসিবার সুবন্দোবস্ত ছিল। বাড়ীখানি যেন হাসিতেছে, সেখানে প্রবেশ করিলেই প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়।

বাড়ীতে ছোট বড় এত ঘর আছে যে, আমাদের মতন তিন চারিটি পরিবার স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। গৃহের আসবাবের কথা কি বলিব, সে সমস্তই ঠাকুর বাবুর ব্যবহারের উপযোগী। বহুমূল্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গালিচা, শতরঞ্চী, খাট ও মূল্যবান্ আসন অনেক ছিল। ১০।১২ জন মালী ও একজন মুন্সী এই বাড়ীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিত।

হিতে বিপরীত

সকালবেলা মেথর আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল যে, সে এই বাড়ীর কার্য্য করিয়া মাসিক ১২৲ টাকা বেতন পাইত। অনেক করিয়া তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, আমরা ঠাকুর বাবুর আত্মীয়কুটুম্ব নহি এবং বড়লোকও নহি; কিন্তু সে কথা সে কিছুতেই বুঝিতে চাহে না; এই বাড়ীতে যে বাস করিবে, সে যে বড়লোক নহে, এ কথা সে কিছুতেই মানিবে না। পরিশেষে বৈকুণ্ঠ বাবুর সাহায্যে অনেক বলিয়া কহিয়া মাসিক ৫৲ টাকা বেতন স্থির হইল।

পাগ্‌ড়ী-বাঁধা, পঞ্জাবী-পরা, দাড়ীওয়ালা একব্যক্তি আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল, তাহার নাম "গজাধর"। আত্ম-পরিচয় দিয়া বলিল যে, সে এই বাড়ীতে দুধ যোগায়। তখন হাজারীবাগে ষোল সের দুধ টাকায় বিক্রয় হইত এবং গাভী বাড়ীতে আনিয়া দোহাইয়া দিত; কিন্তু গজাধর বলিল যে, এই বাড়ীতে দশ সেরের দরে দুধ দেওয়ার নিয়ম।

আমি অনেক করিয়া বলিলাম যে, ঠাকুর বাবু যে মূল্য দিয়াছেন, আমি তাহা দিতে পারিব না; বাঙ্গালী বাবুরা যে দর দিয়া থাকেন, আমি সেই দর্ দিব; কিন্তু গজাধর সে কথা মানিল না, দুধ দিতে থাকিল বটে, কিন্তু দশ সেরের বেশী দিবে না, এ কথা জানাইয়া রাখিল।

দুধের বন্দোবস্ত লইয়া একটা বিশেষ গোলযোগ হইয়াছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই হাজারীবাগের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বাবুদিগের সহিত আমার আলাপ হইল। তখনকার এন্‌কম্‌বাউ এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সেন মহাশয় এক ইংরাজ-মহিলার সঙ্গে আমার দুগ্ধের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কয়েকদিন পরে উক্ত মেম সাহেব গোপাল বাবুকে বলিলেন যে, "আপনার বন্ধুকে দুধ যোগান দেওয়ায় গোয়ালারা আমার রোজের মাখন বন্ধ করিয়াছে; সুতরাং আমাকে ঘরে মাখন প্রস্তুত করিতে হইবে, আমি আর দুধ দিতে পারিব না।" এই কথা শুনিয়া সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার গুপ্ত মহাশয় নিজের বাড়ীতে মাখন রোজ করিয়া মেম সাহেবকে যোগাইতে লাগিলেন; মেম সাহেব আমার দুধ বন্ধ করিলেন না; গোয়ালারা গিরীন্দ্র বাবুর মাখন কিংবা দুধ বন্ধ করিতে সাহস করিল না। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে গঙ্গাধর (মুসলমান গোয়ালা) আমার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল, ১৪ সের দরে দুধ যোগাইতে রাজী হইল, কিছুতেই ১৬ সের পাইলাম না।

ধনী না হইয়া ধনী লোকের খোলস পরা যে কতদূর বিপজ্জনক, এই বাড়ীতে বাস করিয়া পদে পদেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।

এক বৎসর বাস

হাজারীবাগে আমরা এক বৎসর বাস করিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বলিব।

এই এক বৎসরের মধ্যে ছেলেদের ম্যালেরিয়া-দোষ সম্পূর্ণ বিদূরিত হইল।

এই সময় হাজারীবাগে বাঙ্গালীদের পরস্পরের মধ্যে বড়ই সদ্ভাব ছিল। তখনকার সরকারী উকীল রায় যদুনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর সহরের সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। যদু বাবুর প্রভাব ও অমায়িকতা যথেষ্ট ও প্রশংসনীয় ছিল।

এই সময় এখানকার বাঙ্গালীরা অনেকগুলি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বিদেশী কাবুলী এবং মাড়োয়ারী মহাজনগণ অত্যধিক সুদে টাকা ধার দিয়া ভূম্যধিকারিগণের সর্ব্বনাশ করিতেছিল, বাঙ্গালীরা ব্যাঙ্ক খুলিয়া এই অত্যাচারের প্রতীকার করিলেন।

গিরিডি, পুরুলিয়া, রাঁচি ও হাজারীবাগ গমনাগমনের জন্য কেরিং কোম্পানী করিয়া যাত্রীদিগের অসুবিধা দূর করিলেন।

বাজার দর ঠিক রাখার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে একটি গোলা করা হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত খাদ্য-বস্তু পাওয়া যাইত। বস্তুতঃ বাঙ্গালীদিগের দ্বারা হাজারীবাগের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

যাঁহারা এই সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠাতা, তাঁহাদের অধিকাংশের সঙ্গেই অল্পকালের মধ্যে আমাদের যথেষ্ট আত্মীয়তা হইল। গিরীন্দ্র বাবু, তাঁহার ভ্রাতা অক্ষয় বাবু, ভূপেন বাবু, গোপাল বাবু এবং তাঁহার ভ্রাতা মতিবাবু, উকীল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কৃষ্ণ ঘোষ, যদু বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সেন, ৺দীননাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়গণের সহিত আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। ইঁহাদের অধিকাংশের পরিবারবর্গ আমাদের বাড়ীতে আসিতেন এবং মনোরমাও কখন কখনও ইঁহাদের বাড়ীতে যাইতেন। যখন যে বাড়ী হইতে বেড়াইয়া আসিতেন, তখনই তাঁহার মুখে সেই সেই বাড়ীর মহিলাগণের প্রশংসাবাদ শুনা যাইত, তাঁহার মুখে কাহারও দোষের কথা কখনও শুনি নাই।

হাজারীবাগে সৌভাগ্যক্রমে আর একজন লোকের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, তাঁহার নাম অক্ষয়বট পণ্ডিত; হিন্দীভাষায় "অচ্ছয়বট পণ্ডিত।" এই পণ্ডিত মহাশয়, বৃদ্ধ অথচ সবলকায়, পণ্ডিত অথচ ভক্ত এবং কি বাঙ্গালী কি হিন্দুস্থানী সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি বাৎসল্য-রসের সাধক ছিলেন, বাল-গোপাল-বিগ্রহের সেবা করিতেন। এই বাল-গোপালের প্রতি তাঁহার বাৎসল্য-ভাব কিরূপ বিকশিত হইয়াছিল, এক দিনের একটি কার্য্য দ্বারাই তাহা বুঝা যাইবে।

শীতকালে একদিন ভুলক্রমে বাল-গোপালের ঘরের জানালা খোলা ছিল, প্রভাতে উঠিয়া পণ্ডিত মহাশয় তাহা দেখিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। হায়, হায়, এই দুরন্ত শীতে সারা রাত্রি আমার গোপালের গায়ে ঠাণ্ডা লাগিয়াছে, তবে ত গোপালের নিশ্চয়ই অসুখ করিয়াছে,

ইহা ভাবিয়া তিনি ত্রস্ত হইয়া কুঞ্জ কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ী ছুটিয়া গেলেন। কবিরাজ মহাশয়ও পরম বৈষ্ণব; তিনি সমস্ত শুনিয়া একটি পাঁচনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার স্নেহের দুলাল বাল-গোপালকে পাঁচন ভোগ প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাগ্যে ঠিক সময়ে ধরা পড়িয়াছিল, নতুবা কচি ছেলেটি হয় ত সর্দ্দি-কাসিতে কতই ভুগিত। সেবাপরাধের জন্য পণ্ডিত মহাশয় বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলেন।

এই ঘটনা শুনিয়া বুদ্ধিমান্ লোকেরা কতই হাসিবেন; কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময় কেহ এইরূপ করিলে হয় ত তাঁহারা ছুটিয়া গিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে আলিঙ্গন করিতেন।

যাঁহাকে অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-পতি বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তাঁহারই শরীরে ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। এই ভাব হইতেই বৈষ্ণব-কবি বলিয়াছেন,—

"নড়ী হাতে নন্দরাণী যায় খেদাড়িয়া,
অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-পতি যায় পলাইয়া।"

একদিন আমি পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী গিয়াছি, তিনি তাঁহার ঠাকুর-ঘর হইতে একটি পাথরের ছোট কচ্ছপ বাহির করিয়া আমাকে দেখাইলেন এবং বলিলেন যে, "দেখিয়ে বাবু সাহেব, এহি নিরাকার নিরঞ্জন সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ হ্যায়।" আমি যদি পণ্ডিত মহাশয়কে না জানিতাম, তবে হয় ত পাগল মনে করিতাম। হস্তস্থিত একটি ক্ষুদ্র পাথরের কচ্ছপ হইলেন নিরাকার নিরঞ্জন এবং সর্ব্বব্যাপী! পণ্ডিত মহাশয় যে নিরাকার নিরঞ্জন সর্ব্বব্যাপী কথার অর্থও বুঝেন না, এরূপ

কল্পনা করাও বাতুলতার পরিচায়ক, তবে কথা এই যে, তিনি যে চক্ষে সান্তের মধ্যে অনন্তকে দেখিতেছেন, সে চক্ষু অনেক বিদ্বান্-বুদ্ধিমানের নাই। শ্রীকবীর সাহেব বলিয়াছেন যে, সিন্ধুর মধ্যে যে বিন্দু আছে, তাহা সকলেই দেখিতে পায়, কিন্তু বিন্দুর মধ্যে যে সিন্ধু রহিয়াছে, তাহা প্রায় কেহই দেখিতে পায় না। পণ্ডিত মহাশয়ের ক্ষুদ্র কচ্ছপের মধ্যে যেমন আমরা নিরাকার সর্ব্বব্যাপীকে দেখিতে পাই না, তাঁহার শ্রীভগবান্ বাল-গোপালের গায়ে ঠাণ্ডা লাগা এবং তাঁহাকে পাঁচন ভোগ দেওয়ার মর্ম্মও আমরা তেমনই বুঝি না। তিনি এবং কুঞ্জ কবিরাজ মহাশয়ই ইহার মর্ম্ম বুঝেন।

পণ্ডিত মহাশয় কিরূপ উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন, সে সম্বন্ধে একটি কথা বলিব। একদিন গোস্বামী মহাশয়ের কোন একজন কায়স্থ-শিষ্য পণ্ডিত মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিতজী পায়খানা হইতে আসিয়াছেন, হাতে মাটী গ্রহণ করেন নাই, মাটীটি হাতেই রহিয়াছে, সেই অবস্থায় উক্ত কায়স্থ ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া তিনি সাষ্টাঙ্গ হইয়া মাটীতে পড়িলেন এবং হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় নানারূপ স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। উপস্থিত শিষ্যবর্গের নিকট তাঁহাদের আচার্য্যের এই আচরণ ভাল লাগিতেছিল না, কেননা, পণ্ডিতজী বহু-মানাস্পদ আচারী ব্রাহ্মণ, তাঁহার পক্ষে একজন কায়স্থকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া স্তবস্তুতি করা বড়ই সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্য। একজন শিষ্য আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া বলিলেন, "মহারাজ, অশৌচ অবস্থায় রহিয়াছেন, মাটী গ্রহণ করিয়া মুখ প্রক্ষালন ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করুন।" ইঁহার কথার উত্তরে পণ্ডিতজী বলিলেন, "তুমি কি

বলিতেছ? আমি সাধু-সঙ্গ লাভ করিয়াছি ; সুতরাং আমার সমস্তই শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সাধু-দর্শনে কি অশৌচ থাকে?" ইহার পরে ভাবের নেশা কিছু কমিলে বলিলেন, "আপনার দর্শনে আমার অন্তর শুদ্ধ হইয়াছে, যদি অনুমতি করেন, তবে সদাচারের অনুরোধে বহিঃ-শুদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি।" সেই কায়স্থ ভদ্রলোকের কথা আর কি বলিব। তিনি প্রথমতঃ সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রতিপ্রণাম করিলেন, পরে পণ্ডিতজীর অবস্থা ও আচরণ দেখিয়া একেবারে কাষ্ঠ-পুত্তলির ন্যায় অবাক্ হইয়া রহিলেন। পণ্ডিতজীর অকৃত্রিম বিনয় অনন্যসাধারণ সৌজন্যের বিনিময়ে প্রতিদানযোগ্য তাঁহার কিছুই ছিল না।

পণ্ডিতজীর সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, সান্তে অনন্ত-দর্শন এবং জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রদর্শন, এই তিনটি ব্যাপার যিনি মিলাইয়া বুঝিতে পারিবেন, কেবল তিনিই তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন।

মনোরমার প্রতি পণ্ডিতজীর অত্যন্ত শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, সেই জন্যই তিনি তাঁহার গুরুদেব গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়াছিলেন, বোধ হয়, সেই কারণেই তাঁহার শিষ্যের প্রতি তিনি এরূপ অলৌকিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন।

কয়েক বৎসর হইল, পণ্ডিতজী মায়িক-দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিজধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, হাজারীবাগের একটি উজ্জ্বল ধর্ম্মের প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। মনোরমার জীবন-চিত্র লিখিতে যাইয়া এই উপলক্ষে আমি অক্ষয়-বট পণ্ডিত মহাশয়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিতে সক্ষম হইলাম বলিয়া আমাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

বন্ধু-সমাগম

আমরা হাজারীবাগ থাকিতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এবং তাঁহার কন্যা স্নেহভাজন শ্রীমতী শোভনা, স্নেহভাজন শ্রীমান্ রেবতী-মোহন সেন, প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু ও তাঁহার পত্নী স্নেহাস্পদা শ্রীমতী সরলাসুন্দরী হাজারীবাগে গিয়াছিলেন। ইঁহাদের আগমনে আমাদের বাসভবন আনন্দময় হইয়া উঠিল। শ্রীমান্ রেবতী-মোহনের সুমধুর কীর্ত্তনে সহরবাসী সমস্ত সম্ভ্রান্তনিচয়ই অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তখন প্রতিদিনই আমাদের বাসায় ভক্তগণের সমাগম হইত।

আমাদের চতুর্থ পুত্র যোগরঞ্জনের বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র। শিশুকাল হইতেই এই বালক কীর্ত্তন শুনিলে আনন্দে নৃত্য করিত, সে এমনই ভাবে বিভোর হইত যে, উপস্থিত সমস্ত লোকই তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। একদিন কে তাহাকে চন্দন দ্বারা সাজাইয়া গলায় মালা পরাইয়া দিয়াছিল। সে দিন বালকটি শ্রীমান্ রেবতী-মোহনের কীর্ত্তনের সঙ্গে অনবরত দুই ঘণ্টারও অধিককাল নৃত্য করিয়াছিল, ইহাতে বালক কিছুতেই ক্লান্তিবোধ করিত না। সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিলে অনেকের প্রাণেই ভক্তিরসের সঞ্চার হইত।

এই বালকের অনেক অসাধারণ শক্তি ছিল। হাজারীবাগে (৫ বৎসর বয়সে) সে মুখে মুখে বড় বড় যোগ-বিয়োগ কসিতে পারিত।

বালক তখন মোটেই লিখিতে পড়িতে জানিত না; হাতের পর্ব্বও গণনা করিতে পারিত না; অথচ কত হইতে কত বিয়োগ করিলে কত থাকে, অবিলম্বে বলিয়া দিত। অনেকেই তাহাকে প্রশ্ন করিত, কিন্তু একবারও উত্তর দিতে সে বিলম্ব কিংবা ভুল করে নাই। আমরা বহু চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই যে, যোগরঞ্জন কি কৌশলে অঙ্ক কসিয়া থাকে। পরে শ্রীমান্ সুখময় রায় অনেক জিজ্ঞাসার পর বালকের নিকট হইতে তাহার কৌশল বাহির করিল। বালক বলিল যে, ৭৫ হইতে ২৭ গেলে কত থাকে, এইরূপ প্রশ্ন হইলে সে মনে মনে ২৭ হইতে এক ও ৭৫ হইতে এক তুলিয়া লইত, এইরূপ করিতে করিতে যখন ২৭ অঙ্ক একেবারে ফুরাইয়া যাইত, তখন ৭৫ এর ঘরে যাহা জমিত, তাহাই প্রশ্নের উত্তররূপে গ্রহণ করিত। এই কৌশলটি বালক নিজেই উদ্ভাবিত করিয়াছিল এবং কৌশল অবলম্বন করিয়া সে এতই দ্রুত উত্তর প্রদান করিত যে, একজন বয়স্ক লোকের পক্ষে এইরূপ গণনা করিয়া এত শীঘ্র উত্তর দেওয়া সম্ভব হইত না।

হাজারীবাগে গিরীন্দ্র বাবুর বাড়ীতে একটি সুরদাস (অন্ধ) বালক থাকিত। হাজারীবাগ সহরটি তাহার নখদর্পণের মতন ছিল। লাঠিহাতে করিয়া সে সর্ব্বত্র বেড়াইত। একদিন রাত্রে গিরীন বাবুর বাড়ী হইতে সে আমাকে জুলুপার্কে (প্রায় ১ মাইল) পৌছাইয়া দিয়াছিল। আমি অন্ধ বালককে সহায় করিয়া নির্ভয়ে রাস্তা অতিক্রম করিলাম। এই অন্ধ বালক গান গাহিতে পারিত। এক দিন সে আমাদের বাড়ীতে হাত দিয়া উরু বাজাইয়া কবীরের দোঁহা গাহিয়া-

ছিল। বালক চলিয়া গেলে যোগরঞ্জন ঠিক ঠিক তাহারই মতন করিয়া বসিয়া সেইরূপ উরু বাজাইয়া সেই দোঁহা গাহিতে লাগিল। তাহার কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গী এমনই হুবহু হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া কেহই হাস্য সংবরণ করিতে পারে নাই।

বালক যোগরঞ্জন যখন যে বিষয়ে মনোযোগ করিত, তাহাতেই সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট হইয়া থাকিত। যখন কোন কারণে কাঁদিত, মনে হইত যেন, তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে; যখন হাসিত, তখন আমাদের সমগ্র গৃহখানি যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। বালকের অসাধারণ আকর্ষণশক্তি ছিল, সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

মনোরমার দেহত্যাগের প্রায় দশবৎসর পরে ১৪ বৎসর বয়সে বোলপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যোগরঞ্জন দেহত্যাগ করে। এই বয়সে এই বালকের মধ্যে যে সকল অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ হইয়াছিল, তাহা এই পুস্তকের উপসংহারে বিবৃত করিতে ইচ্ছা রহিল।

ঠাকুর বাবুর শিষ্টাচার

আমরা হাজারীবাগ থাকিতে একদিন শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মৈত্র মহাশয় সপরিবার আমাদের বাড়ীতে (জুলুপার্কে) উপস্থিত হইলেন। উক্ত মৈত্র মহাশয় সম্পর্কে শ্রীগুরুদেবের ভাগিনেয়, ৺কিশোরীমোহন

মৈত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। কিশোরীমোহন মৈত্র মহাশয় এক সময় ব্রাহ্মসমাজে একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন, শেষকালে বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রীতিমত ভেক ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রমাপ্রসাদ ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের পিস্তুতভ্রাতার কন্যাকে বিবাহ করেন, সুতরাং ঠাকুর বাবুর সহিত রমাপ্রসাদ বাবুর ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক। রমাপ্রসাদ বাবুর শরীর অসুস্থ হওয়ায় তাঁহার স্ত্রী তাঁহার জ্যেঠামহাশয় অর্থাৎ ঠাকুর বাবুকে তাঁহাদের হাজারীবাগে থাকার বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করেন। আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম, সে বাড়ীতে অনায়াসে আমরা উভয় পরিবার থাকিতে পারিতাম, বিশেষতঃ রমাপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে আমার বিশেষরূপ জানাশুনা ছিল; কিন্তু ঠাকুর বাবু বলিলেন যে, "মনোরঞ্জন বাবু যখন সে বাড়ীতে রহিয়াছেন, তখন আমি অন্য কাহাকেও সেখানে থাকিতে অনুমতি দিতে পারি না, তবে তোমরা হাজারীবাগ যাইয়া অন্য বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতে পার, সে বাড়ীর ভাড়া আমিই দিব।" রমাপ্রসাদ বাবু আমাদের বাড়ীতে উঠিয়াছিলেন, দুই তিন দিনের মধ্যেই আমি তাঁহাকে অন্য বাড়ী ভাড়া করিয়া দিলাম।

ইহার কিছু দিন পরে রমাপ্রসাদ বাবু কিংবা তাঁহার স্ত্রী জুলুপার্ক হইতে কিছু গৃহ-সজ্জার আসবাব পাঠাইতে পারেন কি না, এইজন্য ঠাকুর বাবুকে পত্র লিখিলেন। তিনি বৈকুণ্ঠ বাবুকে (ইহার উপর বাড়ীর ভার ছিল) লিখিলেন, "মনোরঞ্জন বাবুর কিছুমাত্র অসুবিধা না করিয়া যাহা দেওয়া যায়, তাহা রমাপ্রসাদকে দিবেন।" বৈকুণ্ঠ বাবু আমাকে জানাইলেন; আমি বলিলাম "কয়েকখানা তক্তপোশ

ও দুইচারিখানি চেয়ার ভিন্ন অন্য সমস্ত আসবাবই নিতে পারেন।” জুলু পার্কে বহু মূল্যবান্ নানাপ্রকারের খাট, গালিচা, আয়না ও অন্যান্য আসবাব যথেষ্ট ছিল, বলা বাহুল্য যে, সেগুলি আমাদের কিছু-মাত্র প্রয়োজনে আইসে নাই। আমরা কয়েকখানা সাধারণ তক্তপোশ পাড়িয়া তাহাতে আমাদের বিছানা-পত্র পাড়িয়া শয়ন করিতাম। মোটা ভাত, মোটা কাপড়, সুস্থ দেহ ও শুদ্ধ মন, এই চারিটিই আমাদের নিকট আদর্শ-জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। আমরা এই চারিটিকেই সকল সুখের নিদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম, সুতরাং আসবাব অভাবে আমাদের সুখ-শান্তির কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। আমরা ঠাকুর বাবুর শিষ্টাচার দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তিনি জানিতেন যে, জুলুপার্কে যে সকল আসবাব আছে, সে সকলের কিয়দংশও আমাদের কাজে আসিবে কি না সন্দেহ, তথাপি তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের একান্ত প্রয়োজন জানিয়াও তাঁহাকে কোন জিনিষ দিতে আমার অনুমতির অপেক্ষা করিলেন। ধনীদিগের মধ্যে এরূপ শিষ্টাচারী আদর্শস্থানীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কৃতজ্ঞতা

একদিন ঠাকুর বাবু তাঁহার ম্যানেজারের দ্বারা চিঠি লেখাইয়া আমাকে জানাইলেন যে, এই সময় যদি আমি একবার কলিকাতা যাইতে পারি, তবে ভাল হয়। কি উদ্দেশ্যে তিনি এরূপ লিখিলেন,

তাহা লইয়া আমাদের মধ্যে একটু আলোচনা হইল। শেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলাম যে, তিনি বোধ হয়, মেস্‌মেরিজম্ কিংবা প্রেততত্ত্ব-সম্বন্ধীয় কোনও প্রয়োজনে আমাকে কলিকাতা যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমার মেস্‌মেরিজম্ করাটা মনোরমা তেমন পছন্দ করিতেন না, বিশেষতঃ ঐরূপ করিতে গিয়া আমার মাঝে মাঝে মাথা ধরিত, সে জন্যও তিনি এই কার্য্যের প্রতি সদয় ছিলেন না। ঠাকুর বাবুর পত্রের উত্তরে কি লিখিব, কলিকাতায় যাইব কি না, এই সম্বন্ধে মনোরমার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি যাওয়ার প্রতিকূলে অভিমত দিলেন। তাঁহার জ্যেঠাই মাতা বলিলেন, "এই ভদ্রলোক (কালীকৃষ্ণ ঠাকুর) এত উপকার করিতেছেন, এত ভালবাসিতেছেন, তাঁহার একটা কথা রাখিলে ক্ষতি কি ?" মনোরমা বলিলেন, "তিনি যে আমাদের উপকার করিতেছেন, তাহার জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকিব, কিন্তু একজন অর্থ দিয়া সাহায্য করেন বলিয়া যে তাঁহার সকল কথাই মানিয়া চলিতে হইবে—এমন কি ?" কালীকৃষ্ণ বাবুর অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তিনি সামান্য কারণে হঠাৎ কাহারও প্রতি সদয় নির্দ্দয় হইতে পারিতেন। তাঁহার বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা হাজারীবাগে আসিয়াছি, তিনি প্রতিমাসে সাহায্য না পাঠাইলে সেখানে অন্য গতি ছিল না ; এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করা সংসারের দিক্ দিয়া দেখিলে সুবিবেচনার কার্য্য নহে ; কিন্তু মনোরমা কখনই মানুষের উপর নির্ভর করেন নাই, অথচ ভগবান্ যাঁহার মধ্য দিয়া যখন আমাদিগকে যে ভাবেই সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার নিকটই সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ রহিয়াছেন। শুধু আর্থিক সাহায্য নহে, কেহ একটি ভুল

বুঝাইয়া দিলে অথবা সামান্য একটা কার্য্যে বাক্যের দ্বারা সাহায্য করিলেও তাঁহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইত।

কৃতজ্ঞতার কথা বলিতে গিয়া আজ পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীগুরুদেবের একটা কথা মনে পড়িল। তাঁহার সঙ্গে একবার রংপুর কাকিনার রাজার নিমন্ত্রণে কাকিনা গিয়াছিলাম। একদিন কথা-প্রসঙ্গে তিনি রাজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী ৺গোবিন্দ মোহন বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয়ের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। আমরা নিবিষ্ট-মনে এই কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের কারণ শুনিতে লাগিলাম। শ্রীগুরুদেব যখন যশোর জেলার অন্তর্গত বাগ-আচড়া নামক স্থানে ধর্ম্ম-প্রচারোপলক্ষে বাস করিতেন, তখন সেই পল্লীগ্রামে সকল সময় চিঠির খাম জুটিত না। কাগজে পত্র লিখিয়া সেই কাগজটাকেই মুড়িয়া আঠা লাগাইয়া খামের কার্য্য সারিতে হইত। আঠা না পাওয়ায় অনেক সময় তজ্জন্য অসুবিধা বোধ হইত। কিন্তু কাকিনার উক্ত দেওয়ানজী মহাশয় একবার গোস্বামী মহাশয়কে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন, খামখানিতে ভাল আঠা লাগান ছিল না। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় খামের পশ্চাদ্দিকে টিকেটখানি লাগাইয়া দিয়া আঠার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুদেব কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার নিকট সেইটি শিক্ষা করিয়া আমার একটা উদ্বেগ নষ্ট হইয়াছিল। চিঠি লিখিয়াই ভাবিতে হইত, আঠা কোথায় পাইব, এদিক্ সেদিক্ ঘুরিয়া আঠার অন্বেষণ করিতে হইত; কিন্তু আপনার পত্রে পেছন দিকে টিকেট মারিবার কৌশলটি জানিয়া সেই দিন হইতে আমাকে আর আঠার জন্য চঞ্চল হইতে হয় নাই।" গোঁসাইজীর

কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের কারণ শুনিয়া আমরা ত অবাক্। এরূপ ছোট-খাটো কথা কে-ই বা মনে রাখে? তিনি এরূপ আন্তরিকতার সহিত এই কথাগুলি বলিতেছিলেন যে, উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হইয়া তাহা শ্রবণ করিলেন। বড় বড় কার্য্যের মধ্য দিয়া মানুষকে প্রকৃতভাবে ধরা যায় না। খুঁটিনাটি কার্য্যেই মহতের মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়। শ্রীগুরুদেবের কথা স্বতন্ত্রভাবে লিখিতে আমার জীবনে ও ভাগ্যে কুলাইবে কি না জানি না, তাই প্রসঙ্গক্রমে যেটি যখন মনে পড়িতেছে, লিখিতেছি। "মনোরমার জীবন-চিত্রের" মধ্যে যদি কেহ এরূপ বিষয়কে অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক মনে করেন, যদি সত্যই সেটি ক্রটী হয়, তবে সে ক্রটী আমাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে।

ধ্যানের অবস্থা

জুলুপার্কের ভবনের পূর্ব্ব-উত্তর কোণের ক্ষুদ্র ঘরটিতে মনোরমা ধ্যানে বসিতেন। সকালবেলা ৭টা কি ৮টার সময় বসিতেন, পরের দিন ৭।৮টার সময় তাঁহার ধ্যান-ভঙ্গ হইত। বসিবার পূর্ব্বে আমরা একটু দুগ্ধ খাওয়াইয়া দিতাম। একদিন ধ্যানের সময় একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, নিম্নে তাহার বিবরণ দিতেছি।

হাজারীবাগে আসিয়া আমাদের ৩টি পুত্রকে জেলাস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তখন টাকী-নিবাসী ৺শ্যামাপ্রসন্ন রায়

জেলাস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন; তিনি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম। আমার সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তা হইয়াছিল। 'আমাদের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ নিত্যরঞ্জন জানি না কি কারণে একদিন স্কুলে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। শিক্ষকগণ ব্যতিব্যস্ত হইলেন, বালকের চেতনা-সম্পাদনের জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এই উপলক্ষে স্কুল ছুটী হইল এবং কয়েকজন লোকের সাহায্যে খাটুলী কি পাল্কী করিয়া শ্রীমান্‌কে অতি-সাবধানে শিক্ষকগণ আমাদের বাড়ীতে পাঠাইলেন। মনোরমা তখন ধ্যানস্থা ছিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যরঞ্জন চীৎকার করিয়া মায়ের কাছে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা গো, নিতু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।" মায়ের কাণে সে কথা প্রবেশলাভ করিল না। শ্রীমান্ নিতুকে লইয়া আমরা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। মনোরমার নিকটেই আমাদের উৎকণ্ঠাপূর্ণ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, কিন্তু তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্না; পুত্রের মূর্চ্ছার সংবাদ তাঁহার অন্তরে পৌঁছাইল না। আমার এইরূপ একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, মনোরমার কাছে কোন প্রকারের বিপদ্ আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। এজন্য আমি ছেলেটিকে আমাদের নিকটে আনিতে ইচ্ছা করিলাম। এত নিকটে বসিয়াও তিনি অনেক দূর রহিয়াছেন। সত্য সত্যই আমাদের রাজ্যে বাস করিতেছেন না। আমি অধীর হইয়া তাঁহার কাণে বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিলাম। দুই চারিবার নাম করিতেই কাণ ফিরাইয়া লইলেন। বাহিরে আসিতে তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল না; কিন্তু স্বার্থপর হইয়া সংসারের প্রয়োজনে তাঁহাকে আনন্দধাম হইতে বিচ্যুত করার চেষ্টা করিলাম। আরও কয়েকবার নাম করিলে

তিনি বাহ্য-জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন এবং শান্তভাবে কর-যোড়ে নমস্কার করিয়া চক্ষু মেলিয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন। কিছুতেই তাঁহার চাঞ্চল্য ছিল না,পুত্রকে সস্নেহে বুকে লইয়া সমস্ত ব্যাপারগুলি স্থিরভাবে শুনিলেন। অনতিবিলম্বে নিতু স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

শকুন্তলা দুষ্মন্ত-চিন্তায় মগ্ন আছেন, তিনি দুর্ব্বাসা ঋষির চীৎকার-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন না। প্রথম জীবনে ইহা পাঠ করিয়া মনে করিতাম, ইহা হিন্দু কবির স্বভাবসিদ্ধ অতিরঞ্জন মাত্র, কিন্তু মনোরমার সমাধির অবস্থা দেখিয়া মনে হইত যে, ঋষি যদি "আমি অতিথি" বলিয়া চীৎকার না করিয়া অতি মৃদুস্বরে "দুষ্মন্ত" নামটি উচ্চারণ করিতেন, তবে অনায়াসেই শকুন্তলার সাড়া পাইতে পারিতেন। এখন মনে হয় যে, হিন্দু কবি ভিন্ন এরূপ অবস্থার বর্ণনা আর কেহই করিতে পারেন না। সেই সময় শকুন্তলার দুষ্মন্ত-চিন্তায় সমাধি হইয়াছিল, তখন অন্য কথা তাঁহার কাণে প্রবেশলাভ করিতে পারে না, সেইরূপ করিতে পারিলে প্রেম অপূর্ণ থাকিত অথবা কবিকে সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইত, এইটিই প্রকৃত মনোবিজ্ঞান।

আমার কবীরপন্থী শিক্ষা

বাঙ্গালা ১৩০০ সনে কুম্ভমেলার অবসানে সেবারে সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দগিরি মহাশয় আমার হাতে শ্রীকবীর সাহেবের কতকগুলি দোঁহা দিয়া অনুমতি করিলেন যে,

আমাকে সেইগুলির বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিতে হইবে। আমি পদ্য গদ্য লিখিতে জানিতাম না, তাহাও তিনি জানিতেন না। হিন্দি ভাষায়, বিশেষতঃ কবীরপন্থী হিন্দিতে আমার মোটেই অধিকার ছিল না। স্বামীজী নিজেই আমাকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। স্বামীজীর আদেশ শ্রীগুরুদেবকে বলিলাম; তিনিও আদেশ করিলেন যে, উহার অনুবাদ করিয়া স্বামীজীর নামে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিতে হইবে। স্বামীজী আমাকে যে দিন যতটুকু পড়াইতেন, আমি সেইটুকুর বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতাম, তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি হরিদ্বার গমন করিলে শ্রীশ্রীগুরুদেব স্বয়ং আমাকে পড়াইতে লাগিলেন। ইহার পরে আমরা হাজারীবাগ আসিলাম। এখানকার জেলাস্কুলের তথনকার প্রধান পণ্ডিত মহাশয় একজন নামকরা-হিন্দি-সাহিত্যিক ছিলেন। আমি তাঁহার নিকট "কবীর" পড়িতে আরম্ভ করিলাম; কিন্তু অল্প দিনেই বুঝিলাম যে, তিনি হিন্দি ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও কবীর-পন্থী-শাস্ত্রের ভাব বুঝিতে বিশেষ সক্ষম নহেন, কেননা, তিনি যাহা বুঝাইতেন, তাহাতে কবীরের ধর্ম্মটি অন্য ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। আমি তাঁহার নিকট আর পড়িলাম না।

একদিন কথায় কথায় স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকীল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার গুপ্ত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হাজারীবাগে কোন কবীর-পন্থী আছেন কি না? তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া আমার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য জানিয়া লইলেন এবং বলিলেন যে, এখানে (হাজারীবাগে) এমন একজন কবীরপন্থী সুপণ্ডিত রহিয়াছেন যে, তাঁহার মতন শিক্ষক অতি দুর্ল্লভ। দেশ-দেশান্তর হইতে কবীরপন্থিগণ তাঁহার

নিকট আসিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তিনি বাঙ্গালী; সুতরাং আমার পড়ার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধা হইবে। আমার প্রাণে অত্যন্ত আনন্দ হইল, গিরীন্দ্র বাবু আমাকে উক্ত কবীরপন্থী মহাশয়ের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। যাঁহার কথা বলিতেছি, তাঁহার নাম ৺রামেশ্বর ঘোষ, তৎকালে তিনি পদ্মার মহারাজের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া মনে হইল, যেন আমি একটা বিদ্যার জাহাজ পাইলাম। এই জাহাজের সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র ডিঙ্গীখানি বাঁধিয়া দিতে পারিলে নিশ্চয়ই কিছু দুর অগ্রসর হইতে পারিব। তাঁহার স্মরণশক্তি বিস্ময়জনক ছিল। কবীরপন্থী যে কোন গ্রন্থের কথা উঠিলে তিনি অনবরত তাহা হইতে অনর্গল ঘণ্টার পর ঘণ্টা দোঁহাবলী বলিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার গ্রন্থ-সংগ্রহও অপূর্ব্ব, রাশি রাশি হস্ত-লিখিত গ্রন্থে তাঁহার আলমারী ভরা রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, "যো কুছ রহা, সো কবীরা কহা" অর্থাৎ যাহা কিছু বক্তব্য আছে, কবীর সে সমস্তই বলিয়াছেন। দেশ-দেশান্তর হইতে অনেক কবীর-পন্থী সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে আসিয়া থাকেন। তিনি নিজে দীক্ষিত কবীর-পন্থী; পারস্য, উর্দ্দু ও হিন্দি ভাষায় অভিজ্ঞ, বিশেষতঃ কবীরপন্থী শাস্ত্রে একরূপ অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তাঁহাকে পাইয়া আমার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনিও আমাকে শিষ্যরূপে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। আমি রীতিমত প্রতিদিন ৩।৪ ঘণ্টা করিয়া তাঁহার নিকট পড়িতে লাগিলাম এবং অনুবাদ করিয়া তাঁহার দ্বারা সংশোধন করিয়া লইলাম। তিনি বাঙ্গালী না হইলে নিঃসংশয়-রূপে সকল কথা বুঝিবার আমার সুবিধা হইত না। কবীরের ভাষা

বিশুদ্ধ হিন্দি নহে, উহা অত্যন্ত জটিল; বিশেষতঃ অন্য সম্প্রদায়ের লোক হাজার পণ্ডিত হইলেও কবীরের উক্তির গূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হওয়া তাঁহার পক্ষে একরূপ অসাধ্য। পূজ্যপাদ শিক্ষক রামেশ্বর ঘোষ মহাশয়কে পাইয়া আমার হাজারীবাগ যাওয়া এক হিসাবে সার্থক হইয়াছিল। *

* আমি যে সকল দোহার পদ্যানুবাদ করিয়াছিলাম, সে সকলের মধ্যে কয়েকটী "নব্য ভারতে" প্রকাশিত হইয়াছিল। "গৃহলক্ষ্মী" ও "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা বরিশাল নিবাসী জমিদার ৺গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী এম, এ বি, এল মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার অনূদিত "কবীর প্রকাশ" তাঁহার "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রেসে ছাপিতে দিয়াছিলেন। এক ফর্ম্মা মুদ্রিত হওয়ার পরে প্লেগ রোগে গিরিজা বাবু অকালে কালকবলে পতিত হইলেন। তাঁহার বাড়ীতে চিকিৎসা করিতে যাইয়াই কলিকাতার সর্ব্বজনপ্রিয় সুযোগ্য ডাক্তার ৺অমূল্যচরণ বসু মহাশয় প্লেগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। গিরিজাবাবুর লোকান্তর গমনের পরে তাঁহার ছাপাখানা উঠিয়া গেল, আমার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত এক ফর্ম্মা আর আমার হস্তগত হইল না। সেই হইতে আমার এই কার্য্য অসমাপ্তই রহিয়াছে। উহা সমাপ্ত করিবার জন্য মনে সময় সময় অত্যন্ত উদ্বেগ উপস্থিত হয়। এত যত্ন ব্যর্থ হইবে এবং স্বামীজীর আদেশ প্রতিপালিত হইবে না ভাবিয়া আমি বড়ই ক্লেশ পাই, এবারে চেষ্টা করিয়া দেখিব যদি ভগবানের ইচ্ছা হয় তবে সম্পাদিত হইবে।

আমার শিক্ষক ৺রামেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের গৃহে যে সকল কবীরপন্থী গ্রন্থ আছে, তাঁহার পুত্রের নিকট হইতে সেগুলি প্রাপ্ত হইতে পারিলে বাঙ্গলা ভাষার বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা, "সাহিত্যপরিষদ্" এ বিষয় মনোযোগী হইবেন কি?

জন্মাষ্টমী

সে বৎসর (ইং ১৮৯৫) হাজারীবাগে আমাদের বাসায় জন্মাষ্টমীর উৎসব হইয়াছিল। সকাল হইতে উৎসব আরম্ভ হইল। শ্রীমান্ রেবতীমোহন ও তাঁহার সহকারী শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ মজুমদারের (ইনি বর্ত্তমানে ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কের অন্যতম ম্যানেজার) কীর্ত্তনে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই অভিভূত হইয়াছিলেন। উৎসবক্ষেত্রে অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ও ভক্ত বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। কীর্ত্তনান্তে কুঞ্জ কবিরাজ মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে বসিলেন। দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা পাঠ করিবেন কিন্তু তিনি পুস্তক খুলিয়াই অশ্রুজলে এমনই প্লাবিত হইতে লাগিলেন যে, তাঁহার নেত্র-বারিতে পুস্তকের পাতা ভিজিয়া গেল,চক্ষের জলে তিনি অক্ষর দেখিতে পাইলেন না। তড়িৎসঞ্চারের ন্যায় তাঁহার এই বিশুদ্ধ-ভাব, উপস্থিত সকলের প্রাণেই সঞ্চারিত হইল।· যে দিন জগজ্জীবের সুকৃতির ফলে ধর্ম্মাবহ পাপানুদ শ্রীভগবান্ মানুষের সঙ্গে লীলা করিবার জন্য মানব-দেহ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়া বিশ্বাসী ভক্তগণ যে ভক্তি-বিশ্বাস ও আনন্দে অভিভূত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? অদ্যকার সমস্ত দিনই উৎসবানন্দে অতিবাহিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, মনোরমাই আমাদের সমস্ত প্রকারের অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্বরূপ ছিলেন। তিনি ঘরের বাহির হইয়া অপরিচিত

লোকের সঙ্গে কথা বলিতেন না; কিন্তু সকল লোকই তাঁহার টানে আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। তাঁহার অস্তিত্বই আমাদের গৃহকে সকলের চিত্তাকর্ষক করিয়াছিল।

রাখালচন্দ্র তা

শুভ্রশ্মশ্রু গৌরকান্তি সৌম্যমূর্ত্তি একটি ভদ্রলোক একদিন আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন; পরিচয় পাইয়া জানিলাম, তাঁহার নাম রাখালচন্দ্র তা, তিনি জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয়। তিনি বহুকাল হইতে গিরিডিতে বাস করিতেছেন। একটি বড় মোকদ্দমার তদ্বিরের জন্য তিনি হাজারীবাগ আসিয়াছেন। এই মোকদ্দমায় পরাস্ত হইলে তাঁহাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। তিনি প্রতিদিনই কাছারীর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। একদিন তিনি তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্ল মূর্ত্তিতে আমাদের নিকট আসিলেন এবং নানা প্রকারের সৎপ্রসঙ্গে সময় যাপন করিলেন। বিদায়কালে তাঁহার সঙ্গে আমি দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাঁহার মোকদ্দমার কতদূর হইল? তিনি সহাস্যমুখেই বলিলেন যে, আজ মোকদ্দমা হারিয়া আদালত হইতে আমাদের বাড়ী আসিয়াছেন। আমি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। যে মোকদ্দমায় তাঁহার একরূপ সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে কিছুমাত্র বিষণ্ণ করিতে পারে নাই এবং ৩।৪ ঘণ্টা এত কথা বলিলেন,

কিন্তু সেই মোকদ্দমা পরাজয়ের কথা একবারও উল্লেখ করিলেন না। মনে হইল যেন, এই ঘটনা তাঁহার মনের উপর বিশেষ কিছুই কার্য্য করে নাই। এটা যেন বাজে কাজের মধ্যে একটা কাজ হইয়া গিয়াছে। এই একটিমাত্র ঘটনায় তাঁহার উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল। পরে বন্ধুগণের মুখে শুনিলাম, তিনি একজন স্বাবলম্বী, নিষ্ঠাবান্ ভক্ত-বৈষ্ণব। একটা মেয়েলী প্রবাদ আছে যে, একটা ভাত টিপিয়া দেখিলে হাঁড়ির সমস্ত ভাতের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ এক একটি ব্যাপারের মধ্য দিয়া এক একজন লোকের হৃদয়ের অবস্থা জানা যাইতে পারে। উক্ত তা মহাশয় একজন গৌরাঙ্গ-ভক্ত নিষ্ঠাবান্ সাধক, তিনি সর্ব্বদাই মালা জপ করিয়া থাকেন। ইঁহার সহিত শেষে আমাদের বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল এবং হাজারীবাগ হইতে কলিকাতা ফিরিবার সময় ইঁহারই বাড়ীর এক অংশ ভাড়া লইয়া আমরা একমাসকাল গিরিডিতে বাস করিয়াছিলাম।

বন-ভোজন

আমাদের একদিন বন-ভোজনের ইচ্ছা হইল। মনোরমাও তাহাতে অভিমত প্রকাশ করিলেন। তখনকার হাজারীবাগের মুরব্বি রায় বাহাদুর যদুনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রকাণ্ড অগ্নিবাস দিলেন, গোপালবাবু দিলেন তাঁহার পুস্‌পুস্। গিরীন্দ্র বাবু টম্‌টম্ দিলেন, এতদ্ব্যতীত খাদ্য দ্রব্যাদি ও চাকর চাকরাণীদিগের যাওয়ার

জন্য একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করা হইল। দ্রব্যসম্ভার লইয়া চাকর-চাকরাণীগণ আগেই গরুর গাড়ীতে রওয়ানা হইল। একটী পাহাড়ে বনভোজনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সে স্থান সহর হইতে ৬ মাইল ব্যবধান, হাজারীবাগ রোডের উপরে।

তখন আমাদের বাসায় সর্ব্বসমেত প্রায় পঁচিশ জন পরিজন। আমাদের সৌভাগ্য এই যে,আমরা যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকিতাম, সেই স্থানেই বহু বন্ধুর সমাগম হইত। কষ্ট করিয়াও বন্ধুগণ আমাদের বাড়ীতে থাকিতে ভালবাসিতেন। মনোরমার গৃহকে কেহই পরগৃহ মনে করিয়া সঙ্কুচিত হইতেন না। রেল-ষ্টেশন হইতে ৭২ মাইল দূরে থাকিয়াও আমরা বন্ধুসমাগমে বঞ্চিত হই নাই।

পাহাড়তলিতে উপস্থিত হইয়া আমরা একটি প্রকাণ্ড আম-বাগানে চটি পাতিলাম। একটা অহেতুক-আনন্দে আমাদের প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মনোরমা সঙ্গে থাকিলে মনে হইত যেন একটি পূজা-মন্দির আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। সে মন্দিরে নিরন্তর সঙ্গোপনে উৎসবানন্দ চলিতেছে, ভক্তির পুষ্প-চন্দনে, পবিত্রতার ধূপ-ধুনায়, অনাহত শঙ্খ-ঘণ্টা-রবে, ধ্যান-দীপের বিমল জ্যোতিতে, পঞ্চ-প্রাণের আরতিতে সে মন্দিরটি নিরন্তর শান্তি ও কল্যাণে পরিপূর্ণ। এই সুবিস্তৃত প্রান্তর-ভূমিতে পর্ব্বতের পাদদেশে আমরা সকলে বেড়াইতে লাগিলাম। কেহ কেহ বলিল, এই পাহাড়ে বাঘ-ভালুকের ভয় আছে। তাহা শুনিয়া আমাদের তিন বৎসরের ছেলে দেবরঞ্জন (ডাকনাম টুলু) ছোট একটি ছড়ি হাতে করিয়া "আমি একটা বাঘ মারিয়া আনি" বলিয়া পাহাড়ের দিকে চলিল, বালকের এই সামান্য কথায়

আমাদের মধ্যে একটা হাসির রোল উঠিল। মানুষের প্রাণ যখন সরস থাকে, তখন সামান্য কারণেও আনন্দের ফোয়ারা ফুটিয়া উঠে। •

বন-ভোজনের আনন্দের মধ্যে হঠাৎ একটা উদ্বেগ উপস্থিত হইল। অম্নিবাসের প্রকাণ্ড ওয়েলার ঘোড়া দুটি মাঠে চরিতেছিল, অকস্মাৎ একটা ঘোড়া ছুটিয়া পলাইল; সেটাকে ধরিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইল, কিছুতেই কৃতকার্য্যতা লাভ করা গেল না। ক্রমান্বয় ছুটিয়া সেটা একেবারে সহরে আপন আস্তাবলে উপস্থিত হইল। সেখান হইতে তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল। যদি ঘোড়াটাকে না পাওয়া যায়, তবে সহরে আসিতে আমাদিগকে কিরূপ কষ্ট পাইতে হইবে, ভাবিয়া আমি চিন্তিত হইয়াছিলাম।

আমবাগানে রান্না চড়িল, আহার সমাপ্ত হইতে দিবা অবসান হইয়া গিয়াছিল। মনোরমার জ্যেঠাই-মাতা এবং শ্রীমান্ উপেন্দ্রের মাতা প্রভৃতি রান্না করিলেন। আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসিয়া ভগবানের নাম করিতেছিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীমান্ রেবতী ও উপেন্দ্র বেহালার সঙ্গে সুমধুর কীর্ত্তন ধরিলেন। স্থান, সময় ও মনের অবস্থা সমস্তই অনুকূল থাকায় সেই সঙ্গীত-সুধাপানে সকলেই পরিতৃপ্ত হইলেন। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে গাছের পাতা কুড়াইয়া স্থানে স্থানে আমরা আগুন জ্বালাইয়া দিলাম। তখন শীতের সময়, খুবই শীত পড়িয়াছে, বাঘের ভয়ের কথা মনে করিয়া আমরা তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিতে ব্যস্ত হইলাম। মনোরমাকেও গাড়ীতে উঠিবার জন্য তাড়া দিতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি গাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "রমণী'রা গাড়ীতে উঠিল কি না"? রমণী নামে

আমাদের এক চাকরাণী ছিল, সে এবং তাহার মা আমাদের সঙ্গে বন ভোজনে আসিয়াছিল। যতক্ষণ তাহারা কাজকর্ম্ম সারিয়া গরুর গাড়ীতে না উঠিল, ততক্ষণ মনোরমা গাড়ীতে উঠিলেন না; তাহাদিগকে গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া তবে গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলাম। এতগুলি ছোট ছোট শিশু-সন্তান লইয়া বাঘের ভয়ের কথা শুনিয়াও তিনি আগে চাকরাণী-দিগকে গাড়ীতে না উঠাইয়া নিজে গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন না। তিনি যে কোনরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে এইরূপ কার্য্য করিতেন, তাহা নহে, তাঁহার প্রকৃতিই তাঁহাকে এইরূপ কার্য্য করাইত।

মিডিয়ম গোবিন্দ

বদান্যবর জমীদার ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় প্রেততত্ত্ব-বিশ্বাসী ছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে ভাবে পরকাল ও পরলোক-তত্ত্বের গবেষণা করিতেছেন, তিনি সেই ভাবের পক্ষপাতী, এমন কি, বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এই জন্য আমার বরশালের মিডিয়ম গোবিন্দকে সেখান হইতে আনাইয়া হাজারীবাগে আমার নিকট রাখিলেন। যাহাতে আমার সঙ্গে থাকিয়া এই মিডিয়ম আরও উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তিনি গোবিন্দের খরচ বাবদ মাসিক ২০ টাকা করিয়া আমার নিকট পাঠাইতেন। গোবিন্দকে

লইয়া হাজারীবাগে অনেক দিন চক্র করা হইয়াছে, তাহাতে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। হাজারীবাগের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঘটনা-স্থলে উপস্থিত ছিলেন। সে সকলের সবিশেষ আমার মনে নাই। হাজারীবাগের অনেকের মনে আছে, কেন না, তাঁহারা আর কখন সেরূপ দেখেন নাই।

রোগারোগ্য

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার গুপ্ত (সরকারী উকীল) মহাশয়ের শ্যালী-পতি ভাই ব্রজেন্দ্র বাবু কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত ছিলেন। তাঁহার শরীরের নানা স্থানে কুষ্ঠক্ষত হইয়াছে, তিনি একরূপ মৃত্যু-শয্যায় শায়িত আছেন। গিরীন্দ্র বাবু প্রভৃতির যে কারণেই হউক এইরূপ বিশ্বাস জন্মিল যে, আমি আমার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এই রোগীকে আরোগ্য প্রদান করিতে পারিব। তাঁহাদের অনুরোধে আমি রোগীকে দেখিতে গেলাম, তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল যেন, আমি এক মুমূর্ষুর নিকট আসিয়াছি। মুখে, হাতে, নাকে, আরও অনেক স্থানে কুষ্ঠ-ক্ষত অতিশয় গভীর হইয়া পড়িয়াছে। রোগীর উঠিবার কিংবা বেশী নড়িবার ক্ষমতা নাই। আমি কিছুক্ষণ আমার গুরুদত্ত নাম করিলাম, ক্রমে ক্রমে আমার মনে একটু শক্তির সঞ্চার হইল, তখন হাতে করিয়া জল লইয়া কয়েকবার রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিলাম। মনে হয় যেন, একটা মলমও ক্ষতস্থানে লাগাইতে দিয়াছিলাম। যাহা

হউক, পরের দিন হইতে রোগী অনেকটা আরাম বোধ করিতে লাগিলেন এবং দুই চারিদিনের মধ্যেই হাঁটিয়া বেড়াইতে সক্ষম হইলেন। পর পর ঘটনা আমার মনে নাই। ইহার কয়েক বৎসর পরে কলিকাতায় একটা বাড়ীতে গিরীন্দ্র বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, সে বাড়ীতে সেই দিন কোন বিবাহের বরযাত্রী অনেক জুটিয়াছিল। সেই সকল লোকের মধ্য হইতে একজন আমার সম্মুখে আসিয়া নমস্কার করিয়া পরিচয় দিলেন, তিনি সেই কুষ্ঠরোগী ব্রজেন্দ্র বাবু, আজি বরযাত্রী হইয়া আসিয়াছেন। আমি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম, "আপনি কিরূপে এরূপ আরোগ্য লাভ করিলেন?" তিনি বলিলেন, "আপনিই আমার জীবন-দাতা।" আমি হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না, কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সহিত পুনঃ পুনঃ সেই কথাই বলিলেন। আমার কিন্তু সংশয় রহিয়া গেল।

গ্রন্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

জ্যৈষ্ঠ মাস, হাজারীবাগে ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। এই সময় শ্রীমান্ রেবতীমোহন সেন, উমেশচন্দ্র বসু, অন্নদাচরণ সেন, বিপিনবিহারী ঘোষ * আমাদের বাসায় ছিলেন।

* রেবতী বাবু এক্ষণে কলিকাতার মুক ও বধির বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক এবং "নল দময়ন্তী" "হাসন হোসেন" ও "বালক শ্রীকৃষ্ণ" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচয়িতা। উমেশ বাবু (ইউ, সি, বসু) গরীব ঔষধালয়ের স্বত্বাধিকারী। অন্নদাচরণ জলপাই গুড়ির উকীল। বিপিন বিহারী আমার মাসীর পুত্র ছিলেন, তিনি হাজারীবাগে আমার বাসাতেই দেহত্যাগ করিয়াছেন।

একদিন অন্নদাচরণ ও বিপিনবিহারী আমাদের বাসাস্থ সকলকে খাওয়াইতে ইচ্ছুক হইলেন এবং অন্নদাচরণের বিশেষ বন্ধু শ্রীমান্ কালীপদ রায়-(এখন হাজারীবাগের উকীল) কেও নিমন্ত্রণ করিলেন।

ইহার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে আমি নিয়ম পূর্ব্বক দৈনিক "শ্রীশ্রী-চৈতন্য-ভাগবত" পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রতিদিনই কয়েক পৃষ্ঠা নিয়মমত পাঠ করিয়া তবে মধ্যাহ্ন-ভোজন করিতাম। এই নিয়মিত পাঠের মধ্যে একদিন প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল যে, যে দিন এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে, সেই দিন পরমান্ন প্রভৃতি দ্বারা ভোগ প্রদান করিয়া ধর্ম্ম-বন্ধু-গণের সহিত একসঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করিব। এই সঙ্কল্প আমি অনেক দিন হইল ভুলিয়া গিয়াছি। আজ আমার গ্রন্থ-সমাপ্তির দিন, কেন না, শেষ অধ্যায়টি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু আজ হঠাৎ এরূপ শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল যে, গ্রন্থপাঠের সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাথায় একটা কাপড় বাঁধিয়া পড়িয়া রহিলাম।

এ দিকে নিমন্ত্রিত কালীপদকে ডাকিয়া আনিতে অন্নদাচরণ প্রায় ৩ ঘণ্টার অধিককাল তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছেন, বেলা প্রায় ১টা বাজিতে চলিল, এখনও তাঁহাকে লইয়া ফিরেন নাই। এক ঘণ্টার অধিককাল হইল রান্না হইয়া গিয়াছে। সকলেই ক্ষুধিত এবং বিরক্ত হইয়া স্থির করিলেন যে, উঁহাদের জন্য আর অপেক্ষা করা হইবে না। এমন সময় হঠাৎ আমার মনে এই ভাবের উদয় হইল যে, আমার গ্রন্থ-পাঠ সমাপ্ত হইলেই তাঁহারা আসিবেন। এই ভাবটি এমনই সবেগে মনে আসিয়াছিল যে, আমি তৎক্ষণাৎ মাথার পাগড়ীটা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া পাঠ করিতে বসিলাম এবং আমার অতিথি বন্ধুবর্গকে হাতের দ্বারা

ইঙ্গিত করিয়া একটু বিলম্ব করিতে বলিলাম। আমার পাঠ সমাপ্ত হইতে ১৫ মিনিটের অধিক সময় লাগিল না। পাঠান্তে আমি যাই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম, অমনি আমার মাথার কাছে অন্নদাচরণ ও কালীপদ আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন ভাবাবেশে আমার সমস্ত শরীর বিকল হইয়া গেল। এমনই ভাবে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাবাবেশে আড়ষ্ট হইতেছিল যে, আমি মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। অবিরাম চক্ষুর জলে ভাসিতেছিলাম, একরূপ অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে আত্ম-সংবরণ করিয়া দেখিলাম, সমস্ত খাদ্যবস্তু সাজান হইয়াছে। আমি মনোরমাকে বলিলাম যে, তুলসী-মঞ্জরী দ্বারা সমস্ত বস্তু ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া দাও। মনোরমা তাহাই করিলেন। এই কৌশলে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা আমার ন্যায় সাধন-হীনের পূর্ব্ব-সঙ্কল্প সিদ্ধ করিয়া বাঞ্ছাকল্পতরু নামের সার্থকতা দেখাইলেন। আমি যে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা আমার মনেই ছিল না; কিন্তু আজ আমার গ্রন্থ-সমাপ্তির দিন ছিল। আজি যে পরমান্ন প্রভৃতি সুখাদ্যের আয়োজন হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না; ভিন্ন কারণে অন্য লোকেরা সে সমস্তের আয়োজন করিয়াছেন। অন্নদা-চরণ ও কালীপদ যদি আসিতে এতটা বিলম্ব না করিতেন, তবে পূর্ব্বেই আমাদের আহার হইয়া যাইত, গ্রন্থপাঠ হইত না। আমার শিরঃপীড়ার মধ্যে কেহ যদি হৃদয়মধ্য হইতে তীব্রভাবে গ্রন্থপাঠের জন্য তাড়া না দিতেন, তবে গ্রন্থপাঠ হইত না সুতরাং ভোগ দেওয়াও হইত না। আর এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই যে ভাবাবেশে আমার শরীর বিকল হইয়াছিল, তাহা নহে; যিনি অন্যান্য ঘটনাগুলির সংযোগ করিয়া-

ছেন, তিনিই আমার মধ্যে অহেতুক ভাবের সঞ্চার করিয়া গ্রন্থাধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। এই ঘটনায় উপস্থিত সকলের হৃদয়ই একটি বিশেষভাবে অভিভূত হইয়াছিল।

সেই দিন প্রত্যেক বস্তুর ও প্রত্যেক ভাবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি আমার বিশ্বাস জন্মিল। বুঝিলাম, খণ্ড বা নির্জ্জীব কিছুই নাই। বাল্যকালে মামার বাড়ীতে বাৎসরিক "বাস্তুপূজা"* দেখিয়াছি, তখন তাহার অর্থ বুঝি নাই? যিনি অখণ্ডরূপে সর্ব্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই যে জড়, অজড় প্রত্যেক খণ্ডের মধ্যে দেবতা হইয়া জাগ্রত আছেন, তাহা আগে বুঝি নাই। শ্রীকবীর সাহেব বলিয়াছেন যে, "সিন্ধুর মধ্যে বিন্দু আছে, তাহা ত সকলেই দেখিতে পায়, কিন্তু বিন্দুর মধ্যে যে সিন্ধু রহিয়াছে, তাহা প্রায়ই কেহ দেখিতে পায় না"। আমাকে তোমরা অন্ধ বল, মূর্খ বল, কুসংস্কারী বল, সকলই অনায়াসে মানিয়া লইব, তবু আমি যদি খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের প্রত্যক্ষলীলা দেখিতে পাই, তবেই আমাকে কৃতার্থ মনে করিব। যে হাজারীবাগে ঠাকুর আমাকে গ্রন্থাধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে পরিচয় দিয়াছেন, সেই হাজারীবাগের স্বর্ণ-ভুমিকে আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি।

* বৎসরের মধ্যে যেমন লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা হয় সেইরূপ বাস্তুভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেও বৎসরে একদিন ধূপ দীপ নৈবেদ্য ও যথাবিহিত বলি উপহার দ্বারা পূজা দিতে হয়; পূর্ব্ববঙ্গে অনেকস্থলেই এই "বাস্তুপূজা" প্রচলিত আছে।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব

ঝুলন-পূর্ণিমার দিনে স্বর্ণময়ীর স্বর্ণগর্ভ হইতে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই তিথি ধরিয়া (ইং ১৮৯৬ সালের আষাঢ় মাসে) আমরা হাজারীবাগে তাঁহার জন্মোৎসব করিয়াছিলাম। বোধ হয় শিষ্যদিগের দ্বারা ঠাকুরের জন্মোৎসব এই প্রথম হইল।

ইহার কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই আমাদের বাড়ীতে একটী কার্য্য হইতেছিল। একখানি ত্রিপায়ার উপরে ঠাকুরের ফটো রাখা হইত। ক্রমে সেটীকে পুষ্পদ্বারা সাজান আরম্ভ হইল, তাহার পরে সচন্দন-পুষ্প দেওয়া হইল, ক্রমে ক্রমে ধূপ ধুনা ও ঘৃতের প্রদীপ দিয়া অনতিবিলম্বে করতালের বাদ্যের সঙ্গে আরতি আরম্ভ হইল। ইহার কোন কার্য্যই কোন প্রকারের সঙ্কল্প করিয়া হয় নাই, একটীর পর একটী স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। এই সময় হইতে নিত্য-আরতি আরম্ভ হইল।

তখনও আমার মন হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের সংস্কার একেবারে বিদূরিত হয় নাই। মৃত কিংবা অনুপস্থিত আত্মীয়জনের প্রতিকৃতিকে কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানের সময় পুষ্পপত্রে সজ্জিত করা যাইতে পারে, একান্তপক্ষে সেই প্রতিকৃতির ললাটে চন্দনও দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ধূপ-প্রদীপ লইয়া তাহার সম্মুখে বাদ্য বাজাইয়া আরতি করা তখনও একান্ত কুসংস্কারের মধ্যেই গণ্য ছিল। কিন্তু একটির

পর একটি এমন ভাবে আসিয়া পড়িতে লাগিল যে, বিচারগত সংস্কারের দ্বারা কোন ভাবই বাধাপ্রাপ্ত হইল না। ইহার পর সেই ফটোর নিকট কিছু কিছু ভোগ দেওয়া আরম্ভ হইল।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি নবানুরাগের সময় মন যেরূপ প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তনের সময় মন ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে সেইরূপ অকস্মাৎ যুদ্ধ-ঘোষণা করে নাই। গৃহদাহের পরে গৃহস্থ যেরূপ ভস্মাবশিষ্ট প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি আবশ্যকমত একটি একটি করিয়া কুড়াইয়া লয়, পূর্ব্ব-পরিত্যক্তভাব ও সংস্কারগুলিকে সেইরূপ আবশ্যকমত একটি একটি করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল। এইরূপ গ্রহণের মধ্যে কোনওরূপ বাহিরের উত্তেজনা অথবা তাড়না ছিল না। নবীন-গৃহস্থ সংসার পাতিবার সময় যেমন করিয়া প্রয়োজনীয় বস্তু একটি একটি করিয়া সংগ্রহ করে, শূন্য-হৃদয় পূর্ণ করিবার জন্য আমার মন সেইরূপই প্রয়োজনীয় আসবাব সংগ্রহ করিয়া লইতেছিল।

আমাদের ফটোপূজা লইয়া গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আপত্তি ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুবর্গের আপত্তির মতন নহে, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি পূজা করা বিধি-সঙ্গত নহে। কিন্তু আমি তখন একান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছিলাম, দশের কথা শুনিবার কিংবা কুসংস্কারের কথা ভাবিবার আমার অবসর ছিল না। মাটীতে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিয়া যাহার তাপিত প্রাণ শীতল হয়, ইস্তিরী করা পরিষ্কার পোষাকে ধূলা লাগিবার ভয় দেখাইলে সে নিবৃত্ত হইবে কেন?

মনোরমা আমার এই সকল কার্য্যে উৎসাহ কিংবা নিরুৎসাহ কিছুই দেখান নাই। তবে ফটোখানি' সুন্দর করিয়া সাজান হইলে একদৃষ্টে তাকাইয়া অনেকক্ষণ দেখিতেন। আরতির সময় উপস্থিত থাকিতেন এবং আরতি হইয়া গেলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেন। কোন কার্য্যেই তিনি চাঞ্চল্য অথবা অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাইতেন না। সকল অবস্থায়ই তাঁহার অতি শান্তভাব ছিল। এমন কি, যখন স্নেহের পুতুল পুত্রকন্যাগণের মুখচুম্বন করিতেন, তখনও তাঁহাতে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইত না। মুখখানি আস্তে আস্তে ধরিয়া, আস্তে আস্তে একটি দীর্ঘ-স্থায়ী চুম্বন করিতেন। সে চুম্বনে কখনও শব্দ হইত না। একদিন তিনি একটি কোলের শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছিলেন, শিশুটি মায়ের বুকে থাকিয়া স্তন্যপান করিতেছে, জননী সন্তানের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন, এমন সময় আমাদের উদাসী গুরুভ্রাতা ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় সেই স্থানে হঠাৎ উপস্থিত হইলেন। মনোরমা তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। বিধুবাবু তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বালককে স্তন্যপান করাইতে দেখিয়া সেখানে দাঁড়াইলেন না; কিন্তু সেই যে একবার মনোরমার মুখের দিকে তাকাইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, তাহাতেই তিনি এমনই একটি আশ্চর্য্যভাব দেখিয়াছিলেন, যাহা চিরকালের জন্য তাঁহার মনে জাগিয়া রহিয়াছে। বিধুবাবু বলিলেন যে, তখন মনোরমার মুখশ্রীতে অতি আশ্চর্য্য মমতাময়ী মাতৃ-মূর্ত্তির প্রকাশ হইয়াছিল। স্তন্যদানের সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণময়ী জননী আপনার মাতৃস্নেহের ধারা যেন সন্তানের উপর ঢালিয়া দিতেছিলেন। সেই শান্ত-মূর্ত্তিতে মাতৃস্নেহের লাবণ্য পড়িয়া ,একটি অপূর্ব্ব

ভাবের বিকাশ হইয়াছিল। তাঁহার সমস্ত ভাবগুলি অন্তরে ঢাকা থাকায় অবয়বের মধ্য দিয়া সে সকল ভাবের আভা প্রকাশ পাইত। মনোরমা দেখিতে যদিও কুৎসিত ছিলেন না, সুন্দরীও ছিলেন না; কিন্তু সকলেই তাঁহাকে দেখিতে ভালবাসিত। সমাধির সময় লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া বলিতেন যে, ঠিক যেন মাতৃমূর্ত্তি। অঞ্চলে প্রদীপটি ঢাকিয়া রাখিলে যেমন আঁচলটি উজ্জ্বল হইয়া উঠে, অতি প্রগাঢ় ভাবগুলি অন্তরে ঢাকা থাকায় তাঁহার মুখশ্রীতে একরূপ ভাবের আভাস খেলিত।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসবের প্রসঙ্গে এই সকল কথা কাহারও অসংলগ্ন মনে হইতে পারে; কিন্তু আমি দুইটি কারণে এই অধ্যায়ের মধ্যে এই কথাগুলি বলিলাম। প্রথম কারণ এই যে, লিখিতে আরম্ভ করিলে যে কথাগুলি যখন আপনি আসিয়া প্রাণে উদিত হয়, সেগুলি তখন না লিখিলে পরক্ষণেই ভুলিয়া যাই, আর এইরূপ উপস্থিত হওয়ার কোন নিগূঢ় কারণও থাকিতে পারে। দেখিয়াছি, মনকে একটু আল্‌গা করিয়া লিখিতে বসিলে, যেখানে যাহা আসা দরকার, তাহা আপনি আসিয়া পড়ে, হঠাৎ উহা অপ্রাসঙ্গিক মনে হইলেও পরিণামে প্রাসঙ্গিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এই জন্মোৎসবের মধ্যে এমনই একটা উল্লাসের সঞ্চার হইয়াছিল যে, উপস্থিত অধিকাংশ লোকই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু মনোরমার মধ্যে কিছুমাত্র ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিলাম না। ইহাতে একটু বিমর্ষ হইয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আজকার উৎসবে সকলকেই ভাবে অভিভূত দেখিলাম, তোমার কি তেমন ভাল

লাগে নাই ?" মনোরমা বলিলেন, "ভাল না লাগিবে কেন ? তবে সকলের ভাব ত আর সমান নয়।" ইহা বলিয়াই নীরব হইলেন।

ঠাকুরের জন্মোৎসবে হাজারীবাগ সহরের প্রধান প্রধান অধিকাংশ বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। হিন্দুস্থানীর মধ্যে ভক্তবর পণ্ডিত অক্ষয়-বট ছিলেন। সেদিনকার আরতি ও কীর্ত্তনে এতই আনন্দ হইয়াছিল যে, দুই জন অতি গম্ভীর-প্রকৃতি সম্ভ্রান্ত উকীল এবং ৺মতিলাল সেন ও পণ্ডিতজী প্রভৃতি আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। অধিকাংশ উপস্থিত ব্যক্তিই অশ্রুজলে প্লাবিত হইলেন।

আরতি সমাপনান্তে আমি অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবকে ডাকিয়াছিলাম। উৎসবান্তে আমি শ্রীমান্ রেবতীকে এই কথা কলিকাতায় লিখিয়াছিলাম, শুনিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিলেন যে, তিনি আমার কাতর-কণ্ঠের সেই ডাক শুনিয়াছেন। যাহারা কিছু-মাত্র অধ্যাত্ম-বিদ্যার চর্চ্চা করেন অথবা বর্ত্তমান বৈদেশিকতত্ত্ব-বিদ্যার সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন কার্য্য নহে। দূরদর্শন, দূর-শ্রবণ প্রভৃতি বুজরুকী নহে, যাঁহারা যোগ-পথে কিঞ্চিন্মাত্রও অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারেন। আজকালকার পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান, তারহীন-টেলিগ্রাফ প্রভৃতির উদ্ভাবন করিয়া হিন্দু-যোগ-তত্ত্বের কথঞ্চিৎ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

হাজারীবাগ পরিত্যাগ

আমার মিডিয়ম গোবিন্দ কিছু দিন হাজারীবাগে আমার নিকট ছিল। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের অনুরোধে তাহাকে লইয়া কয়েক দিন প্রেত-তত্ত্বের চর্চ্চা করা হইয়াছিল। গোবিন্দের মধ্যে নানা প্রকার অলৌকিক ভাবের আবির্ভাব দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় গোবিন্দকে প্রতিপালন করার ইচ্ছায় তাঁহার বরিশালের প্রধান কর্ম্মচারীকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন যে, "ইহাকে প্রতিপালন করা আমার ইচ্ছা।" এরূপ পত্র পাইয়াও গোবিন্দ সেই কর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা করিতে সাহস করে নাই, অথচ এই গোবিন্দের দেহটাকে অবলম্বন করিয়া কত জ্ঞান ও শক্তির প্রকাশ হইয়া গিয়াছে।

হাজারীবাগে আমার মাসীপুত্র ৺বিপিনবিহারী ঘোষ আমার বাসায়ই মায়াময়-দেহ পরিত্যাগ করেন। বিপিন সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক যুবক ছিলেন। এই ঘটনাটি আমাদের পক্ষে বড়ই বিষাদের কারণ হইয়াছিল।

আমরা হাজারীবাগ থাকিতে আমার মেজদিদির মৃত্যু-সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছাইল। পাঠক এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে মেজদিদির পরিচয় পাইয়াছেন। মনোরমার জীবনের সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তিনি মায়ের মতন স্নেহ করিয়া মনোরমাকে ও আমাদের জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যরঞ্জনকে লালন-পালন করিয়াছেন, মনোরমার

সহিত চিরদিন একসঙ্গে থাকিবার আশা করিয়া আমার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন, সত্যরঞ্জন তাঁহাকে নিজের মায়ের অপেক্ষা কম ভালবাসিত না। মনোরমা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, আমিও খুবই ভালবাসিতাম। আজ তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ আমাদের পরিবারে একটা সাময়িক বিষাদের ছায়া আনিল। মনোরমার চক্ষু হইতে দরদর ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল, তাঁহার জ্যেঠাই-মা (মেজ দিদির মামী শাশুড়ী) চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই ভাগিনেয়-বধূকে তাঁহারা আপন পুত্র-বধূর ন্যায় লালন-পালন ও স্নেহ করিতেন। প্রথমখণ্ডে বলিয়াছি যে, আমার মেজদিদি (জ্যেঠতুত ভগিনী) আমার শ্বশুর মহাশয়ের অতি আদরের ভাগিনেয়-বধূ, মনোরমা তাঁহাকে বৌঠাকরুণ বলিয়া ডাকিতেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার যত আব্দার বৌঠাকুরাণীর উপরই চলিত; আমাদের সন্তানগণ মেজদিদিকে "ঠান্‌মামী" এবং আপন মামীকে ছোট মামী ডাকিত। আজ সত্যরঞ্জন তাহার ঠান্‌মামীর শোকে এমনই অধীর হইয়া পড়িল যে, আমরা সকলেই আপনাপন শোক সংবরণ করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দান করিতে বাধ্য হইলাম। জন্মাবধি চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সত্যরঞ্জন তাহার ঠান্‌মামীর অঞ্চলের ধন ছিল, তিনি এই জগতে সত্যরঞ্জন অপেক্ষা কাহাকেও অধিক ভালবাসিতেন না, সত্যরঞ্জনও তাঁহাকে সেইরূপই ভালবাসিত। আজ তাঁহার শোকে বালকের মূর্চ্ছার পর মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। এক একবার চেতনা হয়, অল্পক্ষণ পরেই "ঠান্‌-মামী গো" বলিয়া চীৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত শরীরে খিল ধরিয়া তৎক্ষণাৎ সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে,

এইরূপে প্রতি ঘণ্টায় ৩।৪ বার করিয়াও মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। বালকের অন্তঃকরণ অত্যন্ত কোমল ও ভালবাসা-প্রবণ ছিল; তাহার সেই সময়কার অবস্থা দেখিয়া আমরা এতই ভয় পাইলাম যে, ডাক্তার ডাকিবার সঙ্কল্প করিলাম। মনোরমা বলিলেন, "ডাক্তার আসিয়া কি করিবে?" তাঁহার মনের ভাব এই ছিল যে, শোককে বাধা না দিয়া শোক প্রকাশ করিতে দেওয়াই ভাল। তিনি নিজে কাছে বসিয়া শোকার্ত্ত-সন্তানের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে বালক কিছু সুস্থ হইল। কিন্তু সমস্ত জীবনে ঠান্‌মামীকে সে কখনও ভুলে নাই। তাহাকে সত্যসত্যই জীবনে দুইবার মাতৃ-শোক পাইতে হইয়াছিল।

প্রায় একবৎসর হাজারীবাগে বাস করিয়া ছেলেদের ম্যালেরিয়ার দোষ নষ্ট হইল এবং আমরা তথা হইতে রওনা হইলাম।

হাজারীবাগে বহুলোকের সঙ্গেই আমাদের আত্মীয়তা হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার গুপ্ত, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও খুল্লতাত ৺দীননাথ গুপ্ত, ৺রাজগোপাল রায়, তখনকার সরকারী উকীল সুপ্রসিদ্ধ ৺রায় যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, উকীল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কৃষ্ণ ঘোষ, নির্ম্মল-চন্দ্র মিত্র, ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সেন এবং তাঁহার ভ্রাতা ৺মতিলাল সেন, শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ প্রভৃতি আমাদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধুরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

পুনরায় গিরিডি

হাজারীবাগ পরিত্যাগ করিয়া আমরা গিরিডি আসিলাম। সে সময় ৭২ মাইল পুস্‌পুসে আসিতে হইয়াছিল। এখন হাজারীবাগ রোড ষ্টেশন হইতে হাজারীবাগ যাইতে হইলে ৪০ মাইল পুস্‌পুসে যাইতে হয়।

গিরিডিতে আসিয়া আমরা শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র ভা মহাশয়ের নিজ ভবনের এক অংশ ভাড়া লইলাম।

এই সময় অদ্বৈত প্রভুর জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীগুরুদেব ঢাকায় ধুলটোৎসব করিতেছিলেন। স্নেহভাজন শ্রীমান্ বেণীমাধব দে হাজারী-বাগে আমাদের সঙ্গেই ছিল, এখানে আসিয়া সে ঢাকার উৎসবে চলিয়া গেল। এই সময় আমরা কোথায় যাইব, শ্রীগুরুদেবকে সে বিষয় জানাইলে, তিনি আমাদিগকে একমাসকাল গিরিডিতেই থাকিতে আদেশ করিলেন। আমরা ঢাকা যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার আদেশক্রমে গিরিডিতেই থাকিলাম। গিরিডিতে এই একমাসকাল অপেক্ষা করায় আমাদের সাংসারিক জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরব্ধ হইল।

ভগবান্ কাহার ভার বহন করিবার জন্য কাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলেন, তাহা কে বুঝিতে পারে? শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সেন মহাশয় তখন হাজারীবাগের এন্‌কম্বার্ড এষ্টেটের ম্যানেজার; সেখানে তখন তাঁহার অসাধারণ প্রভাব ছিল। হিন্দুস্থানী লোকেরা অনেক সময়

জাতিবিদ্বেষ বশতঃ কিংবা অন্য কোন কারণে বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী-দিগকে ভালচক্ষে দেখে না, অনেক সময় তাহাদের উপর সত্যমিথ্যা নানা প্রকারের দোষারোপ করে ; কিন্তু আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, গোপালবাবুর নাম করিলে সকলেই বলে যে, "গোপাল বাবুকা বাত দোসরা হ্যায়" অর্থাৎ গোপাল বাবুর কথা স্বতন্ত্র। বস্তুতঃ তাঁহার কর্ম্মকুশলতা ও সততায় অনেক ঋণগ্রস্ত জমীদার ঋণমুক্ত হইয়াছেন।

আমরা হাজারীবাগ পরিত্যাগ করার পূর্ব্ব হইতেই গোপাল বাবুর মনে এই চিন্তার উদয় হইল যে, আমাদের এত বড় সংসার কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট আয়ের অভাবে কিরূপে চলিবে ? তাঁহার মনের ভাব তিনি আমাকে কিছুমাত্র জানিতে দেন নাই, আমিও কখনও তাঁহাকে আমাদের অভাবের কথা কিছুই জানিতে দেই নাই। আমার অগোচরে তিনি তাঁহার বাধ্য কোন একটি ভদ্রলোকের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন যে, উক্ত ভদ্রলোকের প্রার্থনামতে তিনি তাঁহাকে কতকটা অভ্রের জমির বন্দোবস্ত দিবেন এবং উক্ত ভদ্রলোক আমাকে অর্দ্ধেক অংশিরূপে গ্রহণ করিবেন। গোপালবাবুর নিকট এরূপ প্রস্তাব শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমি যে অভ্রখনির ব্যবসায় করিব, ইহা আমার কল্পনার বাহিরের কথা, বিশেষতঃ আমি কি করিব না করিব, তদ্বিষয় যখন একজনার মতের অপেক্ষা আছে, তখন আমি আদেশ না পাইয়া কিরূপে একটি বৈষয়িক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি ? শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন, কেহ যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সাহায্য করে, তাহা উপেক্ষা করিতে পারিব না, সুতরাং গোপাল বাবুর নিকট হইতে এই অযাচিত অনুগ্রহের প্রস্তাব আমার

উপেক্ষণীয় নহে। মনোরমা বলিতেন, "লোকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক যে উপকার করে, উহা ভগবানের দান, যাহা চাহিয়া লওয়া হয়, তাহাই ঋণ।" গোপাল বাবুর প্রস্তাবকেও আমি ভগবানের দান মনে করিলাম।

কিন্তু তাঁহাকে আমি বলিলাম যে, আমি মূলধন দিতে পারিব না এবং অভ্রের কার্য্য সম্বন্ধেও কিছু জানি না, এরূপ অবস্থায়ও যদি কোন ব্যক্তি আপনার খাতিরে কিংবা অনুরোধে আমাকে অর্দ্ধেক অংশী করিতে রাজি হন, আমার মনে হয়, সেরূপ কারবার সুখজনক হইবে না। যদি সে ব্যক্তি আমাকে অনর্থক লাভের অংশ প্রদান করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই ইহা ভার বোধ করিবেন। অতএব যদি আপনি আমাকে আমার একান্ত-অজ্ঞাত অভ্রের ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন, তবে স্বতন্ত্রভাবে আমাকে কিছু জমী দিতে পারেন, শ্রীগুরুদেব যদি এ কার্য্যে আমাকে নিয়োজিত করিতে ইচ্ছা করেন, তবেই আমি প্রবৃত্ত হইব। গোপাল বাবু আমার জন্য স্বতন্ত্র এ দেশীয় দুই বিঘা (গভর্ণমেণ্টের ৪॥ বিঘা) অভ্র-জমি বার্ষিক ৯৫৲ টাকা খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

কলিকাতা

একমাস গিরিডিতে বাস করিয়া শ্রীগুরুদেবের অনুমতি লইয়া আমরা কলিকাতায় আসিলাম। তখন শ্রীগুরুদেব ঢাকা হইতে

কলিকাতায় আসিয়াছেন। গোপাল বাবুর প্রস্তাবিত অভ্রখনির বন্দোবস্তের কথা তাঁহাকে নিবেদন করিলাম। তিনি বলিলেন, "এখনও কর্ম্ম রহিয়াছে, এই কার্য্যটিকে তপস্যা মনে করিয়া সেই ভাবেই করিতে হইবে। এই কার্য্য দ্বারা কর্ম্ম কাটিবে এবং বহুলোক উপকৃত হইবে, এবং এই কার্য্যটি ধর্ম্মের একটি ইতিহাসস্বরূপ হইবে, সঞ্চয় করার চেষ্টা করিবে না।"

খনির কার্য্যের মূলধন

অভ্রখনির কার্য্যসম্বন্ধে তখন যদি আমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা থাকিত, তবে আমি কখনই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইতাম না। আমি শুনিয়াছিলাম, প্রত্যেক কুলীর মজুরী দুই আনা, তাহারা এক একজন যে মাল তুলিয়া আনিবে, উহার মূল্য অন্ততঃ চারি আনা হইবেই হইবে। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, খনির মধ্যে সাধারণ ভাবে যথেষ্ট অভ্র পড়িয়া থাকে, সুতরাং উহা কাটিয়া আনিলেই হইল। এইরূপ মূর্খতাই আমাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস দিয়াছিল। আমার অভ্রখনি-সম্বন্ধীয় কার্য্যের সমস্ত বিবরণ লিখিতে হইলে একখানা কুতূহলোদ্দীপক বড় গ্রন্থ হইতে পারে, এ জন্য সে সকল কথা আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইল, স্থূল কথা এই যে, দেখিলাম, আমার ধর্ম্মপথে ব্রহ্মান্বেষণ ও ব্যবসায়ের পথে অভ্র অন্বেষণ একই প্রকারের তপস্যা-

সাপেক্ষ। পরিণামে বুঝিলাম, উভয় বস্তুর লাভই কৃপা ও সদ্‌গুরু-সাপেক্ষ। কোনও প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহাদুরীতে এই উভয় বস্তুর কাহাকেও লাভ করা যায় না।

অভ্রখনি

আজিও অনেকে জানেন না যে, অভ্রখনির কার্য্যে বাঙ্গালী ও বেহারী ভিন্ন সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত লোকই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই কার্য্যে অত্যল্প বেতনের বাঙ্গালী ও বেহারী, য়ুরোপ, আমেরিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসীর একমাত্র শিক্ষক। কোন ইংরাজ, জর্ম্মাণ, ফরাসী কি মার্কিণ, বাঙ্গালী ও বেহারীর সাহায্য ভিন্ন অভ্রখনির কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। এ ক্ষেত্রে আমরা জগতের শিক্ষক, কিন্তু আমাদের এত বড় একটা গৌরবের কথা জগতের লোক জানে না, আমাদের দেশের লোকও জানে না, শুনিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিবে কি না, সন্দেহের কথা।

অনভিজ্ঞতাবশতঃ আমরা স্থির করিলাম যে, ৬ মাসের মধ্যে আমাদের এমন একটা কিছু আয় হইবে, যাহা দ্বারা অনায়াসে আমাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। কিন্তু এই ছয় মাসকাল কিরূপে চলিবে? এখন ত আকাশবৃত্তির ব্রত ভাঙ্গিয়া গেল, সুতরাং সংসার-চিন্তা ত করিতেই হইবে।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার গুপ্ত (হাজারীবাগের প্রসিদ্ধ উকীল)

বলিলেন, তিনি এই ছয়মাস কাল আমাদের সংসার খরচের জন্য মাসিক ৬০৲ টাকা করিয়া দিবেন।* গিরীন্দ্রবাবু ইতিপূর্ব্বে আমাদের কোনও ব্রাহ্ম-বন্ধুর সাংসারিক অনাটনের বিবরণ আমার নিকট শুনিয়া উক্ত পরিবারের সাহায্যের জন্য মাসিক ৪০৲ চল্লিশ টাকা করিয়া আমার হাতে দিয়া আসিতেছিলেন, তিনি একবৎসরকাল এইরূপ দিয়াছেন। আর একটি বন্ধুর মৃত্যুর পরে আমি তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম, তিনি উক্তপরিবারের জন্যও কয়েক মাস মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ গুপ্তদান তাঁহার অনেক ছিল, পরিবারস্থ ব্যক্তিরাও সে সকল জানিতেন না। তাঁহার দানে সাম্প্রদায়িকতার নাম-গন্ধ নাই। গিরীন্দ্র বাবু আমার পরিবারস্থ শ্রীমান্ বেণীমাধবের নামে প্রতিমাসে ৬০৲ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিতেন।

মূলধন

খানির কার্য্যের মূলধন কোথা হইতে আসিল? তিন চারি জন সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট হইতে এই সর্ত্তে ৬০০৲ ছয়শত টাকা লইলাম যে, যদি আমি উহা পরিশোধ করিতে পারি, তবে ত ভালই, নতুবা উহার জন্য আমি ঋণী থাকিব না। তখন মনে হইয়াছিল, এমন একটা লাভজনক সহজ ব্যবসায়ের জন্য ছয়শত টাকা মূলধনই যথেষ্ট। ছয় শত টাকা হইতে ৯৫৲ টাকা অগ্রিম রেণ্ট দিতে হইল। মেসার্স শিবকৃষ্ণ দাঁ কোম্পানীর দোকানে প্রয়োজনীয় হাতিয়ারপত্রের জন্য

ফরমায়েস দেওয়া হইল। আমি নূতন লোক বলিয়া তাহাদিগকেও অগ্রিম টাকা দিতে হইয়াছিল। এইরূপে প্রায় দুই শত টাকা খরচ হইয়া গেল। তখন না বুঝিয়া গাঁতি প্রভৃতির বাঁট এক একখানা পাঁচ সিকা করিয়া কিনিয়াছিলাম, অভিজ্ঞতালাভের পরে এক পয়সায় উহার দুইখানি প্রস্তুত করাইয়া লইতাম।

সংক্ষেপ কথা

এখানে আমার অভ্রখনির ইতিহাস পরিত্যাগ করিতে হইবে, কেননা, সে সকল কথা লিখিতে গেলে লেখনী সংবরণ করা সুকঠিন হইয়া উঠিবে। ১২ বৎসরকাল আমি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ক্লেশ, অনাহার ও ব্যাঘ্র-ভল্লূকাদির ভয়কে উপেক্ষা করিয়া সত্য সত্যই কঠিন তপস্যা করিয়াছিলাম। এক পেয়ালা চা ও এক পোয়া দুধ খাইয়া ৯।১০ মাইল পাহাড়ের পর পাহাড় হাঁটিয়া চৈত্র-বৈশাখ মাসের সারাদিন ভীষণ রৌদ্রে ও অনাহারে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া আবার ৯।১০ মাইল হাঁটিয়া রাত্রি ৮।৯টার সময় বাসায় আসিয়া অন্নাহার করিয়াছি, এরূপ-ভাবে অনেক দিন গত হইয়াছে। আমি যে অর্থের লালসায়ই এতটা করিয়াছি, তাহা নহে, শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন যে, তপস্যার ভাবে করিতে হইবে এবং ইহা হইতেই কর্ম্ম কাটিবে। এই কথাই আমাকে বল দিয়াছে এবং সকল প্রকার নিরাশার মধ্যে ধৈর্য্য দিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছে। মূলধন ছিল না, অভিজ্ঞতা ছিল না, উপযুক্ত লোক ছিল

না। বাধা ও নিরাশার ইয়ত্তা নাই। এরূপ অবস্থায় ধনলাভের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করা আমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব হইত। একমাত্র গুরুবাক্য ভিন্ন সফলতা-লাভের অন্য কোন আশা ছিল না। যে খনিতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, সে খনিতে বিক্রয়ের উপযুক্ত মাল পাওয়া গেল না।

ঠাকুরের স্নেহ

মনে হয় ফাল্গুন মাসে (ইং ১৮৯৬ সনে) শ্রীমান্ বেহারীলাল রায়কে সঙ্গে লইয়া গিরিডি হইতে গরুর গাড়ীতে আমি কুশবর (এই স্থানে খনির জমি লওয়া হইয়াছিল) গেলাম। এই সময় শ্রীগুরুদেব প্রায় প্রত্যহ ভক্তবর গুরুভ্রাতা ৺শ্রীধরকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের দ্বারা একটি করিয়া টাকা আমাদের বাসায় পাঠাইয়া দিতেন। একদিন কোন একজন লোক ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ২০৲ কুড়িটি টাকা প্রণামী দিলেন। এরূপ টাকা দেওয়ার নিয়ম ছিল না, কেহ দিলেও তাহা গৃহীত হইত না; কিন্তু আজ ঠাকুর সেই টাকা প্রত্যাখ্যান না করিয়া শ্রীমান্ বেণীকে সেই টাকাগুলি আমাদের ছেলেদের কাপড় খরিদের জন্য দিয়া আসিতে বলিলেন। তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়, অবিলম্বে কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে, বেণী বলিলেন, "কীর্ত্তনের পরে যাইব।" ঠাকুর বলিলেন, "তোমার নিকট কি কীর্ত্তনই বেশী হইল?" বেণী তৎক্ষণাৎ টাকা লইয়া আমাদের বাসায় গেলেন।

বিরক্তি নাই

আমরা যখন বিদ্যাসাগর লেনে ছিলাম, তখন আমাদের পরিবারে অনেক লোক থাকিতেন। বিদেশ হইতে পরিচিত লোকেরা আসিয়া সময় সময় অতিথি হইতেন। ঢাকার কোন একজন ব্রাহ্ম যুবক আমাদের বাসায় অতিথি ছিলেন। তিনি গুরুবাদের ভয়ানক বিরোধী। একদিবস গুরুবাদের বিরুদ্ধে কথা বলিতে যাইয়া তিনি বলিলেন যে, যাহারা গুরু মানে, তাহাদিগকে তিনি পশু বলিয়া মনে করেন। কথাটা আমি একটু মোলায়েম করিয়া বলিলাম, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ইহা অপেক্ষা শক্ত কথা। উক্ত যুবককে আমরা স্নেহ করিতাম, তিনিও আমাদিগকে গুরুজনের ন্যায় মান্য ও শ্রদ্ধা করিতেন। আজ তাঁহার মুখে বহু জনের সমক্ষে এই কথা শুনিয়া শ্রীমান্ রেবতী তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ ভাব ছিল, তাহাতে তাঁহাকে তিরস্কার করিতে রেবতীর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। কিন্তু আজ রাগের মুখে সেই যুবক তাহা সহ্য করিলেন না, আমাদের বাসা ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। তাঁহার উক্তি শুনিয়া আমরা সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলাম। মনোরমা কিন্তু ব্যস্ত হইয়া অতিথিকে অন্বেষণ করিয়া আনাইলেন এবং যত্নের সহিত তাহাকে খাওয়াইলেন। তাঁহাতে কিছুই বিরক্তির চিহ্ন দেখিলাম না।

একদিন আমাদের কোনও গুরুভ্রাতা অকারণে আমাকে কটু-কথা বলিলেন। তাহাতে আমাকে জব্দ বা বিচলিত করিতে না

পারিয়া মনোরমাকেও আমার সঙ্গে জড়াইয়া কিছু কটু বলিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, আমাকে জব্দ করিবার জন্য মনোরমাকে মন্দ বলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। উক্ত গুরুভ্রাতা মহাশয়ের আমার উপরও কোনও খারাপ ভাব ছিল বলিয়া বিশ্বাস করি না, তাঁহার স্বভাবের মধ্যে এইরূপ একটি ঝোঁক ছিল যে, তিনি সময় সময় লোককে জব্দ করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, অথচ ইচ্ছা করিয়াই এইরূপ করিতেন। এইরূপ কার্য্য করিতে যাইয়া তিনি মনে কোনও-রূপ মলিনতা রাখিতেন না, এটা তাঁহার একটা খেয়ালের মতন, এই জন্য তাঁহার নিন্দা-স্তুতিতে সহজে কেহ বিচলিত হইত না। কিন্তু আজ মনোরমাকে জড়াইয়া কথা বলায় উপস্থিত সকলেই এমন দুঃখিত হইলেন যে, কেহ কেহ বলিলেন, এরূপ লোকের সঙ্গে কথা বলা কি উহার মুখদর্শন করা কর্ত্তব্য নহে। কেহ কেহ তাঁহার সম্মুখেই তাঁহাকে ঘোর তিরস্কার করিলেন। এই কথাটা লইয়া আমাদের বাড়ীতেও আলোচনা হইল, বন্ধুগণ সকলেই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। মনোরমার মুখের দিকে তাকাইয়া সকলেই বুঝিলেন যে, তাঁহার মুখশ্রীর কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সেই দিনই যখন আমরা সকলে মধ্যাহ্ন আহার করিতে বসিয়াছি, মনোরমাও পরিবেশনে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় সেই নিন্দাকারী গুরুভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনোরমা তাঁহাকে নমস্কার করিলেন, তাঁহার মুখশ্রীতে স্বাভাবিক আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আগন্তুকও প্রণাম করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এখনই আমাকে শীঘ্র একটু চা করিয়া দিতে হইবে।" মনোরমা চা প্রস্তুত করিতে বসিলেন, আগন্তুক আব্দার করিয়া আরও কিছু খাইতে চাহিলেন। মনোরমা যখন

সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেছিলেন, তখন কতই আনন্দে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল, আমরা অবাক্ হইয়া দেখিতেছিলাম। গুরুভ্রাতাটিও কম পাত্র নহেন। কিছু কাল পূর্ব্বে যাঁহার অযথা নিন্দা করিয়াছেন, সেই কথা লইয়া একটা জটলা হইয়াছে, অনায়াসে আসিয়া তাঁহার নিকট আব্দার করিয়া অসময়ে চা খাইতে চাহিয়া বিরক্ত করিতে সঙ্কোচবোধ না করা সাধারণ লোকের কর্ম্ম নহে। তিনি বোধ হয়, বিশ্বাস করিতেন যে, কিছুতেই মনোরমার মন মলিন হইবে না। সেই দিন বিকালে আমি মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "* * * * বাবু তোমাকে যে নিন্দা করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া তোমার কি তাঁহার প্রতি বিরক্তি জন্মায় নাই?" তিনি বলিলেন "না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই পৃথিবীতে কোনও লোকের উপরই কি তোমার বিরক্তি নাই?" তিনি বলিলেন, "টের ত পাই না।" তাঁহার কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, মন কতটা নির্ম্মল হইলে তবে সমাধির অবস্থা লাভ হয়! "বিদ্বেষ" এবং "বিরক্তি" এক কথা নহে, বিদ্বেষশূন্য চিত্তই সু-দুর্ল্লভ, বিরক্তিশূন্যের ত কথাই নাই।

পরমান্ন-প্রদান

৪৯ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে থাকিতে একদিন মনোরমা স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি শ্রীগুরুদেবকে পরমান্ন রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেছেন। গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আপত্তি করিলেন, কিন্তু ঠাকুর মনোরমার

অভিপ্রায় শ্রবণমাত্র আগ্রহ সহকারে অনুমোদন করিলেন এবং তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন।

প্রসাদ-প্রদান

৪০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে থাকিতে একটি সুন্দর ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমাদের কোন একজন সুশিক্ষিত শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা মনোরমার প্রসাদ পাওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। আমাদের সাধন-প্রণালীর মধ্যে কাহারও উচ্ছিষ্ট-ভক্ষণ নিষিদ্ধ, তথাপি কেন যে তাঁহার মতন নিষ্ঠা ও গুরুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তির মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল, বলিতে পারি না। শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশের মধ্যে এরূপ কথাও ছিল যে, পিতা, মাতা ও স্বামীর উচ্ছিষ্ট খাইতে পারা যায় এবং যদি কোথাও কাহারও উচ্ছিষ্টে প্রসাদ-বুদ্ধি জন্মে, তাহাও নিষিদ্ধ নহে। আমার মনে হয়, এই শেষ বিধিটি অবলম্বন করিয়াই সেই গুরু-ভ্রাতা মনোরমার প্রসাদ খাইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি সকালবেলায় আসিয়া মনোরমাকে অত্যন্ত অনুরোধ করিলেন, যেন, তাঁহার জন্য নিশ্চয়ই প্রসাদ রাখা হয়। মনোরমা কিছুই বলিলেন না; কিন্তু মনে হইল যেন, কিছু চিন্তিত হইলেন। আমিও কোনও কথা বলিলাম না, ভাবিলাম, দেখি তিনি কি করেন।

এই গুরুভ্রাতাটি সংসারের সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঠাকুরের সেবা-কার্য্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। দুই প্রহরের

পরে ঠাকুরের আহারান্তে প্রসাদ পাইয়া তিনি আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু মনোরমা তাঁহার জন্য প্রসাদ রাখেন নাই। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া জেদ করিতে লাগিলেন যে, আগামী কল্য তাঁহার জন্য প্রসাদ রাখিতেই হইবে। মনোরমা কিছুই বলিলেন না। গুরুভ্রাতাটি বলিলেন যে, কাল তিনি আসিবেন, তাঁহাকে যেন নিরাশ হইতে না হয়। মনোরমা যে তাঁহাকে নিজের প্রসাদ দিবেন, আমার সে বিশ্বাস হইল না, তবে তিনি এই নাছোড়বন্দা শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিয়া পার পাইবেন, তাহা দেখিতে আমার কুতূহল জন্মিল। আমি এ বিষয়ে কোন কথাই বলিলাম না। পরের দিন ঘরের সকলের আহারান্তে মনোরমা সমস্ত খাদ্যদ্রব্য একসঙ্গে লইয়া আহার করিতে বসিলেন এবং অন্যান্য দিনের মতনই কিঞ্চিৎ কাল ধ্যানস্থ থাকিয়া উহা নিবেদন করিলেন, তাহার পর প্রত্যেক খাদ্য-বস্তু কিছু কিছু করিয়া একটি পাত্রে উঠাইয়া রাখিয়া তাকের উপর তুলিয়া রাখিয়া আপনি যথারীতি আহার করিলেন। তাঁহার ভোজন-সমাপ্তির অল্পকাল পরেই সেই শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতা আসিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার জন্য কিছু রাখা হইয়াছে কি না? মনোরমা সেই নিবেদিত প্রসাদ দেখাইয়া দিলেন, বন্ধুবর মহানন্দে উহা মস্তকে ঠেকাইয়া আহার করিলেন। ঘটনাটি যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই লিখিলাম। কোনও নীতিপরায়ণ ব্যক্তি যদি এ ক্ষেত্রে সত্য মিথ্যা কিংবা চতুরতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাহার উত্তর আমি দিতে পারিব না। যাঁহাকে সমস্ত জীবনে কেহ কখনও কোনরূপ চতুরতা করিতে দেখে নাই, তিনি কেন যে এরূপ আচরণ করিলেন, তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল,

তাহা বলিতে কি কল্পনা কারতে আমার শক্তি নাই। ভালই হউক আর মন্দই হউক, এ ঘটনাটি না লিখিলে মনোরমার প্রাণের একটি বিশেষ অবস্থা গোপন করা হইত, এই জন্যই লিখিলাম।

বৈদ্যনাথ-যাত্রা

আমাদের বৈদ্যনাথ যাওয়া স্থির হইল। যখন ঢাকায় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচার-ব্রত পরিত্যাগ করিলাম, তখন গুরুদেব আমাদিগকে ভাগলপুর, গয়া, হাজারীবাগ, গিরিডি ও বৈদ্যনাথ প্রভৃতির যে কোন স্থানে থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এই সকল স্থানের মধ্যে সুধু বৈদ্যনাথই বাকী ছিল, এবারে ঘটনাক্রমে সে স্থানে যাওয়া ঘটিল।

খনি হইতে ১২৶ মণ অভ্র আসিয়াছে, ধরিয়া রাখিয়া বিক্রয় করিলে উহার মূল্য প্রায় দুই শত টাকা হইত; কিন্তু আমাদের সে অবসর নাই, আজই রাত্রের ট্রেণে রওয়ানা হইতে হইবে। তখন কলিকাতায় ক্ষেত্রমোহন সুর নামে একজন ভদ্রলোক বিলাতে অভ্র পাঠাইতেন, ১২৶০ মণ অভ্র একটা গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া লইয়া তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। এরূপ গরজী-বিক্রেতার কপালে যাহা থাকে, আমারও তাহাই জুটিল। চাউল-ডাউলের মতন গড়ে প্রতি মণ পাঁচ টাকা হিসাবে ৬০৲ ষাট টাকায় বিক্রয় করিতে হইল। ইহা দ্বারা কলিকাতার বাড়ীর একমাসের ভাড়া এবং বৈদ্যনাথ যাওয়ার ৩য় শ্রেণীর রেলভাড়ার ও গাড়ী ভাড়ার কোনও রূপে সঙ্কুলন হইল। আবার

আমরা শ্রীমান্ রেবতীমোহন প্রভৃতি প্রিয় পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম।

মনোরমার জ্যেঠাই-মা, যিনি কয় বৎসর হইতে মনোরমার গৃহস্থালীর সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া কন্যাকে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন, দেবতা যেন মনোরমার শেষ অবস্থা সাক্ষাতে দেখাইবেন না বলিয়াই জ্যেঠাই-মাকে আমাদের সঙ্গী করিলেন না; যিনি তীর্থ-হীন দূরদেশ হাজারীবাগে কন্যার সঙ্গে যাইতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, তিনি আজি বৈদ্যনাথ-তীর্থে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন না, তিনি মনোরমার ভ্রাতা তারক বাবুর নিকট ফরিদপুরে গেলেন।

শ্রীমান্ বেণীমাধব আগের দিন বৈদ্যনাথে গিয়াছে, সে ঘরবাড়ী পরিষ্কার করাইয়া সকালবেলায় আহারের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবে, যাহাতে বালকবালিকাগণ সেখানে পৌঁছাইয়া ক্ষুধায় ক্লেশ না পায়।

বৈদ্যনাথ

বৈদ্যনাথে মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় আমাদের জন্যএকটি কাঁচা বাংলা ভাড়া করা হইয়াছিল।

সামান্য খড়ের ঘর গোময়-লেপিত,
মাটীর প্রাচীর ঘেরা তৃণ আচ্ছাদিত।

এইরূপ গৃহই আমাদের আদর্শ-বাস-গৃহ ছিল। বৈদ্যনাথে যাইয়া আমাদের প্রাণের আদর্শের অনুরূপ এই বাড়ীটি পাইয়া আমরা

বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। জাঁকজমক ও বড়মানুষী আমাদের স্বভাবের সঙ্গে মিস খাইত না, যখনই কোনও মূল্যবান্ ভবনে বাস করিয়াছি, মাসে মাসে নিয়মিতরূপে ভাড়া দেওয়া হইলেও মনে হইত যেন, সে বাড়ীটার উপর আমাদের কোনও দাবী নাই, আমরা যেন সে বাড়ীর অতিথি। বৈদ্যনাথে মাটীর প্রাচীরে ঘেরা এই ফসের (খড়ের) বাংলাটি পাইয়া মনে হইল যেন, আমরা সত্য সত্যই আমাদের নিজ বাড়ীতে আসিলাম।

এই নূতন বাড়ীতে একটি মধ্যঘর (হলঘর বলিলে কথাটা বড় হইয়া পড়ে) এবং উহার সঙ্গে অন্য চারিটি ঘর ছিল, সে চারিটির একটিকে বৈঠকখানা ও একটিকে ভাঁড়ার ঘর করা হইল। স্বতন্ত্র রান্নাঘর ছিল। ভিতর বাড়ীর প্রাচীরে ঘেরা উঠানটি বেশ বড়। উঠানের মাঝখানে গোলাকার একটি ফুলের বাগান, তাহাতে গেঁদা-ফুলই বেশী ছিল। বাড়ীটির পেছনেই মাঠ, চারিদিকই খোলামেলা।

বাড়ীওয়ালা

সাধু হরলাল রায়

আমাদের বাড়ীওয়ালা মহাশয় কলিকাতার শিক্ষিত লোক-মাত্রেরই পরিচিত এবং শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইনি হিন্দু স্কুলের ভূত-পূর্ব্ব সুবিখ্যাত শিক্ষক টাকী-নিবাসী ৺হরলাল রায়। রায় মহাশয় ছাত্র-বর্গের ও অভিভাবকগণের যেরূপ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা

শিক্ষক-জীবনে অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। শিক্ষা-নিপুণতা ও চরিত্র-মহিমা একসঙ্গে মিলিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি এইরূপে অসামান্য সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুস্তক ও বাঙ্গালা কয়েকখানি নাটক এক সময়ে বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। বঙ্গীয় নাট্য-মন্দিরে তাঁহার "হেমলতা" নাটকের একাধিকবার অভিনয় হইয়াছে। তিনি দয়ালু হইয়াও মিতব্যয়ী ছিলেন, এই গুণেই পুস্তকের আয় হইতে কিছু সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শিক্ষকতা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বৈদ্যনাথে একখানা খড়ের বাংলা করিয়া বাস করেন, সেই বাংলা-খানিই আমরা ভাড়া লইয়াছি। এই সময় এই বাড়ীর সংলগ্ন জমীতে তিনি একখানা পাকা বাড়ী করিয়া সপরিবার বাস করিতেছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র ও কন্যা ছিল।

টাকীর রায় ও মুন্সী উপাধিধারী কুলীন কায়স্থগণ এবং রাজা বসন্ত রায় ও মহারাজা প্রতাপাদিত্য ইঁহারা সকলেই গুহবংশ-সম্ভূত। বঙ্গজ কায়স্থের পক্ষে চন্দ্রদ্বীপ-সমাজই শীর্ষস্থানীয়। ইহারাও পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ-সমাজভুক্ত ছিলেন। আমাদের সঙ্গে বহু পুরুষের ব্যবধান হইলেও জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ নষ্ট হয় নাই। বৈদ্যনাথে রায় মহাশয়ের বাড়ী ভাড়া করিয়া এবং তাঁহার প্রতিবেশী হইয়া বহু পুরুষের ব্যবধান দূর হইয়া গিয়া আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে একটি চমৎকার বান্ধবতার সৃষ্টি হইল। রায় মহাশয় সম্পর্কে (পর্য্যায় হিসাবে) আমার ঠাকুরদাদা হইলেন, সুতরাং তাঁহার পুত্রগণ হইলেন কাকা, কিন্তু হরিজীবন, নীলরতন ও নৃত্যগোপাল প্রভৃতি রায় মহাশয়ের পুত্রগণ উল্টা করিয়া

আমাকেই কাকা বলিতেন এবং আমাদের বাড়ীকে কাকার বাড়ী বলিতেন। রায় মহাশয় এবং তাঁহার পত্নী ও তাঁহাদের পরিজনগণ আমাদিগকে খুব আপনার করিয়া লইলেন। তাঁহাদের বাড়ীতে মনোরমার আদরের অবধি ছিল না, রায় মহাশয়ের পত্নী মনোরমাকে "বউ মা" বলিতেন, খুব ভালবাসিতেন, মনোরমাও তাঁহাদিগকে অত্যন্ত আপনার মনে করিতেন। বলিতে গেলে আমরা উভয় পরিবার পরস্পরের সুখ-দুঃখের ভাগী হইয়াছিলাম।

হরলাল রায় মহাশয়ের দেহত্যাগের পরে আমি "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় "খাঁটি মানুষ" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, সেইরূপ খাঁটি মানুষ আজ কাল অতি বিরল দেখা যায়।

বৈদ্যনাথ-বাস

আমাদের বৈদ্যনাথ-বাস বেশ সুখ-জনক হইয়াছিল। "মাইকেলের জীবন-চরিত" রচয়িতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় তখন দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং ডাক্তার হরিচরণ সেন মহাশয় হাঁসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। পূর্ব্ব হইতে আমার সহিত ইঁহাদের পরিচয় ছিল কিন্তু দেখা ছিল না, সাক্ষাৎমাত্রেই বান্ধবতা জন্মিল। পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর দেওঘর বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, তিনি তখন নিম্ন শ্রেণীতে পড়াইতেন। তাঁহার বেতন ২০৲। ২৫৲ টাকার অধিক ছিল না। সখারাম বাবু আমার পুত্রদিগের প্রাইভেট

টিউটার নিযুক্ত হইলেন। সত্যরঞ্জন, নিত্যরঞ্জন ও চিত্তরঞ্জন স্কুলে পড়িতে লাগিল, যোগীন্দ্র বাবু ও সখারাম বাবু তাহাদিগকে বিশেষ ভালবাসিতেন।

সখারাম বাবু এই সময় মাঝে মাঝে সংবাদ-পত্রে স্থানীয় খবর লিখিয়া পাঠাইতেন, এই জন্য তথাকার স্কুলের সেক্রেটারী মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটের বিষ-নজরে পড়িলেন। এই উপলক্ষেই তাঁহাকে কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বিষ হইতে অমৃতের উৎপত্তি হইল, ম্যাজিষ্ট্রেট এরূপ বিপক্ষতা না করিলে হয় ত তাঁহাকে দেওঘর স্কুলের নিম্নশিক্ষকরূপেই শেষ-জীবন পর্য্যন্ত থাকিতে হইত। বাঙ্গালা সাহিত্যিকরূপে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা এবং স্বদেশীরূপে তাঁহার প্রগাঢ় দেশ-হিতৈষণা প্রকাশ পাইবার সুবিধা পাইত না। পণ্ডিত সখারামকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বলিতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলাম। পরে জানিলাম যে, কর্ম্মাটাঁড়ের নিকটে "কোরো" নামক গ্রামে এই মহারাষ্ট্র-পরিবার তিন পুরুষের অধিককাল বাস করিতেছেন। সখারাম পণ্ডিতের সঙ্গে সেই সময় (ইং ১৮৯৭ সালে) আমার যে আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল, তাঁহার জীবন-কালের শেষভাগ পর্য্যন্ত আমাদের সেই সৌহার্দ্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমাদের বন্ধুত্ব গাঢ়তর হইয়াছিল। তিনি আমার পুত্রগণকে চিরদিনই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। বরিশাল কনফারেন্সের ব্যাপারে (১৩২১ সালে) শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জনকে সখারাম বাবু এমন সহানুভূতি ও স্নেহপূর্ণ একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তাহা পাঠ করিয়া আমরা আনন্দাশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়াছিলাম।

শ্রীমান্ বকুলাল বিশ্বাস বি, এ, তখন দেওঘর স্কুলের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন, এখন তিনি মুন্সেফ কি সবজজ হইয়াছেন। বকুলাল মনোরমাকে মায়ের মতন ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন এবং পরোক্ষে "মা" বলিয়াই সম্ভাষণ করিতেন। বকু আমাদের ঘরের ছেলের মতন হইয়াছিলেন, আমাদের ছেলেদিগকে ভাইয়ের মতনই দেখিতেন।

আর একজন আমাদের ঘরের ছেলে হইয়া গিয়াছিল, আজ তাহার কথা বলিতে যাইয়া মনে কত ভাবের সঞ্চার হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এই বালকের নাম শ্রীমান্ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ডাক নাম "বারীন্"। "বারীনের" নাম এখন বঙ্গদেশের অনেকেই জানে। "বারীন্" সুবিখ্যাত সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার কে, ডি, ঘোষের (কৃষ্ণধন ঘোষের) পুত্র, জ্ঞানবৃদ্ধ ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের দৌহিত্র এবং সুবিখ্যাত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

বারীন্ আমার জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যরঞ্জনের সহপাঠী ছিল, উভয়ের মধ্যে এতই প্রগাঢ় প্রেম জন্মিয়াছিল যে, বারীন্ দিবসের অবসরসময় অধিকাংশকালই আমাদের বাড়ীতে থাকিত। এই বালকের জীবনে মাতৃস্নেহ ভোগ করার সৌভাগ্য কখনও ঘটে নাই, তাই তাহার পিপাসু হৃদয় মাতা অন্বেষণ করিতেছিল, এই সময় মনোরমার সাক্ষাৎ পাইয়া সে অসঙ্কোচে আমাদের ঘরের ছেলে হইয়া গেল।

বারীন্‌কে শিশুকালে খুলনায় তাঁহার পিতার নিকট একবার দেখিয়াছিলাম, তখনকার সাজসজ্জা ছিল হ্যাট, কোট, নেকটাই ও বুটপরা ফিরিঙ্গি শিশু, আর দেওঘরে দেখিলাম খালি পা, খালি গা, ধুতী-পরা গ্রাম্য বালক। এই বাল্য-জীবনেই এতটা পরিবর্ত্তন কেন

ঘটিল, তাহা ভাবিয়া আমি বিস্ময়ান্বিত হইতাম। সত্যরঞ্জন ও বারীন্ উভয়েই তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িত, উভয়ই বিদ্যাসিতাহীন, সরল ও সদয়-হৃদয় ছিল, দু'জনার গলায় গলায় ভাব ছিল। দৈব-দোষে রাজদণ্ডে বারীন্ যখন দ্বীপান্তর-দণ্ড প্রাপ্ত হইল, তখন সত্যরঞ্জন তাহার বাল্য-বন্ধুর জন্য শোকাকুল হইয়াছিল। বারীনের বাল্য-জীবন দেখিয়া কেহই তাহার ভবিষ্যৎ-জীবন কল্পনা করিতে পারে নাই। আজ বারীন্দ্রকুমার দ্বীপান্তরে, তাহার বন্ধু সত্যরঞ্জন লোকান্তরে।

দেওঘরে ৬।৭ মাস বাসের পরে আমরা কোনও বিশেষ কারণে বাসা পরিবর্ত্তন করিয়া স্কুলের নিকট বাড়ী ভাড়া করিলাম। যত দিন আমি সহরে উপস্থিত থাকিতাম, প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা স্কুলের মাঠে যোগীন্দ্র বাবুর বাড়ীর সম্মুখে আমরা বন্ধুবর্গ মিলিত হইতাম। যোগীন্দ্র বাবু, হরিচরণ বাবু এবং আমি নিয়মিতরূপেই এই ক্ষুদ্র সভায় উপস্থিত থাকিতাম, নানা প্রকারের আলোচনা ও গল্পাদিতে আনন্দে সময় অতিবাহিত হইত। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সখানাথ বসু মহাশয়ের সঙ্গেও আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমাদের এই ক্ষুদ্র সান্ধ্য-সমিতিতে অনেকে আসিয়া যোগ দিতেন।

৺রাজনারায়ণ বসু

যে দিন শ্রদ্ধাস্পদ ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইল, সে দিন দুই একটি কথার পরেই বসু মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে আমার মত কি? তখনও

আমার মন এ বিষয়ে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয় নাই, তবে জন্মান্তর-বিশ্বাসের দিকেই মনের গতি হইয়াছিল, আমি তাঁহাকে এই কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন যে, যাহার দার্শনিক জ্ঞান আছে, সে ব্যক্তি যে কেমন করিয়া জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করে না, ইহা তিনি বুঝিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে তিনি আরও বলিলেন যে, প্রেতাত্মগণ পূর্ব্ব-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া পার্থিব বস্তুর জন্য প্রলুব্ধ হইতে পারে এবং সেই বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন। এমন কি, তিনি ইহাও জানিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার পিতৃদেবই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র (৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু) রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

বসু মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। সকাল ৮টা হইতে বেলা ১টা অবধি তিনি অবিশ্রাম নানা কথা বলিয়াছিলেন। এই সকল কথোপকথনের মধ্য হইতে কোন কোন অংশ সংক্ষেপে লিখিয়া "দেবগৃহে কথোপকথন" নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ নব্য-ভারতে প্রকাশিত করিয়াছিলাম। বসু মহাশয়ের জীবিতকালেই উহা মুদ্রিত হইয়াছিল, তিনি নিজে সেই পত্রে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, এই সকল কথোপকথন যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা নির্ভুল। তাঁহার পিতৃদেব যে তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শুধু এই কথাটি আমার প্রবন্ধ হইতে তিনি বাদ দিয়াছিলেন, একান্ত গোপনীয় কথা বলিয়াই তিনি ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে চাহেন নাই।

তপোবন

মনোরমাকে লইয়া একদিন "নন্দনপাহাড়ে" ও একদিন "তপোবনে" বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তৃণ-তরু-লতা-শূন্য নন্দনপাহাড়ে বেড়াইয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। তপোবনে তখন ব্রহ্মচারী বালানন্দজী থাকিতেন। তাঁহার আশ্রমটি অতি সুন্দর। একখানি প্রকাণ্ড পাথর কাটিয়া একটি গোফা প্রস্তুত করা হইয়াছে, ব্রহ্মচারী মহাশয় দিবসে এই গোফাতে বাস করেন। এইরূপ আশ্রম ও ধূনী, চিম্‌টা বিভূতি এবং কম্বল, কৌপীন, বহির্ব্বাস প্রভৃতি আস্‌বাব ও সজ্জা দেখিয়া রাজ-প্রাসাদ ও রাজ-সজ্জাকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। ত্যাগের মধ্যে যেরূপ বৈভব ফুটিয়া উঠে, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সেরূপ প্রভাব কোথাও দেখা যায় না। ত্যাগই ভারতীয় সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, তাই উহা আমাদের রক্ত-মাংসের সহিত এমনভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে যে, নিজেরা ত্যাগী হইতে না পারিলেও ত্যাগের নিকট আপনি আমাদের মস্তক নত হইয়া পড়ে। যাহারা ত্যাগী নহে, তাহারা কিছুতেই আমাদের সমাজ হৃদয়ের রাজা হইতে পারিবে না।

বালানন্দ ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া আমরা উপরের পাহাড় ও গহ্বরগুলি দেখিতে গেলাম, সে সকল দৃশ্য অতি মনোহর। একটি গহ্বরে আমরা নিবিষ্টমনে বসিয়া কিছুক্ষণ নাম করিলাম। মনোরমার ভাব দেখিয়া মনে হইল যে, তাঁহার সেখানে অধিকক্ষণ বসিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ছোট ছোট বালক-বালিকাগণ সঙ্গে থাকায় আমরা

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। এইরূপ যে যে স্থানে মনোরমাকে সঙ্গে করিয়া গিয়াছি, সর্ব্বত্রই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তাঁহার বিহনে এখন সেই সকল স্থানই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মিত্র-বিলাপের একটি কবিতা সর্ব্বদা মনে পড়ে ঃ—

"প্রকৃতি পূর্ব্বের মত একভাব আছে,
চন্দ্র তারা দিনকরে, তিমির বিনাশ করে,
শীতল সমীর বয়, ফুল ধরে গাছে—
মিত্র বিনা কেবল আমার
ভাল কিছু নাহি লাগে আর,
সব বিষময় বোধ হয় মম কাছে।"

পরিজন

বৈদ্যনাথে আমাদের বাড়ীতে মথুরানাথ গুহ ঠাকুরতা, সুখময় রায়, বিহারীলাল রায় প্রভৃতি কয়েকটি আত্মীয়-স্বজন থাকিতেন। মুঙ্গের চাকাই-নিবাসী অমর দোবে পাচক এবং বৈদ্যনাথ-নিবাসী লালু রাউৎ চাকর ছিল। লালু খুব বাধ্য ও কাজের লোক ছিল, সে মাঝে মাঝে দুই একটা শাস্ত্রকথা আওড়াইত। মনোরমা স্নেহ করিয়া তাহাকে "লালু পণ্ডিত" বলিতেন। একটি দাই অত্যন্ত কুরূপা ছিল, তাহাতে একটি চক্ষু নষ্ট হওয়ায় তাহাকে বিকট দেখাইত, সে আমাদের ছোট

মেয়েটিকে রাখিত। তাহাকে দেখিলেই মেয়েটি মায়ের কোল হইতে ঝাঁপ দিয়া তাহার কোলে পড়িত। একদিন কে বলিল যে, দাসীটির চেহারা অতি অপূর্ব্ব! মনোরমা বলিলেন,—"চেহারা দেখিলে কি হয়, গুণ আছে,—মেয়েটিকে ভালবাসে।"

চাকর-চাকরাণী, পাচক এবং আত্মীয়গণ—সকলেই মনোরমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সর্ব্বদা উৎসাহী ছিল। যে জন্য মনোরমাকে লোকেরা ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত, পাচক ও চাকর-চাকরাণীরা সে সকলের কোন খবরই রাখিত না; কিন্তু তাহারা মাইজীর ব্যবহারের মধ্যে এমন কিছু দেখিয়াছিল, যাহাতে সত্যই তাঁহাকে মাইজী বলিয়া মনে করিত। মনোরমা যদি কোন একটা জিনিস আনিতে বলিতেন, তবে কে উহা আনিবে, উহা লইয়া ব্যস্ততা হইত। তিনি সহজে কাহাকেও কোনও ফরমায়েস্ করিতেন না, কিন্তু সকলেই তাঁহার আদেশের আকাঙ্ক্ষা করিত। কাজেই সংসারে কোনও বিশৃঙ্খলা ছিল না।

আমি ভাবিতাম, মনোরমা কি গুণে আমার অপেক্ষা এই সকল অশিক্ষিত পরিজনগণের বেশী প্রিয় হইলেন? আমিও ত লোকজনকে বেশ ভালবাসি, পরিজনগণের প্রতি আমিও নির্দ্দয় নহি, কিন্তু তাহারা যেরূপ মনোরমার আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, আমার আদেশের জন্য ত সেরূপ করে না? কর্ত্তব্য বলিয়া তাহারা আমাদের আদেশ পালন করে, সেবার ভাবে করে না, ইহার কারণ কি? তাঁহার ধর্ম্মভাবের খবর ত তাহারা মোটেই রাখে না, তবে কেন এরূপ হয়? অনেক পরিবারেই দেখি যে, কর্ত্তাকেই

দাস-দাসীগণ বেশী মান্য করে, গৃহিণীদের প্রতি অনেক সময় বিরক্ত হয়, আমাদের দাসদাসীরা মায়ের প্রসন্নমূর্ত্তিই দেখিতে চায়, আমাদের সঙ্গে যেন মায়ের সম্বন্ধে সম্বন্ধ। মনোরমা শিশু-সন্তানদিগকে সকাল-বেলা জলযোগ করিতে দিয়াই চাকর-চাকরাণী ও পাচকের জল-খাবার দিতেন। কখনও এটা সেটা কর বলিয়া তাহাদিগকে ব্যস্ত করিতেন না। এ জন্মে কোথাও কখনও দাসদাসী কি পাচক-পাচিকাকে কড়া কথা বলেন নাই, বলিতেও হয় নাই। আমরা যেমন কখনও লোকজনদিগকে আদর দিয়া মাথায় তুলি, আবার কখনও তিরস্কার করি, তিনি সেরূপ আদর ও তিরস্কার করিতেন না। তাঁহার স্নেহটুকু যে খাঁটি, লোকেরা সহজেই তাহা বুঝিতে পারিত। আমরা যখনই যে দেশে গিয়াছি, সে স্থান পরিত্যাগ করিবার সময় চাকর-চাকরাণীরা কাঁদে নাই, এমন ঘটনা কখনও ঘটে নাই। এখন কেউ কাঁদে না।

মনোরমা চাকর-চাকরাণীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন, সে বিষয়ে একদিনের একটি ঘটনা বলিতেছি।

সোমরা-নিবাসী (বর্ত্তমানে ১০১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটবাসী), শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় (ডাকনাম অভয় বাবু) বৈদ্যনাথে ছিলেন। ইনি আমাদের বিশেষ বন্ধু। আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁহাদের পরিবারের অতিশয় আত্মীয়তা। তিনি একদিন আমাদের বাড়ী গিয়াছেন, আমি অন্যদিক্ দিয়া তাঁহাদের বাসায় গিয়াছি; তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, আমি ততক্ষণ তাঁহার প্রতীক্ষায় তাঁহাদের বাসায় বসিয়াছিলাম। অভয়বাবু তাঁহাদের ভগিনী প্রভৃতির

নিকট আমার সাক্ষাতেই বলিলেন যে, আমাদের বাড়ী গিয়া তিনি একটি ঘটনা দেখিয়াছেন। আমরা শুনিতে উৎসুক হইলে তিনি বলিলেন যে, "আপনাদের দাই একটা বড় বাটিতে করিয়া এক বাটি গরম দুধ (২।৩ সের হইবে) একখানা থালার উপরে লইয়া যথাস্থানে রাখিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার হাত হইতে থালাখানি পড়িয়া গিয়া সমস্ত দুধটা নষ্ট হইল। সেই দুধই দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের সমস্ত দিনের অবলম্বন। থালাখানা পড়ামাত্রই মনোরমা ব্যস্ত হইয়া দেখিলেন যে, দাইয়ের পায়ে গরম দুধ পড়িয়াছে কি না। তাহাকে নিরাপদ্ দেখিলেন এবং বলিলেন যে, 'তোমার দোষ কি? তুমি ত আর ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া দাও নাই'!" অভয় বাবু বলিলেন যে, সমস্ত দিনের শিশুদিগের খাদ্য দুধ পড়িয়া যাওয়াতে তিনি একবার "আহা" বা "কি করিলে" কিছুই বলিলেন না। পাছে দাই মনে মনে ক্লেশ পায়, এই আশঙ্কায় তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে সান্ত্বনা দিলেন। কিছুমাত্র চিন্তা বা বিচার করিয়া এ কাজ করার অবসর ছিল না, যাই থালাখানা পড়িল, সমস্ত দুধ ছড়াইয়া পড়িল, তৎক্ষণাৎ দুধ পড়ার অনিষ্ট বা অসুবিধার দিকে তাঁহার মন গেল না, দাই যে মনে দুঃখ পাইবে, এই চিন্তাই সর্ব্বাগ্রে জাগিল। যদিও ঘটনাটি ক্ষুদ্র, তথাপি বন্ধুবর ইহা দেখিয়া বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ মনোরমা চাকর-চাকরাণীদিগকে কখনও হীনভাবে দেখেন নাই, স্নেহের চক্ষেই দেখিয়াছেন। অথচ এই সকল চাকর চাকরাণীরা বেশী দিনের লোক নয়।

বৈদ্যনাথ-বাসের কিছু দিনের মধ্যেই মনোরমার স্বভাবে একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিল, সংসার হইতে একটু বেশী আল্‌গা হইয়া

পড়িলেন। এই সময় আমাদের আত্মীয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয় সপরিবার আমাদের বাড়ীতে আসিলেন, সেই সঙ্গে পরম প্রীতিভাজন রেবতীমোহনও আসিলেন। উমেশ বাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সরলা আমার জ্ঞাতিকন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্রী। একদিন সরলা বলিলেন যে, খুড়ীমা (মনোরমা) বোধ হয় সংসারের ভার আর রাখিতে চাহিতেছেন না। আট বৎসরের কন্যার হাতে ভাঁড়ার ঘরের বন্দোবস্ত দিয়াছেন। সকলে মন্দির দর্শন করিতে যাইবেন, মনোরমা গেলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'আমার তেমন টান হইতেছে না।' শ্রীমান্ রেবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখন ধ্যানে বসেন না কেন?" মনোরমা বলিলেন, "না বসিলেও ক্ষতি হয় না।" বস্তুতঃ এ সময় সহজ অবস্থাতেই তিনি নামানন্দে অভিভূত থাকিতেন। সব্‌জজ ৺বেণীমাধব মিত্র মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী, ৺শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া কখনও কখনও মনোরমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন; কিন্তু তিনি বেশীক্ষণ বাহিরে থাকিতেন না। কোথাও বসিয়া গল্পগুজব করা কি শুনা, তাঁহার অভ্যাস ছিল না। অথচ তিনি অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিতেন না। তাঁহার চরিত্রের অকৃত্রিমতা ও নম্রতা সকলের নিকটই তাঁহাকে প্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল।

বৈদ্যনাথে আমাদের গুরুভ্রাতা ৺মহাবিষ্ণুযতী মহাশয় থাকিতেন। তিনি স্কুলসমূহের সব্‌ইনস্পেক্টর ছিলেন। মহাবিষ্ণু বাবু যখন ভক্তি-ভরে সুমিষ্টস্বরে পদাবলী গান করিতেন, তখন নিজে যেমন চক্ষের জলে ভাসিতেন, অন্যকেও ভাসাইতেন। পদাবলী যে প্রেমিকের প্রাণের

গুপ্তকথা, সেই গুপ্তকথা যে দরদী ব্যক্তিকে কেমন করিয়া বলিতে হয়, কিরূপ সুরে ও স্বরে সে কাহিনী দীর্ঘনিশ্বাস ও নয়নজলের সহিত কখন ছোট ছোট করিয়া, কখনও আকুল হইয়া গাহিতে হয়, মহাবিষ্ণু বাবু তাহা জানিতেন। "প্রেমকো অঙ্কুর আত যাত ভেল" নর্ম্ম-সখীদিগের প্রতি শ্রীমতীর প্রাণের এই গুপ্তকথা মহাবিষ্ণু বাবুর নিকট যে শুনিয়াছি, তাহা আজিও প্রাণে লাগিয়া আছে।

মহাবিষ্ণু বাবু সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিতেও পারিতেন। তাঁহার রচিত—

"অপরূপ শ্রীগুরুরূপ হৃদয়ে সদা ভাব না রে,
ভবন বন সমান হবে শমনভয় আর রবে না রে।" ইত্যাদি।

এই সঙ্গীতটি গুরুভক্তদিগের, বিশেষতঃ আমাদের গুরু-ভ্রাতাদিগের হৃদয়ে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

মহাবিষ্ণু বাবু যখন বৈদ্যনাথ হইতে বদলী হইয়া অন্যত্র গেলেন, তখন তাঁহার একটি ঘোড়া, একটি চাকরাণী ও প্রতাপসিং নামক একজন রাজপুত চাপরাশী আমাকে দিয়া গেলেন। আমি ঘোড়ার মূল্য দিলাম এবং চাকরাণী ও চাপরাশীদিগকে কাজে লাগাইলাম। চাকরাণীটি বাড়ীতে রহিল, ঘোড়া ও চাপরাশীকে আমার খনিতে পাঠাইলাম। মনোরমার দেহত্যাগের পরে চাকরাণী চলিয়া গেল। ঘোড়াটি ৫।৬ বৎসর কাজে লাগিয়াছিল, বৃদ্ধ হইলে এক লক্ষ্মীমন্ত গৃহস্থকে দান করিলাম, তাঁহার ঘরে ঘোড়ার খাদ্য অনেক বস্তু জন্মিত, সে ঘরে বৃদ্ধকালে ঘোড়াটি সুখে থাকিবে এবং একটি শিশুকে কখন কখন পৃষ্ঠে বহন করা ভিন্ন আর কোনও কাজ করিতে হইবে

না, ইহা জানিয়াই সেই গৃহস্থকে দান করিয়াছিলাম। চাপরাশী প্রতাপসিং বহুকাল আমাদের কার্য্য করিয়াছে, এখনও আমাদের অনুগত আছে।

বিপদের সূত্রপাত

পাগ্‌লী।

ময়মনসিং জেলা-বাসিনী একটি স্ত্রীলোক দেওঘরে ভিক্ষা করিয়া খাইত, সে সম্পূর্ণ পাগল না হইলেও তাহার পাগলামীর ছিট্ ছিল। একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি কোথায় এই রৌদ্রে ভিক্ষা মাগিয়া ঘুরিবে, আমাদের বাড়ীতেই রোজ খাইও। সেই দিন হইতে সে তাহাই করিতে লাগিল। আমরা সকলেই পাগ্‌লীকে যত্ন করিয়া খাওয়াইতাম। কিছু দিন পরে পাগ্‌লী আমাদের একখানি কাপড় চুরি করিল। সে এরূপ পাগল নয় যে, এই কার্য্যের ভালমন্দ বুঝিতে পারে না। এই ঘটনায় আমার অত্যন্ত রাগ হইল। যাহাকে এমন আদর করিয়া আশ্রয় দিয়াছি, তাহার এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা আমার সহ্য হইল না। তাহার চুরি প্রমাণিত হইল, তখন যদি সে সরলভাবে দোষ স্বীকার করে অথবা চুপ করিয়া থাকে, তবে সব মিটিয়া যায়, কিন্তু নানা প্রকারের কথা বলিয়া সে যখন আমাকে ছলনা করিতে চেষ্টা করিল, তখন আমি ক্রোধান্ধ হইলাম। একটা ভেরেণ্ডা-গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া হাতে লইলাম এবং বলিলাম যে, যদি আবার মিথ্যাকথা বল, তবে

নিশ্চয় তোমাকে মারিব। সে আবার জেদ করিয়া মিথ্যা বলিল, তখন বিবেচনাশক্তিরহিত হইয়া, সংযম হারাইয়া, আমি আমার হাতের সেই ছড়ীটা দিয়া সত্যসত্যই তাহাকে দুই তিন ঘা মারিলাম। তখন সেই স্ত্রীলোকটি এতই জোরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল যে, তাহা শুনিলে কেহ মনে করিতে পারিত যে, আমি তাহাকে মারিয়া খুন করিয়াছি। তাহার এই অস্বাভাবিক চীৎকার ও ক্রন্দন শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম, তখন সে এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল যে, "আমাকে যেমন কাঁদালি, তোকেও এমনই কাঁদিতে হবে।" অকস্মাৎ বজ্রপাতের ন্যায় এই অভিসম্পাতে দুর্-দুর্ করিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। আমার এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব ভাবিয়া পরের দিন হইতে পাগ্‌লীকে কতই খুঁজিলাম, আর তাহার দেখা পাইলাম না; সে সহর ছাড়িয়া কোথায় গেল, বুঝিতে পারিলাম না। তাহার সেই অভিসম্পাত আমার বুকে জীবন্ত হইয়া জাগিয়া রহিল—"আমাকে যেমন কাঁদালি, তোকেও তেমনি কাঁদ্‌তে হবে" ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই কথা আমার কানে ও প্রাণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় অপরাধ

গুটীপোকা

উপরি-উক্ত ঘটনার কিছু দিন পরে আমি গরুর গাড়ীতে আমার খনি হইতে দেওঘর আসিতেছিলাম। দেওঘরের ৫।৬ মাইলের মধ্যে

"কইরিডি" নামে একটি গ্রাম আছে, সেই গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ জমিদার মিঃ গ্রাণ্ড সাহেবের জমিদারী কাছারী, বাবু বঙ্কুবিহারী দত্ত নামক একটি বাঙ্গালী যুবক সেই কাছারীর তহশীলদার ছিলেন। তাঁহার অনুরোধে সেখানে আহারাদি করিয়া রাত্রিশেষে দেওঘর রওনা হইলাম। কইরিডি গ্রামে তসরের চাষ আছে, "আসন" নামক বৃক্ষে রেসম-পোকা জন্মিয়া থাকে। সে সময় অনেক পোকা গুটী কাটিয়া প্রজাপতি হইয়া বাহির হইয়াছে, একটি প্রজাপতি আমার গাড়ীর ছাপ্পরে উড়িয়া আসিয়া বসিয়াছিল। সেটিকে ধরিয়া আমি সঙ্গে লইলাম। দেওঘরে পৌঁছিয়া পরের দিন আমি উহাকে একগাছি সূতো দিয়া একটা গেঁদা ফুলের গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিলাম, প্রজাপতিটি গেঁদা ফুলের পাতা খাইতেছিল। কিন্তু সেই দিনই দেখা গেল যে, আর একটি প্রজাপতি কোথা হইতে আসিয়া উহার সহিত যোগ দিয়াছে। আমরা আশ্চর্য্যন্বিত হইলাম, কেন না, দেওঘরের ২।৩ মাইলের মধ্যে কোথাও এইরূপ প্রজাপতি দেখা যায় না। আমি রাত্রিকালে ৬ মাইল দূর হইতে একটিকে আনিয়াছি, অপরটি ইহার খোঁজ কিরূপে পাইল? একেবারে আমার বাড়ীতে আসিয়া ঠিক ঠিক কেমন করিয়া আপনার সহচরীকে চিনিয়া লইল? কেহ কেহ বলিলেন যে. উহাদের একটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিলে উহার জোড়াটি যেমন করিয়া হউক এবং যত দূরেই হউক, আপনার সঙ্গীর সঙ্গে মিলিবেই মিলিবে। ইঁহাদের উক্তি ঠিক কি না, জানি না, তবে ঘটনাটি দেখিয়া সত্যই অবাক্ হইয়াছিলাম। ঝিঁঝিঁ পোকারা উচ্চরবে ডাকিয়া ডাকিয়া তাহাদিগের সঙ্গীদিগকে একত্র করে,

উচ্চ রব শুনিয়া সকলে একস্থানে আসিয়া জুটে ; কিন্তু এই প্রজাপতির মুখে কোন শব্দ নাই, অথচ কিরূপে যে সঙ্গীটি ঠিক ঠিক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, জানি না। জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিতে পারেন, সে কথার আমার প্রয়োজন নাই। আমি কি জন্য এই ঘটনা লিখিতেছি, নিম্নে তাহা নিবেদন করিতেছি।

পরের দিন প্রজাপতি দুইটিকে আমি আমাদের বাসাবাড়ীর একটা কুলগাছে বাঁধিয়া দিলাম। আমি জানিতাম যে, উহারা কুল-পাতা খাইতে ভালবাসে এবং কুলগাছে উহাদের রেসম-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। দুইটিকে বাঁধিয়াদিলাম, এ কথাটা ঠিক নহে, একটিকে বাঁধিয়াছিলাম, অপরটি উহার সঙ্গী হইয়া কুলগাছে গিয়া বসিল। দুই জন আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইল এবং প্রতিদিন কতক-গুলি করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্ব প্রসব করিতে লাগিল। এইরূপে বোধ হয়, মনের সুখেই তাহাদের দিন কাটিতেছিল। একদিন আমার মাথায় দুর্ব্বুদ্ধি প্রবেশ লাভ করিল, আমি উহাদের পরস্পরের প্রতি প্রেমাকর্ষণের পরিমাণ পরীক্ষা করার জন্য নিজের হাতে ধরিয়া একটি হইতে অন্যটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল যে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে পুনরায় তাহারা পরস্পর মিলিত হইবে। একজনকে ফেলিয়া অন্যজন চলিয়া যইেতে পারিবে না কিন্তু আমার হস্তচ্যুত হইয়াই দ্বিতীয় প্রজাপতিটি উধাও হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল, ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া আমার বুক কাঁপিতে লাগিল। কি করিয়া উহাকে ধরিয়া আনিব, তাহার কোন উপায় না পাইয়া আমি সজল-নয়নে আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিলাম ; কিন্তু সে

আর ফিরিল না, উড়িতে উড়িতে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি বিষণ্ণ হইয়া সেই কুল-তলায় বসিয়া রহিলাম, মনোরমাকে এ কথা বলিতে আমার সাহস হইল না। এই বিচ্ছেদের পর হইতে স্ত্রী-প্রজাপতিটি আর আহার মুখে লইল না, আমি অনেক করিয়া দেখিলাম—সকলই বৃথা হইল—দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিবসে সে শুকাইয়া মরিয়া গেল। এই ঘটনাটিও পাগ্‌লীর অভিসম্পাতের মতন আমার হৃদয়কে বিষাদ-মলিন করিয়া তুলিল। আমি কেন খামখেয়ালী করিয়া এমন দাম্পত্য-বিচ্ছেদ ঘটাইলাম? জগৎ-পিতার চক্ষে পাগ্‌লী এবং প্রজাপতি কি আমার অপেক্ষা অনাদরে বস্তু? এই সকল ঘটনা যেন আমাকে অন্ধকারে চাপিয়া ধরিতেছিল। আমি সহজভাবে নিশ্বাস ফেলিতে পারিতেছিলাম না। এ দিকে মনোরমা দিন দিনই সংসার হইতে আল্‌গা দিয়াছেন; তাঁহার চলন, বলন, ভাব, গতি সকলই একেবারে আল্‌গা হইয়া গিয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিয়া এবং পাগ্‌লীর ক্রন্দনযুক্ত অভিসম্পাত এবং প্রজাপতির নীরব অভিসম্পাত মনে করিয়া আমি শান্তিহারা হইয়া উঠিলাম। লোকের সঙ্গে বাহিরে গল্প-গুজব ও আমোদ-প্রমোদ করিতাম বটে, কিন্তু একটি জাগ্রত-ভীতি আমার হৃদয়ে স্থায়ী আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়াছিল। মনোরমাকে হারাইব, ইহা ভাবিতে কখনও ইচ্ছা হয় নাই। কিন্তু একটা অনিশ্চিত বিপদের ছায়া কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষ

বাঙ্গালা ১৩০৪ সন (ইং ১৮৯৭) ভীষণ ভূমিকম্পে বঙ্গদেশ ও আসামে হাহাকার রব উঠিয়াছিল। দেশবাসিগণ সকলে আহার-বিহার ও আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত আছে, এমন সময় পলকে প্রলয় ঘটিল। মনে হয় যেন, ধরিত্রী-মাতা নিদ্রাবেশে হঠাৎ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বক্ষঃস্থিত শত শত সৌধমালা সন্তানগণ সহ মায়ের বুক হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তমধ্যে প্রাসাদবাসী ধনিগণ ধূল্যবলুণ্ঠিত হইলেন। সেই বিপ্লবে রংপুরের মহারাজা গোবিন্দলাল, সুসঙ্গের যুবরাজ জং বাহাদুর প্রভৃতির ন্যায় সম্ভ্রান্তগণ আপনাদের প্রাসাদতলে নিষ্পেষিত হইলেন। কত বাড়ী পড়িল, কত লোক মরিল, তাহার সংখ্যা নাই। সেই দিন হইতে মহারাণী স্বর্ণময়ী, মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, আজিমগঞ্জের ধন-কুবেরগণ এবং এইরূপ শত শত ধনি-ব্যক্তি আপনাদের রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। প্রাণের দায়ে ধনিগণ দরিদ্র সাজিতে বাধ্য হইলেন। সেই দেব-রোষ দরিদ্রগণকে উপেক্ষা করিয়া ধনীদিগের উপরই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দেবতা যেন ধনিগণের দ্বারদেশে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিয়া দিলেন,—"এইসা দিন নেহি রহেগা।"

বৈদ্যনাথে এই ভূমিকম্পের বেগ বাঙ্গালা দেশের মতন প্রলয়ঙ্কর হয় নাই। তথাপি সকলেই প্রাণ-সঙ্কট অনুভব করিয়াছিল। এই

সময় আমি মফস্বলে একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর কয়েকটি কুলী লইয়া নূতন খনি অন্বেষণ করিতেছিলাম, হঠাৎ পাহাড়টা নাচিয়া উঠিল, মনে হইল যেন, পদতল হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতেছেন। সে কম্পন এক মিনিটের অধিককাল ছিল না। বৈদ্যনাথে শ্রীমান্ রেবতীমোহন তখন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। আমি মফস্বল হইতে আসিয়া শুনিলাম যে, মনোরমা এই দুর্যোগের সময় সন্তানগুলি লইয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ঘরের বাহির হইয়াছিলেন। রেবতী বলিলেন যে, মনোরমার এরূপ ব্যস্ততা তাঁহারা আর কখনও দেখেন নাই। আমার মনে হয়, এই সময় হইতে মনোরমার মনে কোন ভাবী বিপদের ছায়া পড়িয়াছিল।

ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল। এই দুর্ভিক্ষের সময় মনোরমা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। যে সকল ভিখারী আসিত, তিনি ভাণ্ডার শূন্য করিয়া সমস্ত লোককে ভিক্ষা দিতেন। চাকর লালুয়া বলিত, "মা, আজ দুই কুড়ি।" অর্থাৎ দুই কুড়ি লোক ভিক্ষা চাহিতেছে। মনোরমা ঘরের সঞ্চিত সমস্ত চাউল দিয়া দিতেন, পরে চাউল আনিয়া আমাদের জন্য রান্না করিতে হইত। বৈদ্যনাথে ভিখারীর অন্ত নাই। কোন বাড়ীতে ভিক্ষা পাইলে তাহারা দলে দলে আসিতে থাকে। "মাইজী, মাইজী" বলিয়া তাহারা দিনের পর দিন ক্রমশঃ দলবৃদ্ধি করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ভিখারীর সংখ্যা আট কুড়ি দশ কুড়ি হইল। আমাদের অবস্থা এমন নহে যে, প্রতিদিন এত ভিক্ষা দিতে পারি। আমি এক-দিন বলিলাম যে, এ ভাবে কিরূপে চলিবে? মনোরমা বলিলেন যে,

“আমরা যত দিন খাইব, ইহারাও খাইবে।” আমি বলিলাম, “আমরাই বা কোথা হইতে খাইব?” আমার কথায় মনোরমা আমার প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া ছল-ছল-চক্ষে বলিলেন যে, “আমি কি করিব? আমি ইহা সহ্য করিতে পারিতেছি না, এমন দেশে আমাকে আনিলে কেন? আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।” তাঁহার করুণ-বাক্যে আমার মন অবসন্ন হইয়া পড়িল। খনির কাজের জন্য যাহা কিছু হাতে ছিল, এই ভাবে সমস্ত ব্যয়িত হইতে লাগিল।

কয়েকটি স্ত্রীলোকের কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিল, অনাহারে অভাগিনীদিগের স্তনে দুগ্ধ ছিল না। মনোরমা রাত্রি থাকিতে উঠিয়া সেই শিশুগুলির জন্য যাউভাত করিয়া রাখিতেন। এত ভোরে উঠিয়া এরূপ কার্য্য তিনি সন্তানদিগের জন্যও কখন করেন নাই; তাঁহার এত ব্যস্ততা কখনও কোন কার্য্যে লক্ষিত হয় নাই। কখন কখন চাউলের পরিবর্ত্তে ভিখারীদিগকে ছোলা বিতরণ করা হইত, ছোলা ভিজাইয়া রাখা হইত। যে সকল দন্তহীন বৃদ্ধ ছোলা চিবাইতে পারিবে না, তাহাদের জন্য কুর্ত্তির ছাতু প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই দুঃখীদিগের জন্য মনোরমা যেন পাগলিনী হইয়া গিয়াছিলেন।

দুর্ভিক্ষ দিন দিন বাড়িতে লাগিল; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তখনও দুর্ভিক্ষ স্বীকার করেন নাই। একদিন আমি জল-সায়রের পথে দেখিতে পাইলাম যে, সুমলিন জীর্ণবাস কোমরে জড়াইয়া একটি স্ত্রীলোক জল-সায়রের দিকে চলিয়াছে। তাহার রুক্ষ কেশগুলি বাতাসে উড়িয়া মাথাটাকে প্রকাণ্ড দেখাইতেছে এবং গাত্র হইতে উৎকট দুর্গন্ধ বাহির হইয়াছে। অভাগিনীর কাধের উপর একটি মৃতশিশুর মুণ্ডটি

ঝুলিতেছে। সে আর চলিতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মায়ের স্তন্যহীন-বক্ষ চুষিয়া চুষিয়া শিশুটি রাত্রিতে ভবযন্ত্রণা সাঙ্গ করিয়াছে; পুলিস আসিয়া তাড়না করায় অভাগিনী মৃত-পুত্র স্কন্ধে লইয়া, তাহাকে কোথায় ফেলিবে, সেই চেষ্টায় চলিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া মনে হইল, দয়ামায়া যেন এ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভয়ে মনোরমাকে আমি এই দৃশ্যের কথা বলিলাম না; কিন্তু অনেক ভদ্রলোককে বলিলাম। ইহার পর হেডমাষ্টার যোগীন্দ্র বাবু প্রভৃতি, গভর্ণমেণ্ট যাহাতে অন্নসত্র খোলেন, এই জন্য আন্দোলন করিতে লাগিলেন। যখন কয়েকজন লোক সত্য সত্যই অনাহারে মরিল বা মৃতপ্রায় হইল, তখন গভর্ণমেণ্ট অন্নসত্র খুলিলেন। অনেক ভদ্রলোক, এই সময় নানাপ্রকারে অন্নদানের সাহায্য ও সুব্যবস্থা করিলেন। ভদ্রলোকেরাই পরিবেশন ও পরিদর্শন করিতেন।

অন্নসত্র খোলা হইল বটে, কিন্তু অনেক ভিখারী আমাদের বাড়ী পরিত্যাগ করিল না, মনোরমাও কখনও ইহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। আমাদের বাড়ীর সঙ্গে একটি বিস্তৃত স্থান ছিল। ইহারা অনেক সময়ই সে স্থান ঘিরিয়া থাকিত। অনেকে মনে করেন যে, ইহাদিগের দ্বারাই আমাদের বাড়ীতে বিষম রোগ প্রবেশ লাভ করিল। আমরা সে কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। আমাদের বাড়ী অন্য কোন বাড়ী অপেক্ষা অপরিষ্কার রাখা হইত না।

শেষ অধ্যায়

এইবারে আমাদের দাম্পত্য-জীবনের শেষ অধ্যায় সমাপ্ত হইতে চলিল। মনোরমার ১২ বৎসর ও আমার ১৮ বৎসরে বিবাহ-বাসরে দু'জনার মধ্যে যে "গ্রন্থিবন্ধন" হইয়াছিল, ২২ বৎসর সংসার-চক্রে একত্রে ঘুরিয়া এইবারে ইহকালের জন্য সে "গ্রন্থিমোচন" হইতে চলিল।

১২৯৭ সনের ১৯শে আষাঢ় শুক্রবার আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। মনোরমা কখনও আমার কোন ইচ্ছায় বাধা দিতেন না; কিন্তু আজ তিনি বাধা দিলেন। আমি বলিলাম, "গুরুদেবকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে"। এ কথার উপর আর বাধা দেওয়া চলে না, কিন্তু তথাপি মনোরমা বলিলেন, "আজ না যে'য়ে সোমবার যে'তে পার না?" আমি বলিলাম, "সোমবারে কি?" তিনি একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "নিতুর জন্মদিন।" আমাদের প্রত্যেক সন্তানের জন্মদিনে ষোল সের দুধের পায়স করিয়া ভোগ দেওয়া হইত। আমি বলিলাম, "এই সমারোহের জন্য আমার উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন নয়"। এ কথার উপর মনোরমা কিছু বলিলেন না। কিন্তু সেই দিনের মধ্যে অনেকবার ফাঁকে ফাঁকে বলিলেন যে, "সোমবার গেলে হতো"। আমি তাঁহার এইরূপ অনাবশ্যক ব্যগ্রতা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম।

তিনি কিন্তু হাসিলেন না। যে কারণেই হউক, সে দিন আমাকে দূরে পাঠাইতে তাঁহার একটা আশঙ্কা হইয়াছিল। আমি কিন্তু এতটা বুঝিলাম না।

রাত্রে রওনা হইয়া ষ্টেশনে গেলাম এবং যথাসময়ে ট্রেণ রওয়ানা হইল। পরিশেষে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, আমার রওয়ানা হওয়ার কিছুক্ষণ পরে মনোরমা আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যরঞ্জনকে আর একটি লোক সঙ্গে দিয়া ষ্টেশনে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তখন আমাদের ট্রেণ ছাড়িয়া গিয়াছে।

মনোরমা ভাবিয়াছিলেন, যদি আমি ট্রেণ না পাই, তবে হয় ত সেই রাত্রি ষ্টেশেনে থাকিয়া পরদিন ভোরের ট্রেণে রওয়ানা হইব। যদি এরূপ ঘটে, তবে সত্যরঞ্জন আমাকে বাড়ীতে লইয়া আসিবে। এতটা কল্পনা করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল না। তিনি আমাকে ফিরাইবার জন্য যে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, ইহাই এইরূপ কল্পনা করার প্রকৃত কারণ, আমি এতটা উৎকণ্ঠা বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এরূপ কার্য্য আমি আর কখনও করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

শনিবারে আমি কলিকাতা পৌঁছিয়া শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিলাম। রবিবারের ভোরে দেওঘর হইতে শ্রীমান্ বেণীমাধবের এক টেলিগ্রাম পাইলাম; তাহাতে সংবাদ এই যে, আমাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রেমলতা ওলাউঠা রোগে আক্রান্তা হইয়াছে। টেলিগ্রামটি হাতে করিয়া শ্রীগুরুদেবের বাড়ীতে গেলাম, তিনি তখন শৌচাগারে গিয়াছেন, কাজেই বিলম্ব করিতে হইল। তথা

হইতে বাহির হইলে তাঁহাকে টেলিগ্রামের সংবাদ শুনাইলাম। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ভগবান্ যখন পরীক্ষা করেন, তখন খুব শক্ত জায়গায় আঘাত করেন।" তাঁহার কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলাম। আমাদের পাঁচটি পুত্র এবং তিনটি কন্যা, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি শক্ত স্থান, কোন্‌টি নরম স্থান, বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও তাঁহার অনুমতি লইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ মথুরানাথ গুহ ঠাকুরতাকে সঙ্গে করিয়া দেওঘর রওয়ানা হইলাম। হাবড়া ষ্টেশনে যাইয়া ট্রেণ ধরিতে পারিলাম না। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে গাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে। পীড়িতা কন্যার অবস্থা জানিবার জন্য টেলিগ্রাম করিলাম। বিকালবেলায় খবর আসিল যে, কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দেবরঞ্জন ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনীও উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। কোনরূপে দিন কাটাইয়া রাত্রের ট্রেণে আমরা বৈদ্যনাথ রওয়ানা হইলাম। সমস্ত রাত্রি ট্রেণে অনিদ্রায় কাটাইলাম। সোমবার ভোরে বৈদ্যনাথ ষ্টেশনে পৌছিয়া জানিলাম যে, অনতিপূর্ব্বে দেওঘরের ট্রেণ ছাড়িয়া গিয়াছে, আমাদের ট্রেণ নিয়মিত সময়ের অনেক পরে জংশনে পৌছিয়াছিল। তখন আর ট্রেণের অপেক্ষায় বিলম্ব করা অসম্ভব হইল, আমরা বৈদ্যনাথ জংশন হইতে হাঁটিয়া দেওঘরে চলিলাম, জংশন হইতে দেওঘর ৩।৪ মাইলের ব্যবধান মাত্র।

আমরা যখন সহরের প্রান্তে প্রবেশ করিয়াছি, তখন কতকগুলি ভিখারিণী দল বাঁধিয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, তাহারা অনেকে আমাকে চিনে; একজন বলিয়া উঠিল, 'বাবা এসেছ, কোন ভয় নাই, ছেলেরা সকলে ভাল আছে।' এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া নিশ্চিন্ত-

মনে বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। আমাকে পাইয়া সকলেই অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার হরিচরণ সেন মহাশয় সকলকে সযত্নে চিকিৎসা করিয়াছেন, তিনটি রোগীকেই কেলামেল খাওয়ান হইয়াছে, তাহাদের দাস্ত-বমি বন্ধ হইয়াছে। এখন আর ভয়ের কারণ নাই।

মনোরমার মুখের দিকে তাকাইয়া আমি উদ্বিগ্ন হইলাম, তাঁহার চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, শরীর বিবর্ণ হইয়াছে, হাসিতে সে প্রফুল্লতা নাই। আমার অনুপস্থিতিতে তিনটি সন্তান দুরন্ত ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, ভয়ানক দুশ্চিন্তা ও রাত্রি-জাগরণে এরূপ হওয়া আমি অস্বাভাবিক মনে করিলাম না। কিন্তু তিনি যে আমার সন্তানগুলিকে মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিয়া দিয়া আমাকে ফাঁকি দিতে বসিয়াছেন, তখন তাহা ভাবিতেও পারি নাই। মনোরমা কোনও শোক পাইবেন না, এইরূপ একটি কুসংস্কার আমার ছিল, এবারে সেটি আরও দৃঢ় হইল।

মথুর ও আমি রাত্রে ঘুমাইতে পারি নাই জানিয়া মনোরমা শীঘ্র শীঘ্র আমাদিগকে আহার করাইয়া নিদ্রা যাইতে বলিলেন। আমিও বলিলাম, "তুমিও ত রাত্রে ঘুমাও নাই, এখন আর ভয় নাই, তুমিও আহার করিয়া নিদ্রা যাও।" আমরা আহারান্তে নিদ্রা গেলাম, মনোরমা কি করিলেন, জানিলাম না।

আজ সেই সোমবার, বেলা প্রায় ২টা, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মনোরমা আমার কাছে আসিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, "দেখ, আমারও কলেরা হয়েছে।" আমি চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম এবং

বিরক্তি ও ব্যগ্রতার সহিত বলিলাম "বল কি? এমন কথা বল্‌তে নাই।" তিনি আমার বিছানার কাছে বসিলেন, মনে হইল যেন, নিশ্চিন্ত-মনে কথাবার্ত্তা বলিতে বসিয়াছেন। আমি তিরস্কার করিয়া বলিলাম যে, "এমন করিয়া আমার প্রাণ উড়াইয়া দিতেছ কেন? কি হয়েছে?

মনোরমাকে পরিহাসচ্ছলেও মিথ্যাকথা বলিতে শুনি নাই, কিন্তু আজ ভাবিলাম যে, তিনি নিশ্চয়ই পরিহাস করিয়া মিথ্যাকথা বলিয়াছেন। আমি ঠিক কথা জানিবার জন্য তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন, "তোমাকে আমি বরাবর বলিয়াছি যে, যে দিন আমি একবারের অধিক পায়খানায় যাইব, জানিও, সে দিন আমার ওলাউঠা হইয়াছে।"

এই কথাটার একটু ইতিহাস আছে। আমার অভ্যাস ছিল যে, আমি দিনের মধ্যে ৩।৪ বার পায়খানায় যাইতাম, ইহা রোগ নহে, সুধু অভ্যাস। মনোরমা বলিতেন যে, তাঁহার জ্ঞান হইয়াছে অবধি মনে হয় না যে, তিনি কোন দিন একাধিকবার পায়খানায় গিয়াছেন। যে দিন একবারের অধিক হইবে, সে দিন তাঁহার ওলাউঠা হইবে। আজ সেই কথাই স্মরণ করাইয়া দিলেন, আমার শরীর কাঁপিয়া উঠিল। আমার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে আবার বেগ হইল, এইরূপে এক ঘণ্টার মধ্যে কয়েকবার দাস্ত হইল, পেটে যাতনা উপস্থিত হইল, অল্প সময়ের মধ্যেই শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। সন্তান তিনটিকে শীকার হারাইয়া হিংস্র ব্যাধি যেন এই প্রতিহিংসার জন্য শতগুণ বেগে তাহাদের মাতাকে আক্রমণ করিল। তখন আমাদের পরিবারমধ্যে কিরূপ হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল, তাহায় বর্ণনা হয় না।

নিজের হাতে একটি মাদুর পাতিয়া ঠাকুর-ঘরে শয়ন করিলেন। এ ঘরে তিনি পূর্ব্বে কখনও শয়ন করিতেন না। ডাক্তার হরিচরণ বাবু অবিলম্বে আসিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু রোগিণী ঔষধ খাইতে তেমন ইচ্ছুক নহেন। আমার হাত দুখানি ধরিয়া বিনীত-ভাবে বলিলেন, "দেখ, ঔষধ খাইলেই লোক বাঁচে এবং না খাইলেই মরে, এরূপ বিশ্বাস আমার নাই। আমি চাই, আমার মনটাকে এক-দিকে ফেলে রাখ্‌তে, তাতে তোমরা কোন বিঘ্ন করো না।"

মনোরমার কথা শুনিয়া একটি ঘটনা আমার মনে পড়িল। ভাগলপুরে যখন তাঁহার অত্যন্ত কাসি হইয়াছিল, তখন ধ্যানে বসায় সে কাসি সারিয়া গিয়াছিল। (১ম খণ্ডে সবিশেষ বর্ণনা আছে) তাই আজ আমি বলিলাম, "তুমি ধ্যানে বসিতে পার ?" আমার মনে হইয়া-ছিল যে, সমাধি হইলে নিশ্চয়ই ব্যাধি সারিয়া যাইত। মনোরমা আমার দিকে স্নেহপূর্ণ-নয়নে তাকাইয়া বলিলেন, "না, শরীরটা একেবারে ভেঙ্গে গেছে, বস্‌বার শক্তি নাই।" আরও বলিলেন, "আমার আর কোনও চিকিৎসার প্রয়োজন নাই, সুধু বরফ আর বাতাস।"

তিনটি সন্তান এখনও মৃত্যুর কবল হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা পায় নাই, সহধর্ম্মিণী জীবনসঙ্গিনী মৃত্যুশয্যায়। যে ব্যক্তি বাল্যকালেই সন্ন্যাসী হইতে চাহিয়াছিল, অদৃষ্ট-পুরুষ আজ তাহার অবস্থা দেখিয়া নিশ্চয়ই পরিহাস করিতেছেন।

দুঃখের উপর দুঃখ যে, চিকিৎসা করাইতে পারিব না। সংবাদ দিলে ডাক্তার সরকার কি ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী নিশ্চয়ই আসিতেন ; কিন্তু মনোরমা সে পথ বন্ধ করিলেন। জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামসময়ে

যিনি নিশ্চিন্ত-মনে একান্তভাবে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিতে চাহিতেছেন, অনিশ্চিত-ফল চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিতে সাহস হইতেছে না। অন্য দিকে অবিশ্বাসী আমি পরিণাম-ফলের জন্য একান্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছি, এই দোটানার মধ্যে আমি অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমার সমস্ত হৃদয়-তন্ত্রী এলোমেলো হইয়া গিয়াছে, আমি মোটেই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না। আমি সজল-নয়নে বলিলাম, "অষুধ খাও, নতুবা আমি কিরূপে স্থির হইয়া থাকিব ?" মনোরমা কিছুই না বলিয়া চক্ষু বুজিয়া হাঁ করিলেন, আমি তাঁহার মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিলাম। চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

কলিকাতায় শ্রীমান্ রেবতীমোহনকে টেলিগ্রাম করা হইল, তিনি দ্বিতীয় দিবসে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনোরমার মুখ প্রফুল্ল হইল। বলিলেন, "বাতাস করুন।"

আমি বহুদিন হইতে ওলাউঠা রোগে হলুদের গুঁড়োর অসাধারণ শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, মনোরমাকেও তাহা খাওয়াইয়াছিলাম, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উহা বমি হইয়া উঠিয়া গেল, আর খাইতে চাহিলেন না।

দুই দিনের চিকিৎসায় কিছুই ফল ফলিল না। মনোরমা আবার বলিলেন, "আমি চাই, আমার মনটা একদিকে ফেলে রাখ্‌তে, তোমরা তা দিচ্ছ না।" তাঁহার কথা শুনিয়া এবারে ঔষধ বন্ধ করা হইল।

এই দারুণ উদ্বেগজনক ব্যাধির মধ্যে তিনি অত্যন্ত সুস্থভাবে চক্ষু বুজিয়া থাকিতেন, মাঝে মাঝে এক আধ্ বার যখন হাতে পায়ে খিল ধরিত তখন সে স্থান চাপিয়া ধরিতে বলিতেন, ইহা ভিন্ন রোগ-যাতনার অন্য কোনও বাহিক লক্ষণ দেখা যাইত না।

তাঁহাকে সর্ব্বদা নিদ্রিতের মতন পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আমার ভয় হইত, ভাবিতাম, বুঝি তন্দ্রার অবস্থা, তাই মাঝে মাঝে আমি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, "তুমি কি ঘুমাচ্ছ ?" তাকাইয়া বলিতেন, "না, ঘুম হয় না।" আমি জিজ্ঞাসা করিতাম, "তবে এরূপ পড়িয়া থাক কেন ? নাম কচ্ছ ?" বলিতেন, "হাঁ।" যে চারিদিন রোগ-শয্যায় ছিলেন, তাহার মধ্যে কোন কথাই বলেন নাই, এমন কি, তিনটি সন্তান যে শয্যাগত, তাহাদের কথাও জিজ্ঞাসা করেন নাই, অথচ এক পলকের জন্যও জ্ঞান হারান নাই। একটি রুগ্ন সন্তান খুব কাঁদিতেছে শুনিয়া সুধু একদিন বলিয়াছিলেন যে, "ওকে কেউ দেখ।"

ঔষধ দেওয়া বন্ধ করিলাম, কিন্তু আমার মন মানিতেছিল না। গভীর রাত্রে শরীরটা বড়ই ঠাণ্ডা হইয়া গেল, তখন নাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে। মনোরমা জল চাহিলেন, আমি একদাগ উত্তাপক ঔষধ মুখে ঢালিয়া দিলাম। ঔষধটি গিলিয়া একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং আমার হাতখানি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "মণি, আমার সঙ্গে দুষ্টমী কচ্ছো ?" এরূপ সোহাগ করিয়া ডাকা তাঁহার অভ্যাস ছিল না, আজ অসঙ্কোচে "মণি" বলিলেন। আমি তাঁহার মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার প্রাণে অত্যন্ত অনুতাপ জন্মিল, তাঁহার শেষ সময়ের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিতেছি না, তৎক্ষণাৎ বলিলাম, "আর আমি তোমার অনিচ্ছায় কিছুই করিব না।" বলিলাম বটে, কিন্তু আরও একাধিকবার আমাকে এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল।

মঙ্গলবারের রাত্রি কাটিল, বুধবার অবস্থা আরও খারাপ হইল।

কোন এক বন্ধু আসিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, আর্য্য মিশনের আচার্য্য পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ওলাউঠার একটি অব্যর্থ ঔষধ জানেন, তিনি সেই ঔষধে শত শত কঠিন রোগীকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই ঔষধটি খাইয়া জল খাওয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু ঔষধ অব্যর্থ।

এই কথা শুনিয়া আবার আমার প্রাণ নূতন আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মনোরমা সুধু বরফ ও বাতাস চাহিতেছেন, পিপাসায় তাঁহাকে বরফ না দিয়া কেমন করিয়া রাখিব? আমার মা জল জল করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন ওলাউঠা রোগে ডাক্তাররা মোটেই জল দিতেন না, মায়ের সেই নিদারুণ তৃষ্ণার কথা আজিও আমি ভুলি নাই (১ম খণ্ডে বিবৃত); এখন কি করিয়া আমি মনোরমার জল বন্ধ করি? মায়া-মরীচিকা আবার তাহার প্রভাব বিস্তার করিল। ভাবিলাম, এই ঔষধ খাওয়াইয়া যদি বাঁচাইতে পারি, তখন না হয় দুজনায় ঝগড়া করিব। কোনওরূপে রক্ষা করিতে পারিলে হয়।

আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর হইলাম। জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যরঞ্জনকে ঔষধ আনিতে পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের নিকট পাঠাইলাম। শ্রীমান্ আমাকে বলিয়াছে যে, যখন আমি তাহাকে এই ঔষধ আনিতে পাঠাইলাম, তখন বালক সমস্ত রাস্তায় কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়াছিল এবং তাহার মাকে পিপাসায় জল দেওয়া হইবে না, ইহা ভাবিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। সে প্রার্থনা করিতেছিল, "হে ভগবান্, হে হরিঠাকুর, আমি যেন এই ঔষধ না পাই।" মাতৃভক্ত বালকের প্রার্থনা ভগবান্ শুনিয়া-

ছিলেন। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্থানান্তরে যাওয়ায় তাঁহার ঔষধ পাওয়া গেল না।

তখন আষাঢ় মাসের শেষভাগ, কিন্তু কয়েকদিন হইতে এক-বিন্দুও বৃষ্টি হয় নাই, অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। বুধবারের মধ্যাহ্নসময়ে মনোরমা নিজ হইতে বলিলেন, "একটা খুব বৃষ্টি হবে, তা'র পরই সব সেরে যাবে।" আমরা উৎফুল্ল হইলাম, ডাক্তার হরিচরণ বাবু বলিলেন, "উহাঁর (মনোরমার) কথার উপর নির্ভর করিয়া থাকাই উচিত।" এখন হইতে তাহাই করিলাম।

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে মুষলধারে এক পসলা বৃষ্টি হইল। আমরা যেন হাতে আকাশ পাইলাম। ভাবিলাম, ইহার পর নিশ্চয়ই আরোগ্য-লাভ করিবেন। বৃষ্টিধারায় উত্তপ্ত ধরা সুশীতল হইল, রোগীও অধিক-তর শান্তভাবে শুইয়া রহিলেন। সমস্ত রাত্রির মধ্যে বলিতে গেলে কোনও উদ্বেগ ছিল না। শ্রীমান্ বেণী, রেবতী ও মথুর সর্ব্বদা সেবা-শুশ্রূষা করিতেছিলেন; দাই, চাকর, পাচক সকলেই প্রাণপণে খাটিতেছিল, বালক-বালিকাদিগকে যত্ন করিতেছিল। অল্পদিনের মধ্যে দেওঘরে আমার বন্ধু ও হিতৈষীর সংখ্যা যথেষ্ট হইয়াছিল, সকলেই উদ্বিগ্ন এবং যথাকর্ত্তব্যসাধনে অকুণ্ঠিত। পাড়ার মেয়েরা অনেকে আসিলেন। বুধবার রাত্রে অনেকের আশা হইল যে, হয় ত এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন।

বৃহস্পতিবারের সকালবেলায় অবস্থা খারাপ নহে। রুগ্ন বালক-বালিকাদিগকে পথ্য ও অন্যান্যকে খাবার দেওয়া হইয়াছে। আকাশ অতি পরিষ্কার, তখনও অনুষ্ণ-পবন বহিতেছে, আমি মনোরমার মুখের

কাছে বসিয়াছি, রেবতী, মথুর ও বেণী প্রভৃতি সকলেই কাছে আছেন, তখনও নিরাশার কোনও কারণ নাই। আমি কি কথা বলিতেছিলাম, তিনি আমার পানে তাকাইয়া আছেন। আমার দুই একটি প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, হঠাৎ মুখ বাঁকা করিয়া শ্বাস বহিল, তৎক্ষণাৎ আমার মধ্যে একটা অসীম উত্তেজনার আবির্ভাব হইল। আমি একটা করতাল লইয়া দাঁড়াইয়া সকলকে বলিলাম, "উনি চলিলেন, কীর্ত্তন কর।" এই আকস্মিক বিপদে শ্রীমান্ রেবতীমোহন ও শ্রীমান্ বেণী-মাধব, মথুরানাথ মুখ খুলিতে পারিলেন না; কিন্তু ঘোর উত্তেজনায় আমাতে তখন সকলই সম্ভব হইয়াছিল। আমি করতাল লইয়া মনোরমার পবিত্র দেহ বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া "হরি-হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ-যাদবায় নমঃ" গাহিতে লাগিলাম। সদ্য মাতৃহীন তিনটি সন্তান (সতু, নিতু, চিতু) কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার সঙ্গে তাহাদের স্নেহময়ী জননীর উদ্দেশ্যে হরিনাম করিতে লাগিল। মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মুখখানি কি উজ্জ্বল! কেমন হাসিমাখা! আমার নিকট উহা কত পবিত্র! আমার সর্ব্বদুঃখ-নিবারণ, সর্ব্বপাপ-বিনাশন তাঁহার এই লীলার দেহ। দেহের নখাগ্র হইতে কেশাগ্র অবধি পবিত্রতার পরমাণু দিয়া রচিত। ২২ বৎসরকাল এই দেহে থাকিয়া তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ, আজ আমার উপায় কি?

সকলে দেখিতে আসিলেন, ডাক্তার হরিচরণ বাবু, হেডমাষ্টার যোগীন্দ্র বাবু, সবজজ বেণী বাবু, আরও কত লোক আসিলেন। বকুলাল ছেলেদের মতনই শোকাকুল হইলেন। রেবতীমোহন, বেণীমাধব ও

মথুরানাথের ত কথাই নাই, তাহাদের কথা বলার শক্তি নাই। মনোরমার পরিত্যক্ত-দেহ নূতন বস্ত্রে সজ্জিত করিয়া ধরাধরি করিয়া আঙ্গিনার বাহির করা হইল। উচ্চ হরিধ্বনির সঙ্গে বালকগণের "মা মা" ধ্বনি, রুগ্ন সন্তানগুলির অস্ফুট কাতর-ক্রন্দন মিলিত হইল। তিনটি সন্তান তখনও শয্যাগত।

আমিই কপালে সিন্দূর ও পায়ে আলতা পরাইয়া দিলাম। সেইটুকুই আমার শেষ সেবা এবং জীবনের শেষ সুখ।

যোগীন্দ্র বাবু, বকুলাল, রেবতীমোহন, বেণীমাধব, মথুরানাথ এবং সত্যরঞ্জন প্রভৃতি তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া শিবগঙ্গায় লইয়া গেলেন, ছেলেমেয়েগুলিকে লইয়া আমি অন্দরমহল পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের একটি ঘরে আসিয়া রহিলাম, বাড়ীর ভিতরটা শূন্যময় অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। বাড়ীর ভিতরে যাইতে ভয় হইতে লাগিল, যেন সেই সুখময় গৃহ আজ আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে।

বৈদ্যনাথ-পরিত্যাগ

পরের দিন বন্ধুগণ দেখা করিতে আসিলেন। কাঙ্গালিগণ রাস্তায় দাঁড়াইয়া "মা লক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছেন," বলিয়া কতই দুঃখ করিতে লাগিল। আমরা সেই শূন্য বাড়ীতে আর প্রবেশ করিতে পারিলাম না, ট্রেণ ছাড়ার বহুপূর্ব্বে সকলকে লইয়া ষ্টেশনে গিয়া বসিয়া রহিলাম।

৺হরলাল রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হরিজীবন রায় বি, এল কিছুদিন পূর্ব্বে, কলিকাতা হইতে আমার নামে ৫০ টাকার মনিঅর্ডার

করিয়াছিলেন। সে টাকাটা ঠিক্ সময়ে পৌঁছায় নাই, আজ ১০।১২ দিন পরে আসাম ঘুরিয়া সেই টাকা আমার হাতে আসিল। পোষ্টাফিসের লোকেরা ভ্রমক্রমে দেওঘরের মনিঅর্ডার ডিব্রুগড়ে পাঠাইয়াছিল। আজ দশটার মধ্যে উহা পাইলাম। এই টাকাটা এইরূপ ঘুরিয়া না আসিলে ৮।৯ দিন পূর্ব্বে পাইতাম এবং নিশ্চয়ই উহা খরচ হইয়া যাইত, আজ কলিকাতায় যাওয়ার জন্য কাহারও নিকট টাকা ধার করিতে হইত; কিন্তু পোষ্টাফিসের ভুলের জন্য সুবিধা হইল। অনেক সময় অনিষ্ট হইতেও ইষ্ট উৎপন্ন হয়।

ট্রেণ যখন ছাড়িয়া দিল, তখন মধ্যমপুত্র শ্রীমান্ নিত্যরঞ্জন "আমার মাকে বৈদ্যনাথে রেখে গেলাম" এই কথা বলিয়া বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে অবিশ্রান্ত এমনই কাঁদিতে লাগিল যে, তাহা শুনিয়া পাষাণ হৃদয়ও ঠিক থাকিতে পারে না। যতই গাড়ী চলিতে লাগিল, যতই ষ্টেশন অদৃশ্য হইতে লাগিল, ততই বালক, মাতৃহীন বালক, কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। আমি বলিলাম, "নিতু, বাবা, তুমি আর কেঁদ না, আমি যে সহ্য করিতে পারিতেছি না।" বালক কি থামিতে পারে? তার বুক ফাটিয়া যায়, তবু বাবার কষ্ট বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে অনেক ক্ষণে থামিল। যখন বৈদ্যনাথধাম অদৃশ্য হইল, তখন আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই জন্যই কি বৈদ্যনাথে আসিয়াছিলাম? শ্রীগুরুদেবের বৈদ্যনাথ যাওয়ার অনুমতির মধ্যে কি ইহাই নিহিত ছিল? এক একবার শোকাবেগে আমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, আবার ছেলেদের ভয়ে প্রাণপণে চাপিতে যাইয়া আরও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি।

আমাদের গাড়ীতে একটি ভদ্রলোক (পরে জানিলাম, তিনি একজন কবিরাজ) ছিলেন, তিনি আমাদের সকলের অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?" আমি জানাইলাম যে, এই বালক-বালিকাগণ আমার সন্তান, ইহারা গতকল্য মাতৃহীন হইয়াছে।

কবিরাজ মহাশয়ও ভুক্তভোগী, তিনিও কিছুকাল পূর্ব্বে আমার মতন লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছেন। তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিলেন। কবিতাটি একান্তই সহানুভূতিসূচক। আমি উহা মুখস্থ করিয়া লইলাম, নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিতেছি। যিনি সম-দুঃখী, তিনি উহার মর্ম্ম বুঝিবেন।

"বিদ্ধা মৃগী ব্যাধশিলীমুখেন,
মৃগোঽপি তৎকাতরবীক্ষিতেন।
অসূন্ পরিত্যজ্য গতব্যথা সা,
মৃগস্য জন্মাবধিরাধিরাসীৎ॥"

ব্যাধের বাণে মৃগী বিদ্ধা হইয়াছে, তাহার কাতর দৃষ্টিবাণে মৃগ বিদ্ধ হইল। প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া মৃগী সমস্ত যন্ত্রণার হাত এড়াইল, কিন্তু মৃগের যন্ত্রণা যাবজ্জীবন লাগিয়া রহিল।

"মৃগস্য জন্মাবধিরাধিরাসীৎ" কথাটা কি তীব্র, কেমন সত্য, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে বুঝিবে? তখন মনে হইয়াছিল, এই বাণবিদ্ধ বক্ষ লইয়া জীবনে বুঝি আর হাসিতে পারিব না।

রেলগাড়ী যেমন কাহারও মুখের দিকে তাকাইয়া রাস্তায় বিলম্ব করে না, সময়ও সেইরূপ জীবের সুখ-দুঃখ উপেক্ষা করিয়া অবিশ্রান্ত

চলে। দুজনায় মিলিয়া আমাদের দুঃখপূর্ণ হৃদয়গুলিকে বহন করিয়া পরের দিন প্রভাতে হাবড়া ষ্টেশনে পৌঁছাইল। ষ্টেশনে সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার অপূর্ব্ব মিলন। কত দূর হইতে সুখ দুঃখ বহন করিয়া আনিয়াছে! ষ্টেশনে বন্ধু-সমাগমে কত লোক আনন্দে কত লোককে আলিঙ্গন করিল, আমরা কত বিষাদ লইয়া আত্মীয়সমাগমে চলিলাম।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন

কলিকাতা চাঁপাতলায় অখিল মিস্ত্রীর লেনে আমাদের আত্মীয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাসাবাড়ী ছিল, শ্রীমান্ রেবতী-মোহনও সেই বাড়ীতেই থাকিতেন। ঐ বাড়ীর সংলগ্ন একটি বাড়ী আমাদের জন্য ভাড়া করিয়া রাখা হইয়াছিল। উমেশবাবুর বাড়ীতে স্থানাভাব বলিয়াই এই বাড়ী করিতে হইয়াছিল।

কলিকাতায় আসিয়া জানিলাম, টেলিগ্রামে মনোরমার দেহ-ত্যাগের সংবাদ পাইয়া শ্রীগুরুদেব প্রাকৃত জনের ন্যায় ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়াছিলেন। এ কথা শুনিয়া আমি দুঃখিত ও বিস্মিত হইলাম। তিনি কাঁদিয়াছেন, এই জন্য দুঃখ হইল, আর তিনিও কাঁদিলেন, এই জন্য বিস্মিত হইলাম। মনোরমা সমস্ত জীবনে বোধ হয় ৩।৪ দিনের বেশী গুরুদেবের সম্মুখে আসেন নাই, কাছে বসেন নাই। এক দিন মাত্র তিনি মনোরমাকে কাছে বসাইয়া সমাধিস্থ

হইতে বলিয়াছিলেন এবং সুধু সেই দিনই কিছু বেশীক্ষণ মনোরমা তাঁহার কাছে ছিলেন, অন্যান্য সময় অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে দূর হইতে প্রণাম করিয়াছেন, গুরুদেব সে দিকে ফিরিয়াও তাকান নাই। তিনি যতটুকু দেখিয়াছেন,তাহাতে সচরাচর চেনাশুনা থাকে না। মনো-রমা শ্রীগুরুদেবের নিকট জীবনে এমন কোনও কার্য্য বা ভাব প্রকাশ করেন নাই, এমন কোনও কথা বলেন নাই, যাহাতে বিশেষ ভাবে তাঁহাকে মনে রাখার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এখন বুঝা গেল যে, ঠাকুরের চক্ষের দেখাই দেখা নয়। ঠাকুর যে কাঁদিলেন, এই কান্না শোকের কান্না নয়। বলা বাহুল্য, ইহাতে মোহের গন্ধমাত্র নাই, ইহার মর্ম্ম আমরা কিরূপে বুঝিব? যিনি মায়াতীত মায়াধীশ, সেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব হরিদাস ঠাকুরের মৃতদেহ কোলে করিয়া কিরূপ বিহ্বল হইয়াছিলেন! আমি হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে মনোরমার তুলনা করিতেছি না, সুধু অপ্রাকৃত সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্যই এই দৃষ্টান্তটা দিলাম।

এক দিন বন্ধুবর মোহিনীমোহন রায় এবং আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট বসিয়া কথা শুনিতেছি ও বলিতেছি, এমন সময় আমাদিগকে চা খাওরার জন্য নীচে ডাকা হইল, গুরুদেব আমাদিগকে উপরে চা আনিয়া তাঁহার নিকট বসিয়া খাইতে বলিলেন। ইহাতে আমরা আমাদের সৌভাগ্যের কথা প্রকাশ করিয়া অন্যান্য সকলকে বলিলাম, 'দাও আমাদের চা, গোঁসাই আমাদের তাঁহার কাছে বসিয়া চা খাইতে বলিয়াছেন।' আমাদের কথা শুনিয়া যোগজীবন ভায়া (ঠাকুরের ঔরস পুত্র) বলিলেন, "কেন? তবে নাকি আপনাদের ঠাকুর আসঙ্গ-লিপ্সাবর্জ্জিত হইয়াছেন?" যোগজীবন যে কিরূপ

মধুর ভাবে, সুগভীর ভাবযুক্ত এই কথাটি বলিলেন, তাহা না বুঝিলে বুঝানো যায় না। আমরা চা লইয়া উপরে আসিয়া যোগজীবনের উক্তিটি গুরুদেবকে বলিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ও (যোগ-জীবন) কি বুঝিবে ? ভক্ত-সঙ্গ-লিপ্সা কি আসঙ্গ-লিপ্সা ?" আমরা শুনিয়া সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেলাম এবং গৌরবে ফুলিয়া সকলকে জানাইলাম যে, গুরুদেব আমাদিগকে ভক্ত বলিয়াছেন; আমাদের সঙ্গে সাধু-সঙ্গ সম্ভোগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি যে আমাদের দুই জনকে বিশেষভাবে ভক্ত বলিয়াছেন, তাহা নয়। ভক্ত-সঙ্গ যে মুক্ত-পুরুষদিগেরও সম্ভোগের বস্তু, প্রকারান্তরে তাহাই জানাইলেন। যিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, পুত্র যোগজীবন এবং একটা রাস্তার মুটে তাঁহার কাছে সমান স্নেহের পাত্র, তিনি আজ কি ভাবে মনোরমার জন্য কাঁদিলেন, আমরা কি বুঝিব ? তবে ইহা যে মায়ামোহের কার্য্য নহে, সে কথা বলাই অনাবশ্যক।

গুরুদেব অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া পরে বলিলেন, "সতীস্ত্রীর শোকে মহাদেবও পাগল হইয়াছিলেন, মনোরঞ্জনবাবু কি করিয়া এই শোক সহ্য করিবেন ?" ঠাকুর, আমি পাষণ্ড, নতুবা কেমন করিয়া এই দীর্ঘকাল আমি সমস্ত বিস্মৃত হইয়া সংসারমোহে সকলের মতন ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ? রুশিয়ার সম্রাট্ তাঁহার মাটীর রাজ্য হারাইয়া নিরন্তর হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন, আর আমি অমূল্যরাজ্য হারাইয়া সকলের সঙ্গে হট্টগোলে যোগ দিয়া দিন কাটাইতেছি, আমার মতন নির্ম্মম, পাষণ্ড, বুদ্ধিভ্রষ্ট আর কে আছে ?

কলিকাতায় বন্ধু-বান্ধব এবং গুরু-ভাই-ভগিনীর অভাব ছিল না,

আমাদিগকে সকলেই ভালবাসিতেন, মনোরমার শোকে সকলেই বিষণ্ণ। শ্রীগুরুদেবের কাছে বসিয়া কিছুক্ষণ কাঁদিলাম, বৈদ্যনাথ হইতে এ পর্য্যন্ত প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে পাই নাই, ছেলেদের ভয়ে বুক ফাটিলেও মুখ ফুটিতে পায় নাই। আজ ঠাকুরের কাছে কাঁদিয়া প্রাণের ভার একটু লঘু হইল।

স্বপ্নের বিবরণ

একখানা পত্র হইতে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি গৃহীত হইল। মনোরমার দেহত্যাগের পূর্ব্বরাত্রে (বুধবারে) শ্রীযুক্ত গুরুদেবের বাড়ীতে মোহিনীবাবু (মোহিনীমোহন রায়, ইনি গুরুদেবের নিকট গ্রন্থ পাঠ করিতেন) স্বপ্নে দেখিলেন, শ্রীগুরুদেব বলিতেছেন, "দেখ দেখ, মনোরমা আসিয়াছেন।" মোহিনীবাবু বলিলেন, "আমরা যখন দেখিতে পাই না, তখন আমাদিগকে বলেন কেন? আপনিই দেখুন।" শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "না, আপনারাও দেখিবেন।" এই কথা শুনিয়া মোহিনীবাবু পশ্চিমদিকে তাকাইলে একটি অপূর্ব্ব জ্যোতির ধারা দেখিতে পাইলেন। ঐ জ্যোতিঃ অতিশয় জ্বলন্ত অথচ মধুর। সেই জ্যোতির মধ্যে তক্-তক্ করিয়া একটি অত্যুজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকাশিত হইতে লাগিল। মোহিনীবাবু শ্রীগুরুদেবকে বলিলেন, "এ মূর্ত্তি দেখিয়া ত আমি চিনিতে পারিতেছি না। যে মূর্ত্তিতে মনোরমা ইহলোকে আমাদের নিকট প্রকাশ ছিলেন, সেই মূর্ত্তি দেখিতে চাই।" বলিতে বলিতে একপাশে অমনি

সেই মূর্ত্তির প্রকাশ হইল। পরিষ্কার একখানা কাপড়-পরা আনন্দে পরিপূর্ণ আনন্দময়ীরূপে মনোরমা কতই হাসিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। মোহিনীবাবু দেখিলেন, সে মূর্ত্তি দয়া-মায়া, পতিপ্রেম ও অপত্যস্নেহে পরিপূর্ণ। কিছুকাল পরে সেই মূর্ত্তি মোহিনীবাবুকে বলিলেন, "আমি এখন একবার শান্তির সঙ্গে দেখা করিতে যাই।" মোহিনী-বাবু বলিলেন, "একবার আমাদের বাড়ী যাবেন না?" তিনি বলিলেন, "আমার অনেক কাজ, তবে আপনাদের বাড়ীও যাব।" নিদ্রাভঙ্গ হইলে প্রভাতে মোহিনীবাবু গুরুদেবকে এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিতেছিলেন এমন সময় শান্তি (শান্তিসুধা দেবী, গোস্বামী মহাশয়ের কন্যা) উপরে আসিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি মনোরমাকে স্বপ্নে দেখিলাম। পরিষ্কার একখানা কাপড় পরা, অতিশয় আনন্দময়ী মূর্ত্তি, অতি চমৎকার একটি আনন্দময় মন্দিরের মধ্যে কাছে একটি মেয়ে বসাইয়া রাখিয়াছেন।"

ঐ রাত্রিতে অখিলমিস্ত্রীর লেনে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয় বসিয়া নাম জপ করিতে করিতে দেখিলেন, একখানা ফরসা কাপড় পরিয়া একটী কন্যা কোলে করিয়া মনোরমা অতিশয় প্রফুল্ল মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন।

সেই দিনই শেষ রাত্রে ফরিদপুর সহরে মনোরমার ভ্রাতৃবধূ শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দত্ত স্বপ্নে দেখিলেন, একখানি পরিষ্কার লাল-পেড়ে শাড়ী পরিয়া, একটি মেয়ে কোলে করিয়া সহাস্যমুখে মনোরমা তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়াছেন। কুমুদিনী আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "ঠাকুরঝি এসেছেন, বেশ হয়েছে, সুধু খুকীকে নিয়ে এসেছেন, আর সব ছেলেরা কোথায়?" এ কথার উত্তর না দিয়া মনোরমা তাঁহাদের

ঘরে প্রবেশ করিলেন। মনোরমার ভ্রাতা কিংবা ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি কেহই মনোরমার পীড়ার সংবাদ জানিতেন না।

সমস্ত স্বপ্নগুলিই মনোরমার দেহত্যাগের পূর্ব্বরাত্রে দেখা হইয়াছে। গুরুদেব যখন মোহিনী বাবুকে ও শান্তিসুধাকে বলিলেন যে, তাঁহাদের স্বপ্ন সত্যই, তখন মোহিনী বাবু বিমর্ষ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি মনোরমা দেহ ত্যাগ করিয়াছেন?" গুরুদেব বলিলেন, "তাঁহার মতন যাঁহাদের অবস্থা, তাঁহারা দেহ-রক্ষার পূর্ব্বে বাহির হইয়া এরূপ দেখা দিতে পারেন।" এ কথায় বুঝা গেল যে, গত রাত্রে দেহত্যাগ যদি না করিয়া থাকেন, তবু শীঘ্রই দেহ ত্যাগ করিবেন। পরের দিন বেলা ৯টার সময় মনোরমা দেহত্যাগ করিলেন। (২৫শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার সন ১৩০৪)।

মনোরমার দেহত্যাগের পরে আমাদের অনেক শ্রদ্ধেয় গুরু-ভ্রাতা ও গুরু-ভগিনী এমন সকল স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, সেগুলিকে অমূলক ভাবিয়া লইলেও সে সকল এমনই মধুর, এমনই সুসংবদ্ধ, এবং এমনই সুসঙ্গত যে, শুনিলে বিশ্বাসে হৃদয় উজ্জ্বল হয়, আনন্দে প্রাণ অভিভূত হয় এবং অবাস্তব বলিয়া উপেক্ষা করার শক্তি থাকে না। স্বপ্ন যদি সুধুই মানবচিন্তার অভিব্যক্তি হয়, তথাপি দেশ-দেশান্তরের নরনারীদিগের সেই সকল স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিলে বুঝা যায় যে, মনোরমার প্রতি তাঁহাদের কিরূপ প্রাণের টান ছিল এবং এখনও কিরূপ শ্রদ্ধাভক্তি রহিয়াছে। সে সকল স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিতে সুখকর হইলেও বাহুল্য-ভয়ে দিতে সাহস করিলাম না।

ছেলেদের স্বপ্ন

কলিকাতা আসার কয়েক দিন পরে একদিন রাত্রে আমাদের দ্বিতীয় কন্যা সাড়ে তিন বৎসর-বয়স্কা শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী (এই নামটি শ্রীগুরুদেব রাখিয়াছিলেন) খুব কাঁদিতেছিল। বালিকা মায়ের পিঠে গা দিয়া সর্ব্বদা শুইত, মাতৃবিয়োগের পরে এক একদিন ভোরে চক্ষু বুজিয়াই "মা উঠ, মা উঠ" বলিয়া পাশ-বালিসটা ঠেলিত। তখন দুঃখে আমাদের বুক ফাটিয়া যাইত। রাত্রেও কখন কখন এইরূপ বলিয়া বালিসটা ঠেলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়া মাকে জাগাইতে চেষ্টা করিত। তখন আমি কিংবা শ্রীমান্ বেণীমাধব কোলে করিলে থামিত, আর কাঁদিত না। কিন্তু সে দিন আমরা কতই যত্ন করিলাম, কাঁধে করিয়া ঘরের মধ্যে বেড়াইতে লাগিলাম; কিন্তু কিছুতেই মেয়েটি থামিল না, সারারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভোরের বেলায় অবসন্ন হইয়া ঘুমাইল। এই কন্যাটিও ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তখনও শরীর শোধরায় নাই, খুবই রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়াছে। যখন জানা গেল যে, যাঁহারা মনোরমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, অনেকেই দেখিয়াছেন, একটি মেয়ে কোলে, ইহাতে আমাদের মনে হইয়াছিল যে, হয় ত বিন্ধ্যবাসিনীকেই তিনি লইয়া যাইবেন, এ জন্য এই কন্যাটির প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

পরের দিন সকালবেলায় আমাদের জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যরঞ্জন বলিল,

"বাবা, কা'ল রাত্রে মাকে স্বপ্নে দেখেছি। মা বিন্ধ্যবাসিনীকে কোলে করিয়া বেড়াইতেছিলেন।" জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রেমলতা (বয়স তখন ৯ বৎসর) বলিল, "বাবা, কা'ল রাত্রে মাকে স্বপ্নে দেখেছি, খুকীকে কোলে ক'রে বেড়াইয়াছেন।" একই ভাব বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহা আমি জানি; সুতরাং এ বিষয়ে আর কোনও আলোচনা করিলাম না। যখন শ্রীমান্ বেণী সকালবেলায় শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনীকে ভাত খাওয়াইতেছিলেন, তখন তাহাকে একটু প্রফুল্ল দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "খোকনা, কা'ল রাত্রে তুমি অত কেঁদেছিলে কেন?" খুকী বলিল, "মা এসেছিলেন যে।" আমি একটু চমকিত হইলাম। ছেলেদের স্বপ্নের সঙ্গে মিলে কি না, জানিবার জন্য আমি বলিলাম, "মা কি তোমাকে কোলে ক'রে শুয়েছিলেন?" খুকী বলিল, "না, আমাকে কোলে ক'রে বেড়িয়েছিলেন।" আমি আরও একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, আবার জিজ্ঞাসা করিলাম— "তাতে কাঁদিলে কেন?" উত্তর—"ফেলে চ'লে গেলেন যে।" তখন আমরা সকলেই বুঝিলাম, কি জন্য মেয়ে সারারাত্রি কাঁদিয়া কাটাইয়াছে।

খুকী কি বস্তু দেখিল ?

একদিন দিদিমা (গুরুদেবের শাশুড়ী) ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোরমা তোমাকে এত ভালবাসিতেন, এখন আসেন কি?"

গোঁসাই বলিলেন, "এ সকল কি হাটে বাজারে বলার কথা ?" তখন সেখানে কয়েকজন লোক ছিলেন, তাঁহারা চলিয়া গেলে গুরুদেব বলিলেন,—"কি উজ্জ্বল রূপ, কি অপূর্ব্ব শ্রীই ধারণ করেছেন ! প্রায়ই এখানে আসেন, কি আশ্চর্য্য নিষ্ঠা, এখন ত তিনি স্থূলদেহে নাই, অনায়াসে আমার ঘরে আসিতে পারেন ; কিন্তু এখনও সেই নিষেধ মানিয়া চলিতেছেন, ঐ বারান্দাটুকুতে, ঐ দরজাটির পাশে আসিয়া বসিয়া থাকেন, ঐখান হইতেই নমস্কার করেন। কি নিষ্ঠা !"

এইখানে "নিষেধ মানিয়া চলার" কথা সংক্ষেপে বলিব। ঠাকুরের দেহরক্ষার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ৪৫ নং হেরিসন রোডের বাড়ীতে আদেশ করিলেন যে, তাঁহার ঘরে কোনও স্ত্রীলোক প্রবেশ করিতে পাইবে না। এ বিষয়ে শিষ্যা ও বাহিরের লোক সম্বন্ধে সমান বিধি। ঘরের বাহির হইতে প্রণাম করিতে পারিবে, কেহই চরণ স্পর্শ বা গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যখন এই নিয়ম অব্যাহতভাবে চলিতেছিল, তখন একদিন শীতকালের রাত্রিতে আমরা ৮৷১০ জন মাথায় কাপড় দিয়া গুরুদেবের ঘরে বসিয়া আছি। এক ভদ্রলোক দূরস্থান হইতে গোঁসাইকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি দরজা ঠেলিয়া দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতেছেন দেখিয়া একজন গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি ফিরিয়া যাইতেছেন কেন ? ভদ্রলোকটি বড়ই অপ্রস্তুত হইয়াছেন জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, গোস্বামী মহাশয়ের ঘরে এখন অনেক স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন, খবর না দিয়া তাঁহার (সেই লোকটির) সেখানে প্রবেশ করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। এখন মেয়েরা আছেন, তিনি অন্যসময় আসিয়া

দর্শন করিবেন। আমাদের সেই গুরুভ্রাতাটি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখাইলেন যে, তিনি যাহাদিগকে স্ত্রীলোক মনে করিয়া-ছেন, তাহাদের ঘোমটার মধ্যে অনেকেরই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দাড়ী। ভদ্রলোকটি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন।

এই নিষেধের কথা উল্লেখ করিয়াই গুরুদেব পরলোকগতা মনোরমার নিষ্ঠার প্রশংসা করিয়াছেন। এখানে যে স্থানটিতে যে দরজার কাছে মনোরমা বসেন বলিয়া উক্ত হইল, সেই স্থানটি ও সেই দরজার কথা মনে রাখিতে হইবে।

মনোরমার শ্রাদ্ধের দিন রাত্রে গুরুদেবের আদেশে কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল ঘোষের কীর্ত্তন হইয়াছিল। এই মুকুন্দের কথায় মহাপ্রভুর প্রিয় কীর্ত্তনীয়া মুকুন্দের কথা মনে হয়। গুরুদেব ইঁহার কীর্ত্তন শুনিতে খুব ভালবাসিতেন; ভাগ্যবান্ মুকুন্দও প্রাণের সমস্ত ভক্তি ঢালিয়া দিয়া ঠাকুরকে কীর্ত্তন শুনাইতেন। সে কীর্ত্তনানন্দের কথা বর্ণনা করা যায় না। আজ মুকুন্দের কীর্ত্তন হইতেছে, অধিকাংশ শিষ্য ও শিষ্যাগণ উপস্থিত, তাঁহাদের সে ব্যাকুলতার কি তুলনা হয়? আমি শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনীকে কোলে করিয়া সেই দরজাটির কাছে বসিয়াছি। দরজাটিকে পাশে ও পশ্চাতে রাখিয়া বসিতে হইয়াছে, কেননা, সম্মুখে গুরুদেবের আসন। কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, বেশ জমাট বাঁধিয়াছে, এমন সময় খুকী আমার কোলে থাকিয়া উল্‌টা দিকে সেই দরজার পানে দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া হাসিতে লাগিল, স্পষ্ট বুঝা গেল, সে কাহারও কোলে যাইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "খোকনা, অমন করিতেছ কেন?" বালিকা বলিল,—"মা-যে।"

ঠিক বোধ হইল যেন বালিকা মায়ের কোলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। যে দিকে সে হাত বাড়াইয়া দিয়াছে, সেটি ঠিক সেই স্থান, মনোরমা বসেন বলিয়া গুরুদেব যে স্থানটিকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে দিকে বড় রাস্তা, সেখানে অন্য কোনও লোক বসে নাই। আমার সম্মুখে প্রবীণবয়স্ক একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু বসিয়াছিলেন, খুকীর অবস্থা দেখিয়া ও কথা শুনিয়া তিনি মনোরমার উদ্দেশে মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। সত্যই তাঁহার আবির্ভাব অনুভব করিলেন।

সেই দিন কীর্ত্তনের মধ্যে একজন শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা ও শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বৃদ্ধা জননী প্রভৃতি অনেকে খোলাচক্ষে মনোরমাকে দেখিয়াছিলেন।

আর একটি ঘটনা

উমেশ বাবুর সহধর্ম্মিণী জ্ঞাতি সম্পর্কে আমার ভাইঝি, ধর্ম্ম সম্পর্কে গুরু-ভগিনী, স্নেহাস্পদা শ্রীমতী সরলা আমাদের কনিষ্ঠা কন্যাটির ভার লইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামী স্ত্রী সর্ব্বপ্রযত্নে স্নেহ ঢালিয়া দিয়া উহার লালনপালন করিতেছিলেন। একদিন সরলা দিনের বেলায় কন্যাটিকে মশারির মধ্যে ঘুম পাড়াইতেছেন, এমন সময় কি এক দৃশ্য দেখিলেন এবং তাহা দেখিয়া শ্রীমতী একেবারে অভিভূত হইয়া গেলেন, তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল, গণ্ডস্থল অশ্রুধারায় প্লাবিত হইতেছিল, কথা বলার শক্তি ছিল না। কতক্ষণে সুস্থির হইয়া বলিলেন যে,

একটা জ্যোতির্ম্ময় দেহ মশারির মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। পরে দেখিলেন, তাঁর খুড়ী'মা অর্থাৎ মনোরমা। সরলা বলিয়াছেন যে, এই ঘটনা হইতে তিনি তাঁহার প্রতি মনোরমার বিশেষ স্নেহ অনুভব করিয়া আসিতেছেন।

শ্রাদ্ধক্রিয়া

আমি ব্রাহ্ম-সমাজে কোনও অনুষ্ঠানই করি নাই এবং কয়েক বৎসর হইতে হিন্দুমতেই চলিতেছি। প্রেততত্ত্বের আলোচনায় পরকালের একটা বিশিষ্ট ছায়া আমার প্রাণে পড়িয়াছে, তাহাতে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকর্ম্ম উড়াইয়া দেওয়ার উপায় নাই। আরও কতগুলি কারণে ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি রীতির প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় এখন আমার টান ছিল না। আমি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শ্রাদ্ধ কি প্রণালীতে হইবে?" তিনি বলিলেন, "এ সকল সামাজিক বিষয়ে নিজের রুচি অনুরূপ কার্য্য করাই ভাল।" এই সকল ব্যাপারে তিনি কখনই কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। আমি বলিলাম, "মনোরমার আত্মার যাহাতে কল্যাণ হয়, সেইরূপই করা কর্ত্তব্য।" গুরুদেব বলিলেন, "তাঁহার আত্মার কল্যাণ আপনাদিগকে করিতে হইবে না, তাহা তিনি নিজেই করিয়া গিয়াছেন।" সতীশ বাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "এমনটি কোটিতে গুটি হয়, এক সময় এমন জুটি আসে না।" একটু জোর দিয়া বলিলেন, "সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া

কেহ এইরূপ আর একটি বাহির কর দেখি?" আমি বলিলাম, "আমার সংসারে থাকিয়া নানা কার্য্যে তিনি সমাধিতে বসিতে পারেন নাই, এখন নিরাপদে বসিতেছেন।" গুরুদেব বলিলেন, "আপনারা তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, বসা না বসা তাঁহার পক্ষে সমানই ছিল।" এই কথা শুনিয়া শ্রীমান্ রেবতীমোহন বলিলেন, তিনি কতবার (অবশ্য শেষকালে) মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, না বসিতে পারিয়া তাঁহার কোনও ক্ষতি হয় কি না? মনোরমা বলিয়াছেন যে, কোনও ক্ষতি হয় না। গুরুদেব বলিলেন, "মনোরমা সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে সংসার করিয়াছেন, কিছুতেই তাঁহার বাসনা ছিল না।"

হাজারীবাগের ভক্তবর সর্ব্বজনপূজ্য পণ্ডিত অক্ষয়বট বলিয়াছেন, "তিনি (মনোরমা) শ্রীমতীর চরণে গিয়াছেন, তিনি শ্রীধামে শ্রীমতীর নিত্যলীলার সহচরী হইয়াছেন। ব্রজগোপীর অংশে তাঁহার জন্ম, পুনঃ ব্রজে গিয়াছেন। প্রভু গৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহার শ্রাদ্ধে দেবতারা আসিবেন। নরলোকের এ ক্রিয়ার সহিত বড় সম্পর্ক নাই।" এই সকল কথা শুনিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "এ সকল কথা ঠিকই।" এই সকল কথা সেই সময়ের চিঠিপত্র হইতে সঙ্কলিত হইল।

ইহার পরে আর একটি গুরুভ্রাতা (বোধ হয় মণিবাবু) ঠাকুরকে জানাইলেন যে, কি ভাবে শ্রাদ্ধ হইবে, তাহা আপনাকেই আদেশ করিতে হইবে, ইহাই মনোরঞ্জন বাবুর ইচ্ছা। শুনিয়া গুরুদেব বলিলেন, "শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হিন্দুমতে হইবে।"

সধবা স্ত্রীলোকের শ্রাদ্ধে "চন্দনধেনু" করিতে হয়। আমার জেঠতাত ভাই শ্রীমান্ সারদাকান্ত গুহঠাকুরতা এই কাজের জন্য একটি

সবৎসা গাভী ক্রয় করিলেন। আমার জেঠামহাশয় ৺চন্দ্রমোহন গুহঠাকুরতা আমার পিতা ঠাকুরের জ্যেষ্ঠসহোদর ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা, আমরা সহোদর ভাই ভগিনী দুইটি। বাল্যকালে আমার পিতার পরলোক হইলে আমরা সমস্ত ভাই-ভগিনীগুলি আপন ভাই-ভগিনীর মতন ছিলাম। আমার জ্যেষ্ঠ ৺ বৈকুণ্ঠচন্দ্র গুহঠাকুরতা ও আমার কনিষ্ঠ শ্রীমান্ সারদাকান্ত গুহঠাকুরতা এবং আমি, আমরা এই তিনজন যে সহোদর ভাই নহি, তাহা গ্রামের লোকেরাও সকলে জানিত না। আমাদের তিন জনের আচার-ব্যবহার ও স্নেহ ভালবাসা সহোদর ভ্রাতার মতনই ছিল। জেঠাই-মা আমাকে সন্তানের মতনই স্নেহ করিতেন। শ্রীমান্ সারদাকান্ত কলিকাতার দক্ষিণে ক্যানিং টাউন (মাতলা) নামক স্থানে সুবিখ্যাত জমিদার পোর্টক্যানিং কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করেন। তিনি আমায় লিখিলেন যে, ৩০৲ টাকা মূল্যে তিনি একটা সবৎসা গাভী ক্রয় করিয়াছেন। কয়েক দিন পরে জানাইলেন যে, বাছুরটি মরিয়া গিয়াছে, নূতন সবৎসা গাভী ওখানে মিলিতেছে না, গাভী কিনিতে তিনি ৩০৲টি টাকা পাঠাইলেন। শ্রদ্ধাস্পদ কর্ম্মঠ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় সেই টাকা লইয়া গাভী কিনিতে বাহির হইলেন। এত অল্পমূল্যে সবৎসা গাভী না পাইয়া তিনি ফিরিয়া আসিতে রাস্তায় এক গৃহস্থ বাড়ী বিশ্রাম করিতে বসিয়া তাহার একটি সবৎসা গাভী দেখিলেন, এক কথায়ই ৩০৲ টাকা দরে গাভীটি কেনা হইল। ছোট্ট গাইটি, দিব্য বাছুরটি, একসের দুধ হয়।

লোকেরা কথায় বলে, "ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ," অর্থাৎ সে শ্রাদ্ধে

কে কোথা হইতে কি জোগায়, কিছুরই ঠিক নাই। দৃষ্টান্তটা ভাল কি মন্দ, জানি না, কিন্তু মনোরমার শ্রাদ্ধকার্যে যে কোথা হইতে কি আসিতেছিল, কে টাকা জোগাইতেছিল, তাহার আমি খবর রাখিনা। "ডন" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গুরুদেবকে বলিলেন যে, যাহাতে ভালরূপ খাওয়া-দাওয়া হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। গুরুদেব সে ইচ্ছার অনুমোদন করিলেন, বোধ হয়, নিমন্ত্রণের অধিকাংশ খরচই সতীশবাবু দিয়াছেন। কতক টাকা যোগজীবন দিয়াছেন, আর কোনও খবর জানি না।

গঙ্গাতীরে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে শ্রাদ্ধ হইল। শ্রাদ্ধটি যাহাতে বিশুদ্ধ হয়, ছেলেরা এবং আমি সেই সকল আচরণ করিলাম। শ্রাদ্ধক্ষেত্রে আমার মাতুলালয়ের একজন বিশেষ আত্মীয় এবং একজন সাধু হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই হিন্দুস্থানী সাধুটি দেওঘরে কয়েকদিন আমাদের বাড়ী ছিলেন, মনোরমাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রোগ অবলম্বন করিয়া মা দেহত্যাগ করিলেন?" ওলাউঠার কথা শুনিয়া বলিলেন, "পেটের অসুখে মৃত্যুই সাধুদের বাঞ্ছনীয়, কেননা, উহাতে জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না।" আমি বলিলাম, "এ দেশে ওলাউঠায় মৃত্যুকে লোকেরা অপমৃত্যু মনে করে।" তিনি যাহা বলিলেন, তাহার অর্থ এই যে, এই ব্যাধিতে অল্পসময়ের মধ্যে মৃত্যু হয় এবং ইহা অভিনব ব্যাধি, এই জন্যই লোকের এইরূপ কুসংস্কার জন্মিয়াছে।

যখন আমরা শ্রাদ্ধস্থানে বসিলাম, তখন মনে হইতে লাগিল যেন, সে গৃহে পরকালের লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। বস্তুতঃ একটি

অসাধারণ গাম্ভীর্য্য ও বিশ্বাসের আবির্ভাব হইয়াছিল। পুরোহিত বলিলেন, "গোমূত্রায় নমঃ", তখনই গাভীটি মূত্র বিসর্জ্জন করিল, পুরোহিত তাহা দেখিয়া বলিলেন, "সকলই যেন সত্য বলিয়া মনে হইতেছে।"

যথারীতি শুদ্ধতার সহিত শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইল, ঘাটে এতই অল্পসংখ্যক কাঙ্গালী ও অগ্রদানী উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে ক্লেশ পাইতে হইল না। আমার ভয় হইয়াছিল যে, গঙ্গার ঘাটে শ্রাদ্ধ, সুতরাং এতই কাঙ্গালী ও যাচক উপস্থিত হইবে যে, আমাদিগকে পলাইয়া আসিতে হইবে। কিন্তু তাহা না হওয়ায় এবং সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে পারায় আমাদের মনে যথেষ্ট প্রসন্নতা জন্মিয়াছিল। বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কেহ এই শ্রাদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ

আমাদের সমস্ত গুরুভাই-ভগিনী এবং বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় ও অন্যান্য অনেক ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। কে কাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, আমরা কিছুই জানি না।

শ্রীশ্রীগুরুদেব নিজেই উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন, যোগজীবনকে বলিলেন, আলুপটল প্রভৃতি তরকারী আনাও। যোগজীবন বলিলেন, মণিবাবু সমস্ত কিনিতে গিয়াছেন, তথাপি বলিলেন, "তরকারীর জন্য আরও টাকা দেও।" ঠাকুর শৌচাগার হইতে বলিয়া

পাঠাইলেন, "ঘি বদলাইয়া আরও ভাল ঘি আনিতে হইবে।" বাজারে যতদূর উৎকৃষ্ট ঘি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই আনীত হইয়াছিল। ২০ বৎসর পূর্ব্বে ৪৫৲টাকা দরে খুব ভাল ঘি পাওয়া যাইত, কিন্তু ঠাকুর বলিলেন, "ঘি বদলাও।" তখন শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বহু অনুসন্ধান করিয়া ৫৫৲ টাকা দরে চন্দ্রকোণার উৎকৃষ্ট ঘি আনিলেন। তিনি গুরুদেবকে বলিলেন যে. তাঁহার পরিচিত কোন ভদ্রলোক যজ্ঞ করার জন্য এই ঘৃত কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি অনেক তদ্বির করিয়া উহা পাইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া গুরুদেব বলিলেন, "ইহাই (মনোরমার শ্রাদ্ধই) খুব বড় যজ্ঞ।"

এই শ্রাদ্ধকার্য্যে ঠাকুর এমনই আগ্রহ দেখাইলেন যে, দিদিমা (গোস্বামী মহাশয়ের শাশুড়ী ঠাকুরাণী) বলিলেন যে, জীবনে কখনও কোন সাংসারিক কাজে তিনি (গুরুদেব) এরূপ আগ্রহ দেখান নাই। সত্য সত্যই তিনি সারাদিন সমস্ত কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং কোনও রূপে যাহাতে কোনও কার্য্যে বিশৃঙ্খলা না ঘটে, তদনুরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

আহারাদি এমনই পরিপাটীরূপে হইল যে, সকলের মুখেই একই কথা, "এমন তৃপ্তির সহিত আহার প্রায়শঃ ঘটে না।" ভক্ত জমিদার ৺রাখালচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী, "স্নেহলতা" "প্রেমলতা" প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িত্রী কুসুমকুমারী দেবী আমাকে বলিলেন যে, "এমন নিখুঁত ভাবে কার্য্য হইয়াছে, এবং সকলেই এমন পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন যে, দেখিয়া আশ্চর্য্যবোধ হয়।" মনোরমার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ইহার অন্যতম কারণ হইতে পারে, কিন্তু এমন লোকও

ছিল, যাহারা মনোরমাকে জানিত না, তাহারাও পূর্ণ-তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। কলিকাতায় শ্রাদ্ধাদিতে কাঙ্গালী এবং রবাহূতদিগকে পরিতৃপ্ত করা ধনী লোকেরও সাধ্যাতীত কার্য্য, কিন্তু এ ক্ষেত্রে এইটুকুই সৌভাগ্য যে, শ্রাদ্ধস্থানে কিংবা নিমন্ত্রণে এমন ভিড়ই হইল না, যাহাদিগকে তৃপ্ত করা অসম্ভব ছিল। মনে হইল যেন কেহ আমাদের টাকার তহবিল ও খাদ্য-ভাণ্ডার দেখিয়া শুনিয়া হিসাব করিয়া যতগুলি লোককে পরিতৃপ্ত করা যাইবে, ততগুলি লোকের আমদানী করিয়াছেন। গঙ্গার ঘাটে কিংবা নিমন্ত্রণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কেহই ফিরিয়া নিরাশ হইয়া যায় নাই। এই সামান্য ঘটনাটি আমার প্রাণের উপর অসামান্য কার্য্য করিয়াছিল। যিনি জীবনে কখনও যাচককে নিরাশ করেন নাই, তাঁহারই শ্রাদ্ধকার্য্যে যদি কেহ চাহিয়া না পাইত, তবে আমার প্রাণে খুবই ক্লেশ হইত। কলিকাতার মতন স্থানে রবাহূতদিগকে পরিতৃপ্ত করা কিরূপ অবস্থার লোকের সাধ্যায়ত্ত এবং আমরা কিরূপ অবস্থায় লোক, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেলে গুরুদেব বলিলেন, "মনোরমা নিজে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত সুসম্পন্ন করিলেন।" আমরা অবিশ্বাসী, এ কথাটা কি বুঝিতে পারিব?

শ্রাদ্ধের দিন রাত্রে কীর্ত্তনের মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল সে বিষয় পূর্ব্বেই অন্যপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি।

ফরিদপুরে

শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপ্ত হইলে পুত্র-কন্যাগণকে ফরিদপুরে মনোরমার ভ্রাতার নিকট লইয়া গেলাম। তারকবাবু সেখানকার কালেক্টরীতে কার্য্য করিতেন। কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার সততার জন্য তিনি ফরিদপুরে সকলের নিকটই সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না, কিন্তু তাঁহার সততা দেখিয়া লোকেরা বলিত, "দাতা কালীকুমারের পুত্র, এমন হবেন না কেন?" তারকবাবু ভগিনীশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব মনোরমার মতই অত্যন্ত চাপা ছিল, ভালবাসা সর্ব্বত্রই খাঁটি ও গভীর ছিল। ভগিনীর পুত্রকন্যাগণকে তিনি নিজ সন্তানের মতনই গ্রহণ করিলেন। তাঁহার জেঠাই-মা মনোরমার শোকে অধীর হইয়াও তাঁহার পুত্রকন্যাগণের জন্য প্রাণপণ খাটিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্তা কুমুদিনীও যথাসাধ্য ইহাদের যত্ন করিলেন। কিন্তু হাজার হইলেও মা'য়ের অভাব কেহই পূরণ করিতে পারে না। এ জগতে মা নামের তুলনা নাই। সেই বিপদের সময় তারকবাবুর মতন মাতুলের আশ্রয়ে না থাকিলে সন্তানগণকে লইয়া আমাকে সর্ব্বদা বিব্রত হইতে হইত।

দেওঘরের ভৃত্য লালুয়া ও স্নেহভাজন শ্রীমান্ বেণীমাধব ছেলেদের সঙ্গে ফরিদপুরে ছিল। বৈদ্যনাথের লোক লালু রাউত, অস্বাস্থ্যকর ফরিদপুরে অনভ্যস্ত জলকাদা ভাঙ্গিয়া যে ভাবে কাজ করিয়াছে,

শুধু চাকুরীর জন্য তাহা করে নাই। 'লালু পণ্ডিত'কে মনোরমা যে স্নেহ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়া তাঁহার সন্তানগণের জন্য সেই অশিক্ষিত ভৃত্য কোনও ক্লেশকেই ক্লেশ জ্ঞান করে নাই। লালুর সাংসারিক অবস্থা এমন ছিল না, যাহাতে ভৃত্যের কাজ করিবার জন্য তাহার ফরিদপুর যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। শ্রীমান্ বেণীমাধব মনোরমাকে 'মা' বলিত, মনোরমাও তাঁহার পত্রাদিতে "তোমার মা মনোরমা" লিখিয়া সহি দিতেন। বেণীমাধব যেরূপ ভক্তি-পূর্ণ হৃদয় লইয়া মনোরমার সেবা করিত, সেইরূপ স্নেহপূর্ণ হৃদয় লইয়াই সন্তানগণের লালন-পালন করিতে লাগিল, ছেলেরাও তাহাকে আপনাদের ভ্রাতা ও পরম আত্মীয় বলিয়া মনে করিত, তখন ইহাদের যত্ন ও আদর করা ভিন্ন তাহার অন্য কোনও কাজ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

একটি অদ্ভুত ঘটনা

ছেলেদিগকে ফরিদপুরে রাখিয়া আমি আমার কার্য্যস্থলে (মুঙ্গের জেলায় এক অরণ্য প্রদেশে) গেলাম, কেননা, মনোরমা চলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে খরচ কিছুই কমে নাই; আমি গৃহশূন্য হইয়াছি, কিন্তু গৃহস্থালী আমাকে ছাড়ে নাই। পেটের দায়ে মানুষের শোক করার সময় থাকে না, আমারও ছিল না। কার্য্যক্ষেত্রে গিয়া দেখিলাম, প্রতিদিন লোকসান পড়িতেছে এবং অল্পদিনেই তহবিল

শূন্য হইবে। স্থির করিলাম, কাজ বন্ধ করিয়া দিব, কুলীদিগকে সে কথা বলিয়া দেওয়া হইল। পরের দিন সকালবেলায় কুলীরমণীগণ ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলিকে বুকে করিয়া আসিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল, এবং সজল নয়নে বলিল, "বাবা, কাজ বন্ধ করে দিবি, এই সকল বুতরু (শিশু) যে না খে'য়ে মর্‌বে।" আমি একবার তাহাদের জীর্ণবস্ত্র, শীর্ণকায় ও সজল-চক্ষের দিকে তাকাইলাম, মনে করিলাম, যে কয়টি টাকা হাতে আছে, তাহা ইহাঁদিগকে দিতে হইবে। কেননা, টাকা হাতে থাকিতে আমি ইহাদিগের উপবাস দেখিতে পারিব না, সুতরাং কাজ চলিতে থাকুক, হাজার টাকা লোকসান হইতে হইতে অনেকবার টাকাটা ঘুরিবে এবং তাহাতে যতদিন ইহারা খাইতে পাইবে, টাকাগুলি দান করিলে ততদিন চলিবে না। এই ভাবিয়া কাজে আসিতে হুকুম দিলাম ; কিন্তু পরদিন হইতে আর লোকসান হইল না।

এইখানে একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা বলিব। ফরিদপুর হইতে আমার নিকট পত্র আসিল যে, আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দেবরঞ্জন (টুলু) অত্যন্ত অসুস্থ, অবিলম্বে তাহাকে দেখিতে যাওয়া কর্ত্তব্য। আমি ভাবিলাম, এইরূপ সময় এত দূরদেশ হইতে কাজকর্ম্ম ফেলিয়া আমাকে যাইতে যে তাড়া দিয়াছে, ইহা কখনই সামান্য কারণে নহে। আমি অবিলম্বে ফরিদপুর রওয়ানা হইলাম। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম, ছেলেটির জীবনের আশা মোটেই নাই। প্লীহা ও যকৃৎ পেট ভরিয়া আছে, তাহার উপর দ্বৈকালীন জ্বর, দুইবেলাই বিরামের পর উগ্র জ্বর চলিয়াছে। স্থানীয় চিকিৎসকগণের দ্বারা সকল প্রকারের চিকিৎসাই যথাসাধ্যরূপে করা হইয়াছে, কিছুতেই কিছু হইতেছে না।

ছেলেটি একেবারেই অস্থিসার হইয়াছে, ধুক্ ধুক্ করিয়া বুকটি নড়িতেছে, ইহাই জীবনের চিহ্ন, প্রতিক্ষণেই সে ধুক্ ধুকী থামিবার সম্ভাবনা। আমি স্থধু শেষ অবস্থার প্রতীক্ষায় সেখানে রহিলাম।

যোগরঞ্জন আমাদের চতুর্থ পুত্র, বয়স ৭ বৎসর, সে একদিন দৌড়াইয়া আসিয়া আমাকে বলিল, "বাবা, আমি আমগাছের কাছে বসিয়াছিলাম, সেখানে মা আসিয়া দেখা দিলেন।" দেখিলাম, ছেলের মুখে আনন্দ ধরে না। আমি তাহাকে উৎসাহ দিলাম। দিনের মধ্যে সে অনেকবার ছুটিয়া ছুটিয়া সেই আমতলায় বসিতে যায় আর প্রত্যেক বারেই মাকে দেখার কথা বলে। নানা লোকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল, ছেলে দৃঢ়তার সহিত সেই একই কথা বলিতে লাগিল। এইরূপে দুই দিন গত হইলে, আমি বলিলাম, আমি একটি প্রশ্ন করিতেছি, তাহার উত্তর তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করিবে। আমি জানিতাম, তাহার মা ভিন্ন অন্য কেহই সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে না। বালক দৌড়াইয়া গিয়া আবার বসিল এবং বলিল, "মা এই উত্তর দিলেন।" আমি উত্তর শুনিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, ঠিক্ ঠিক্ উত্তর হইয়াছে। ইহার পরে সে নিজেই বলিল যে, সে তাহার মাকে এখানে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

যদিও আমি প্রেততত্ত্বে অবিশ্বাসী নহি, তথাপি সহজে আমি কিছুই বিশ্বাস করি না। আমি ভাবিলাম, হয়ত এটা ইচ্ছা-সঞ্চার (Thought transference) কার্য্যের ফল। আমার চিন্তা বালকে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাই আমার মনের উত্তরটি বলিতে পারিয়াছে।

কিন্তু ইহার পরে যে ঘটনা ঘটিল, তাহার জবাব কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। ঘটনাটি নিম্নে লিখিতেছি।

শ্রীমান্ বেণীমাধব যোগরঞ্জনকে বলিল যে, "যদি তোমার মা আসেন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, কি করিলে টুলু আরোগ্য লাভ করিবে?" বালক আবার গিয়া বসিল, কেননা তাহার মাতার আগমন সম্বন্ধে তাহার বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস নাই। এবারে আসিয়া বলিল যে, "মা বলিলেন, 'বাড়ীর কাছে যে নূতন কাঁচা রাস্তাটা হইয়াছে, সেই রাস্তায় টুলুকে কোলে করিয়া সকালে ও সন্ধ্যায় (কতবার ঠিক্ মনে নাই) বেড়াইলেই সে আরোগ্য লাভ করিবে।" আমরা কেহই কথাটায় আস্থাস্থাপন করিতে পারিলাম না, ভাবিলাম, ইহা বালকের কল্পনা মাত্র।

সেই দিনই বিকালবেলায় এবং পরের দিন সকালবেলায় শ্রীমান্ বেণীমাধব, টুলুকে কোলে করিয়া সেই রাস্তায় বেড়াইল। দ্বিতীয় দিন বিকালবেলায় ছেলেটির জ্বর হইল না এবং তৃতীয় দিবস হইতে জ্বর একেবারেই বন্ধ হইল। এক সপ্তাহের মধ্যে বালকের প্লীহা-যকৃৎ কমিয়া গেল এবং অল্পদিনেই সে আরোগ্য লাভ করিল। এই সকল দিনের মধ্যে তাহাকে কোনও ঔষধই খাওয়ান হয় নাই।

আমাদের বাড়ীতে অনেকগুলি যুবক, প্রৌঢ় ও একজন বৃদ্ধা ছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই এখনও জীবিত আছেন এবং এই ঘটনা সকলেরই মনে আছে। ইহাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

বালকটিকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত দেখিয়া আমি আবার কার্য্যস্থলে চলিয়া গেলাম।

মনোরমার দেহত্যাগের পরে অনেকে অনেক ভাবে তাঁহার আবির্ভাব অনুভব করিয়াছেন, সে সকল কথা বলিতে চাহি না।

কন্যাটি কে ?

এই সঙ্গে আরও একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পাঠক জানেন যে, মনোরমাকে যাঁহারা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, প্রায় সকলেই তাঁহার সঙ্গে একটী কন্যা দেখিয়াছেন। আমরা মনে করিতাম যে, আমাদের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী (খোকনা) ওলাউঠা রোগের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া আমাশয় ও অজীর্ণ প্রভৃতি পেটের অসুখে ভুগিয়া ভুগিয়া অস্থিসার হইয়াছিল, বোধ হয়, তাহার মাতা তাহাকেই লইয়া যাইবেন। ছোট মেয়েটি খুবই সুস্থ সবল, তাহার সম্বন্ধে কখনই কোনও আশঙ্কা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। তাহার মাতার দেহত্যাগের সময় তাহার বয়স ছিল ১৪।১৫ মাস, এই বালিকায়, মুখে ভাত দেওয়ার ও নাম রাখার কথা শ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "এখন দরকার নাই।" এত বড় মেয়ের মুখে ভাত দিতে ও নাম করিতে কেন মানা করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। এই মেয়েটির মশারির মধ্যেই শ্রীমতী সরলা জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে মনোরমাকে দেখিয়াছিলেন। ফরিদপুরে একদিন বেণীমাধব এই মেয়েটিকে কোলে করিয়া শুইয়াছিল, সে দেখিল, মনোরমা উহার কাছে বসিয়াছেন, এবং বলিলেন, "উহার জন্য আমি

স্থান করিয়াছি।” আর একদিন মনোরমার জেঠাইমা দেখিলেন, মনোরমা এই কন্যাটিকে চাহিতেছেন, জেঠাইমা রাগ করিয়া বলিলেন, “কেন ওকে নিবি? নিজে গিয়েছিস্, আবার ওকেও নিবি?” এই দুইটি দর্শন স্বপ্নে কি জাগ্রতে হইয়াছে, বিশেষভাবে বলা যায় না। দর্শনকারীরা বলেন, তাঁহারা স্পষ্টই দেখিয়াছেন।

ইহার কিছু দিন পরে একটু সামান্য সর্দ্দি হইয়া মেয়েটি দেহ-ত্যাগ করিল। এই আমার সর্ব্বপ্রথম সন্তান-শোক, বিশেষতঃ এই কন্যাটি মনোরমার শেষ সন্তান, দেখিতেও অনেকটা তাঁহারই মত, ইহার শোকে আমার ব্যাকুল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু শ্রীগুরুদেব তাঁহার শক্তিপ্রভাবে এমন কৌশল করিয়া আমার হৃদয়কে অধিকার করিলেন যে, আমার প্রাণে শোকের উৎপত্তিই হইল না। এই অধমের জীবনে ঠাকুর আরও এইরূপ কৃপা দেখাইয়াছেন, নতুবা আমার কি দশা হইত বলিতে পারি না।

দেহত্যাগের পরে মনোরমার এইরূপ আনাগোনা যদি সত্য হয়, তবে তাঁহার জীবন্মুক্ত, অনাসক্ত অবস্থার সঙ্গে মিলাইতে গিয়া কাহারও মনে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু আমি সত্য ঘটনা লিখিতে বাধ্য, মিলাইয়া লিখিতে ইচ্ছা করি নাই।

মনোরমার জীবনে কি দেখিলাম ?

১। ধর্ম্ম একটি সত্য বস্তু, উহা কল্পিত জিনিস নহে। সাধনপথেই সত্য প্রকাশিত হয়, অজ্ঞাত, অচিন্তিত তত্ত্ব আপনি ফুটিয়া উঠে।

২। সমাধিটি মূর্চ্ছার অবস্থা নহে এবং হঠযোগের ফল নহে।

৩। নামানন্দে মানুষের নখ হইতে কেশাবধি পরিপূর্ণ হয়, হৃদয়-মন পরিপূর্ণ হয়, সে আনন্দের তুলনা নাই। সে বিশুদ্ধ আনন্দে সমস্ত ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হইয়া যায়, সমস্ত প্রবৃত্তিগণ একমুখো হয়, সমস্ত শরীর-মন সেই একেই আত্মসমর্পণ করে।

যাঁহারা মনে করেন যে, একটা যে কোনও বিষয় ভাবিতে ভাবিতে একাগ্রতা জন্মিতে পারে, ইহাতে ভগবানের নামের বিশেষ মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় না। তাঁহাদের কথার উত্তর এই যে, অধিকাংশ লোকই টাকা ভালবাসে, অনেকে খুবই ভালবাসে কিন্তু সেই অর্থপিপাসু ব্যক্তি যদি সারারাত্রি বসিয়া "টাকা টাকা" বলিয়া টাকার নাম জপ করে, তাহাতে তাহার কি এমন আনন্দ হয় যে, সেই আনন্দসাগরে ডুবিয়া সে ব্যক্তি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া দিবারাত্রি একাসনে কাটাইতে পারে? পরন্তু টাকার চিন্তায় ক্রমশঃ তাহার উদ্বেগ বাড়িয়া যাইবে, হয় ত অল্পক্ষণ পরে মাথায় অডিকলম মাখিয়া পাথার বাতাস দিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িবে অথবা সারারাত্রি অনিদ্রায় কষ্ট পাইবে। টাকার নাম জপ করিয়া, টাকার চিন্তা করিয়া তাহার মাথা ঠাণ্ডা হইবে না এবং

আনন্দসাগরে ডুবিয়া তাহার সমাধি হইবে না। সুধু ভগবানের নামেরই এই গুণ আছে, অন্যের নাই।

প্রবল বিষয়াসক্ত লোকেরা একটা মোকদ্দমার বিষয় চিন্তা করিয়া বিপক্ষকে কিরূপভাবে পরাজয় করিবে তাহার ফন্দী খুঁজিয়া অনিদ্রায় রাত্রি কাটাইতে পারে কিন্তু আনন্দে সমাধিস্থ হইতে পারে না।

সমাধি ত বড় কথা, ভগবানের নাম শ্রবণ করিয়া অনেক ঘোর বিষয়ীর বিষয়বন্ধন অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য শিথিল হয়, সে অতুল আনন্দ লাভ করে। এই আনন্দ কোথা হইতে আসিল? ভগবানের নাম করিলে খাওয়া-পরা জুটে না, নোট-কাগজের মতন উহা ভাঙ্গাইয়া প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ করা যায় না, উহাতে জয় নাই, যশ নাই, তবে উহার চিন্তায় আনন্দ হয় কেন?

৪। মনোরমা সমাধির নামও জানিতেন না, সাধকের যে এই-রূপ একটা অবস্থা হইতে পারে, তাহার কোনও খবরই রাখিতেন না। প্রথম দিবসের ৬ ঘণ্টা সমাধির পর তিনি নিজেই নিজের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন না যে, কি হইল? সুধু বলিলেন, গুরুদত্ত নাম তাঁহাকে আনন্দ-সাগরে ডুবাইয়া রাখে। এই অবস্থা-লাভের এক বৎসরের মধ্যে তিনি বলিলেন, তাঁহার কামপ্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তখনও আমরা ব্রাহ্ম-সমাজে, সে সমাজে তখন সমাধির কথা দূরে থাকুক, গভীর ধ্যান-ধারণারও তেমন আদর ছিল না। ব্রাহ্ম-সমাজে ধ্যানীর অপেক্ষা বিদ্বান্ ও বক্তাদিগের আদর বেশী ছিল। যখন ব্রাহ্মিকা-সমাজে উপাসনায় যোগদান করিতেই মনোরমার সমাধি হইত, তখন তিনি আপনাকে সেই অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন না,

সমাধিভঙ্গের পরে যখন দেখিতেন যে, অনেক মহিলা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন, তখন তিনি লজ্জিত হইতেন। কখনও কখন এরূপ স্থলে যাহাতে তাঁহার সমাধি না হয়, সেইরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গীত কিংবা ভগবানের নাম শুনিলেই তাঁহার অন্তরস্থ নাম অপ্রতিহত বেগে চলিতে থাকিত এবং তাঁহাকে সমাধির অবস্থায় পৌছাইয়া দিত। নামটী কি চমৎকার পাওয়া! "শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন, ক্ষুধা যেমন পায়, তৃষ্ণা যেমন পায়, উপাসনাও সেইরূপ পায়। ভূতে যেমন ধরে, ধর্ম্মও সেইরূপ ধরে, তখন আর সাধকের কিছুমাত্র স্বতন্ত্রতা থাকে না, ধর্ম্মই তাঁহাকে পরিচালিত করে"। মনোরমার জীবনে এই সমস্ত প্রত্যক্ষ হইয়াছিল।

৫। শ্রীশ্রীগুরুদেব পর পর যে সকল অবস্থা ঘটিবার কথা বলিলেন, মনোরমা তাহা শুনেন নাই ; কিন্তু অবিলম্বেই তাঁহার সেই সকল অবস্থা ঘটিতে লাগিল। আর, শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছিলেন—"যাহা সত্য, তাহা নিত্য, বীজ হইতে অঙ্কুর একবার বাহির হইলে উহা যেমন আর বীজে প্রবেশ করে না, সেইরূপ সত্যবস্তু একবার উৎপন্ন হইলে আর বিনষ্ট হয় না, কেন না, যাহা সত্য, তাহা নিত্য।" মনোরমার জীবনে এই সত্য সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(ক) যে দিন (দীক্ষাপ্রাপ্তির দিনই) সমাধিস্থ হইলেন, সেই দিন হইতে ভগবানের নাম করিতে বসিলেই অথবা ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তন শুনিলেই সমাধি হইত। এই সময় ইচ্ছামাত্রই সমাধি হইত কিন্তু ইচ্ছা করিয়া সমাধির হাত এড়াইতে পারিতেন না।

(খ) দ্বিতীয় অবস্থায় সমাধি ইচ্ছাধীন হইল। ইচ্ছা করিলেই

সমাধিস্থা হইতেন কিন্তু ইচ্ছা না করিলে হইতেন না। এই সময় কবীর সাহেবের ভাষায় নামের "চোট" সহ্য করার শক্তি জন্মিল। উপাসনা ও কীর্ত্তনে যোগ দিতেছেন, কিন্তু নিজে অসামাল হইতেছেন না, অথচ যে দিন ইচ্ছা করিতেছেন, সে দিন সমাধিস্থা হইতেছেন।

সমাধি যে দিন ইচ্ছাধীন হইল অর্থাৎ অনিচ্ছায় হইতে পারিল না, সেই দিন হইতে সে অবস্থার কখনও পরিবর্ত্তন হইল না, অর্থাৎ উপাসনা কিংবা কীর্ত্তনাদিতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমাধি হইত না, অথচ সহজ অবস্থায়ই সমাধির সুখভোগ ও ফলভোগ করিতেন। "এই সহজ অবস্থা" সমাধির পরের অবস্থা, আমাদের মতন চলাফেরাকে "সহজ অবস্থা" বলে না।

(গ) সমাধির মধ্যে প্রথম যে দিন চক্ষু হইতে জলধারা অনর্গল প্রবাহিত হইল, সেই দিন হইতে চিরকালই সমাধির অবস্থায় সেইরূপ অশ্রুধারা বহিয়াছে, একবারের জন্যও উহা বন্ধ হয় নাই। (১ম খণ্ডে)

(ঘ) নারায়ণগঞ্জে যে দিন ৩২ ঘণ্টা সমাধির মধ্যে আত্মায় ভগবানের স্পর্শ ও হৃদয়ে তাঁহার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিলেন, "আজ মনে হইল, ভগবান্ আমাকে বুকে করিয়া আছেন" এই অবস্থা যে দিন হইল, শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছিলেন "এই আনন্দ (নামানন্দ) চুষিয়া চুষিয়া আত্মা নিষ্পাপ হবে, তখন 'সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' আপনি প্রাণে প্রকাশিত হইবেন," যে দিন নারায়ণগঞ্জে এই অবস্থা লাভ হইল, সেই দিন হইতে সমাধির মধ্যে কখনও এই অবস্থা অপ্রকাশিত থাকে নাই। (১ম খণ্ডে)

(ঙ) ২৪ বৎসর বয়সে যে দিন বলিলেন যে, "কামপ্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে," সেই দিন হইতে আর কখনও উহার উদয় হয়

নাই। (১ম খণ্ডে) শুনিয়াছি, কামপ্রবৃত্তি অবরুদ্ধ হইলে মানুষের মনে যে অপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হয়, তাহার তুলনা নাই। নামানন্দ চুষে চুষে আত্মা নিষ্পাপ হয়, তখন হৃদয়টি পবিত্র মন্দির হয়; সেই মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টার নাদরূপ ওঙ্কারধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ছয়রিপুর বলিদান হয়। তখন হৃদয়মন্দিরে নিত্যানন্দ নিত্যোৎসব চলিতে থাকে। মনোরমার হৃদয়ে এই উৎসব নিরন্তর চলিতেছিল। সাধনপথে একবার যে উচ্চস্তরে উঠিয়াছেন, তাহা হইতে আর কখনও নামেন নাই। যে উচ্চতর অবস্থা একবার লাভ হইয়াছে, তাহা আর কখনও লুপ্ত হয় নাই।

(চ) কামের ন্যায় অন্যান্য রিপুও নষ্ট হইয়াছিল। হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, লোভ এ সকল ত দূরের কথা, কোনও একটা বিশেষ ঘটনা উপ-লক্ষে আমি তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, কাহারও উপর তাঁহার বিরক্তি আছে কি না? তিনি সসঙ্কোচে ধীরে ধীরে আমাকে বলিলেন, "আমি ত টের পাই না।"

(ছ) ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ মহাশয় মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার মনে কখনও শুষ্কতা আসে কি না?" তিনি সলজ্জভাবে আস্তে আস্তে বলিলেন, "টের পাই না।"

(জ) তাঁহাকে লোকেরা শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত, ইহাতে তিনি যে কিরূপ সঙ্কুচিতা হইতেন, আমরা সেইটি দেখিয়া বুঝিতাম যে, তিনি আপনাকে বিন্দুমাত্রও "বিশেষ কিছু" মনে করিতেছেন না।

একদিন শ্রীশ্রীগুরুদেব কথাপ্রসঙ্গে ভক্তশিষ্য ৺রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী

মহাশয়কে বলিলেন, "পাহাড়-পর্ব্বতে ও এরূপ সাধু অল্প আছেন, যাঁহারা যশে একটু উল্লসিত না হন, কিন্তু এই মেয়েটিকে (মনোরমাকে) প্রশংসা করিলে যেন পঞ্চাশ হাত জলের নীচে ডুবিয়া যায়।"

(ঝ) গয়াধামে যে দিন সমাধির মধ্যে প্রথম আত্মদর্শন হইল, যে দিন আমাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসু হইয়া বলিলেন যে, "আমি আজ শরীর হইতে আমাকে (আত্মাকে) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দেখিলাম" সেই দিন হইতে চিরকাল সেই অবস্থা ছিল।

(ঞ) মনোরমা শেষ জীবনে বৈদ্যনাথে একবৎসর ছিলেন, কিন্তু একদিনের জন্যও মন্দিরে যান নাই। আমাদের আত্মীয়স্বজন, গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীগণ, যাঁহাদিগকে মনোরমা শ্রদ্ধা করেন ও ভালবাসেন, তাঁহারা আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া বৈদ্যনাথ দেখিতে গিয়াছেন, পাণ্ডারা কতদিন মাইজীকে মন্দিরে নেওয়ার জন্য আগ্রহ দেখাইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তিনি কখনও মন্দিরে যান নাই। আমরা যে বাবা বৈদ্যনাথের ভক্ত হইতে পারিয়াছি, তাহা নয়, তথাপি আমরা কতবার মন্দির দেখিতে গিয়াছি, ভক্তি না থাকিলেও বৈদ্যনাথ একটী দেখিবার বিষয়, তাহাতেত সন্দেহ নাই। কিন্তু মনোরমা কখনও বৈদ্যনাথদেবকে দেখিতে আগ্রহ করিলেন না এবং অন্য লোকেরা তাঁহাকে যাইবার জন্য আগ্রহ করিলেও দেখিতে গেলেন না। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "তুমি একদিনও ত মন্দিরে গেলে না, কারণ কি?" তিনি বলিলেন "টান্ হয় না।"

মনোরমা দেবদেবীবিদ্বেষী ছিলেন না, তবে সকল কাজই প্রাণের টানে করিতেন, দেখাদেখি ভক্তি করা তাঁহার স্বভাব ছিল না। মন্দিরে

না যাওয়া কার্য্যটি বাহির হইতে দেখিতে গোঁড়া ব্রাহ্ম অথবা খৃষ্টান কি মুসলমানের কাজের মতন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে সেরূপ ভাব মোটেই ছিল না। কোনও প্রকারের গোঁড়ামী দেখানো তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ কার্য্য। বৈদ্যনাথের মন্দিরে না যাওয়ার কথা এবং "টান্ হয় না" এই কথাটা আমি কলিকাতায় যাইয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবকে বলিলাম, তিনি বলিলেন, "মনোরমার পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা, এই অবস্থায় গুরুদর্শন, আত্ম-দর্শন ও ব্রহ্মদর্শন ভিন্ন অন্য কিছু দর্শনে আকাঙ্ক্ষা জন্মে না।" মনোরমার আরাধ্য দেবতা ছিলেন অন্তরে, বাহিরে নহে। সেই অন্তর দেবতার পূজায় তিনি সদাই বিব্রত ছিলেন। "টান্" না হইলে অন্যপূজায় যাইতেন না। যখন বলিতেন "গুরুদেবকে দেখিতে ইহা হইয়াছে, আমরা বুঝিতাম তাঁহার আকাঙ্ক্ষা কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার "টান্" হওয়া কথার অর্থ এই।

৬। নাম-মাহাত্ম্য। মানুষ আপনাকে ঘসিয়া মাজিয়া সম্পূর্ণ ভাল করিতে পারে না, সেরূপ করিতে গেলে ব্যবহারে বিনয়ের ভাবের মধ্যে অহংকার থাকে, সরলতার মধ্যে কৃত্রিমতা থাকিয়া যায়, ব্যবহারে সর্ব্বদা এক ভাব এক রস রক্ষা পায় না, মাঝে মাঝেই চরিত্রের ত্রুটী প্রকাশ পায়। কিন্তু একমাত্র ভগবানের নামই সাধকের জীবনকে নিখুঁত করিয়া গড়িয়া দেয়।

একটী প্রকাণ্ড চাউল কলের এক মুখে ধান ঢালিয়া দিলে কলটী চলিতে থাকে, তখন তুষের স্থানে তুষ, ক্ষুদের স্থানে ক্ষুদ, কুঁড়ার স্থানে কুঁড়ো এবং চাউলের স্থানে ছাটা চাউল অর্থাৎ যাহার যে স্থান তাহাকে সেইস্থানে পৌছাইয়া দেয়। সেইরূপ ভগবানের নাম একটী জীবন্ত-যন্ত্র,

সাধক আপনাকে সেই কলে ফেলিয়া দিতে পারিলে, সেই যন্ত্রই সমস্ত ভাবও কর্ত্তব্যকে যথা স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে। ভগবানে বিশ্বাস ও প্রীতি, জীবে দয়া ও মমতা, পিতামাতায় শ্রদ্ধা ভক্তি, পতিপত্নীতে প্রেম, ভ্রাতা-ভগিনীতে ভালবাসা, সন্তানগণে স্নেহ, প্রতিবেশীর প্রতি সদাচার ইত্যাদি যেখানে যাহা দরকার, নাম-যন্ত্রই সেই স্থানে তাহা পৌঁছাইয়া দিবে। তখন সাধকের কোনও ত্রুটীই থাকিবে না। সংসার মধুময় হইবে, জীবন পবিত্র এবং আনন্দময় হইবে। নামরূপী ভগবানের এই অদ্‌ভূত লীলা দেখিয়া মানব কৃতার্থ হইবে। তাঁহার হৃদয় মধ্যে নিশি দিন আসন পাতিয়া ঠাকুর লীলা করিবেন। সে নিত্যানন্দ নিত্যোৎ-সবের কি বিরাম আছে? উপমা আছে? এই অবস্থা অন্য কোনও উপায় দ্বারা লাভ করা যায় না। যাহার এই অবস্থা লাভ হয়, সেই সাধকই সত্য সত্য বলিতে পারেন "তুমি সুখ তুমি শান্তি, নিশি দিন তুমি আমার।" মানুষ নিজে কোনও রূপ চেষ্টা করিয়াই নিখুঁত, নিশ্চিন্ত, নির্ম্মল ও আত্মারাম হইতে পারে না, একমাত্র নামই মানুষকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করে। মনোরমার জীবনে আমরা এই সত্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

শক্তিযুক্ত নাম। নামের মহিমার কথা বলা হইল, কিন্তু সেই নাম শক্তিযুক্ত হওয়া চাই। মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া আমি যখন উপাসনা করিতাম, তখন যদিও তিনি ভক্তিযুক্ত হইয়াই বসিতেন কিন্তু গুরুদত্ত নাম কাণে প্রবেশ করা মাত্র তাঁহার যে অবস্থা হইল, সে অবস্থার অনুভূতি পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। বৈষ্ণব কবির মুখে শুনিয়াছিলাম, নাম কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণকে আকুল করে, আরও শুনিয়াছিলাম নাম যখন হৃদয় স্পর্শ করে, তখন প্রাণমন

ইন্দ্রিয়াদি আপনাদিগকে ধন্য মানিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। গুরুদত্ত নাম কাণে প্রবেশ করা মাত্র মনোরমার এই সকল অবস্থা হইয়াছিল।

সমাধির অবস্থায় কাণের কাছে ঢাক ঢোল বাজাইলেও কিছু শুনিতেন না কিন্তু সেই নামটী কাণের কাছে কয়েকবার বলিলেই বাহ্যচেতনা আসিত। তিনি বুঝিতেন তাঁহাকে জাগাইতে চেষ্টা করা হইতেছে। এইটী অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সমস্ত প্রাণমন, একমাত্র নামেই পরিপূর্ণ হইয়া আছে, সেই নাম করা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় করিয়াই ধ্যানীকে সাড়া দেওয়ার জো নাই। "শ্রবণে শুনি যে সব, সবই শুনি বেণুরব" তিনি সেই নাম ভিন্ন আর কিছুই শুনিতেন না।

সুধু গুরুদত্ত মন্ত্রেরই আমরা এইরূপ শক্তি দেখিয়াছি। ছোট খাটো অনেক ঘটনাই অনেকের জীবনে ঘটিয়াছে, যাহা দ্বারা নামের শক্তি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। যে ব্যক্তি কোন বাহিরের কল্পনায় কিম্বা বিষয়-চিন্তায় নিমগ্ন আছে, ভগবানের বিষয় কিছুই তখন ভাবিতেছে না, হঠাৎ গুরুদত্ত নাম আসিয়া তাহাকে ধাক্কা-দিয়া ঠেলিয়া লইয়া চলিল। তিনি নামানন্দে মগ্ন হইয়া গেলেন। এরূপ ঘটনা অনেকের জীবনেই ঘটে, মনে হয় যেন অন্য কেহ চালাইয়া লইয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় সাধকের গুরু শক্তিতে বিশ্বাস না জন্মিয়া পারে না। কিন্তু মনোরমার অবস্থা ইহা হইতে স্বতন্ত্র ছিল। দীক্ষার পরক্ষণ হইতেই "নাম-ব্রহ্ম" পলকের জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। নিদ্রার মধ্যে, স্বপ্নে, নাম চলিতেছে, জাগ্রৎ হইয়া দেখিলেন অবিরাম নাম চলিতেছে। এই নামানন্দ সর্ব্বদা বিষয়ানন্দের সঙ্গী ছিল। লুচী ভাজিতেছেন, লুচীগুলি ফুলিয়া উঠিতেছে দেখিয়া বালিকার মতন আনন্দে অধীর

হইতেছেন, তরকারী কুটিতেছেন মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোনও কাজের মধ্যেই আনন্দের বিরাম নাই, কাজেই কোনও কাজেই বিরক্তি নাই। ভগবানের নাম নিজেই আনন্দময়, তাহার উপর সদ্‌গুরুদত্ত নামে এত আনন্দ কোথা হইতে আসে, একথার উত্তর নাই, এ উক্তির যুক্তি নাই কিন্তু সকলই সত্য।

৮। মনোরমাকে বলিতাম যে, তুমি ত পরের হাতের পুতুল, তোমার আর বাহাদুরী কি? বস্তুতঃ ভগবান্ যে মানুষকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন, ব্রহ্মময়ী মা সন্তানের ধূলা মুছাইয়া তাহাকে নির্ম্মল করিয়া কোলে করেন, ইহা মনোরমাকে দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম। ধর্ম্ম বস্তুটী স্যাণ্ডো পালোয়ানের ব্যায়াম ক্রিয়ার মতন শুধু আত্ম অনুশীলনের ফল নহে, ভগবান্ যে নাম-ব্রহ্ম রূপে ভক্তের হৃদয়ে বিহার করেন, নামানন্দে যে বিষয়ানন্দ বিমলও উজ্জ্বল হইয়া উঠে, নামের প্রভাবে যে সমস্ত দুস্কৃতি দূরীভূত হইয়া সর্ব্বসুকৃতির উদয় হয়, দেহাত্ম-বুদ্ধি চলিয়া যায়, মূর্খ জ্ঞানী হয়, মনোরমাতে আমরা এ সমস্ত দেখিয়াছি।

যাঁহারা জগতে অনেক বড় বড় কাজ করিয়া গিয়াছেন, কেহ অনাথাশ্রম করিয়াছেন, কেহ অবৈতনিক বিদ্যালয়.ও চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়াছেন, কেহ কয়েদীর কষ্ট মোচন করিয়াছেন, কেহ বা দেশের নানারূপে উন্নতি করিয়াছেন, কেহ কেহ বা কাব্য সাহিত্য রচনা কিম্বা দর্শন গণিত বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চ্চা করিয়াছেন, নানারূপ আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীর গৌরব ও সৌভাগ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন, পৃথিবীর লোকেরা তাঁহাদেরই কীর্ত্তি কলাপ চিরস্থায়ী করিবার জন্য তাঁহাদের জীবন চরিত লিখিয়া থাকেন। যাহার কণ্ঠস্বর অন্তঃপুর অতিক্রম

করে নাই, যাহার লিখিত আঁকা-বাঁকা ছত্র ও মোটা মোটা অক্ষরগুলি একান্ত আত্মীয় স্বজনের বাহিরে দেখা দেয় নাই, যিনি জীবনে কাহাকেও উপদেশ দান করেন নাই, কাহারও কাছে ধর্ম্ম কথা বলেন নাই, যিনি দেখিতে রূপসী ছিলেন না, বাক্যে পটু ছিলেন না, কার্য্যেও সু-চতুরা ছিলেন না, এমন সাদাসিধে বাঙ্গালী ঘরের একটী মেয়ের জীবন-চিত্র আমি আঁকিতে বসিয়াছি এবং এইরূপ অবস্থাপন্না বলিয়াই লিখিতে বসিয়াছি। মনোরমার জীবন, ঈশ্বর বিশ্বাসের, আত্মা-নাত্ম বিবেকের, সিদ্ধ-মন্ত্রের, নাম-ব্রহ্মের, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের, ইন্দ্রিয় জয়ের এবং ধ্যানধারণা-সমাধির জীবন্ত সাক্ষী, এই জন্যই তাঁহার জীবন চিত্র আঁকিতেছি। তাঁহার জীবন ফোটা ধর্ম্মের ফল।

শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন—"মনোরমার জীবন দ্বারা লক্ষ লোকের উপকার হইবে। আমি দেখিতেছি তাঁহার জীবন, সংসারির পক্ষে একটী কল্যাণ-মূর্ত্তি। ধর্ম্ম অপ্রাপ্য বস্তু নহে, জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, সকলেরই ধর্ম্মলাভ হইতে পারে। সুখে হয়, দুঃখে হয়, অসুখে উদ্‌বেগে হয়, সংসারে স্বামী পুত্র কন্যা অতিথি অভ্যাগত সকলকে লইয়া স্ত্রীলোকের আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এই সুসমাচার প্রচার করাই তাঁহার জীবনচিত্র লেখার উদ্দেশ্য।

গীতার প্রমাণ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় এবং মনোরমার জীবন, যেন একই বস্তু। মনোরমা গীতার ঐ অধ্যায়ের সাকার মূর্ত্তি। আজ

কয়েক বৎসর হইতে যখনই আমি গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠ করি, তখনই মনে হয় যেন, মনোরমার জীবন পাঠ করিতেছি। ষষ্ঠ অধ্যায় বলেন,—

"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।"

যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে যোগ করিয়া সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেন নাই, তাঁহারা সুকৃতিজনিত স্বর্গাদি ভোগ করিয়া সদাচারসম্পন্ন ধনীদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

মনোরমা যে অতিশয় শুদ্ধচরিত্র-ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। (১ম খণ্ডে)

"পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপিসঃ"

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কোন অন্তরায় বশতঃ ইচ্ছা না করিলেও পূর্ব্বজন্মকৃত অভ্যাসই তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করে। মনোরমার আগ্রহাতিশয্য ব্যতীত এবং কোন কোন অন্তরায় সত্ত্বেও কেমন করিয়া দৈবঘটনায় যোগ-সাধন পাইলেন, পাঠক স্মরণ করিয়া দেখুন। (১ম খণ্ডে)

"জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥"

তখন তিনি যোগজিজ্ঞাসু হইয়াই বেদোক্ত কর্ম্মফল অপেক্ষা সমধিক ফললাভ করেন।

মনোরমার সাধন পাওয়ামাত্রই সমাধি হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সমাধি কর্ম্মকাণ্ডাতীত বস্তু। কি প্রকার লোকের যোগ (ধ্যানযোগ) হইবে না, সে বিষয় ষষ্ঠ অধ্যায় বলেন,—

"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনাশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥"

অতি ভোজনশীল বা একান্ত অনাহারী এবং অতি নিদ্রালু বা একান্ত নিদ্রাহীন ব্যক্তির সমাধি হয় না।

মনোরমা কখনও অতি ভোজন করিতেন না, কেহ অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে একটু বেশী কিছু খাওয়াইতে পারিতেন না। এজন্য আমাদের পরিবারস্থ অন্যান্য কেহ কেহ এবং আমি সময় সময় অসন্তুষ্ট হইয়াছি। অতি সামান্য উপকরণ দ্বারা অল্প আহার করাই তাঁহার অভ্যাস ছিল। বালিকাকালেও কেহ তাঁহাকে বেশী খাওয়াইতে পারেন নাই। আমি কখনও তাঁহার পেটের অসুখ দেখি নাই, বাল্যকালে কিরূপ ছিল, ঠিক বলিতে পারি না। মনোরমা বলিতেন যে, তাঁহার জ্ঞান হইয়াছে অবধি মনে নাই যে, কখনও তাঁহার পেটের অসুখ হইয়াছে। পেটের অসুখের কথা হইলে মনোরমা হাসিয়া বলিতেন, "আমার যে দিন দু'বার পায়খানা হইবে, জানিও, সে দিন আমার ওলাউঠা হইল।" সত্য সত্য তাহাই ঘটিয়াছিল। মনোরমা ইচ্ছা করিয়া কখন উপবাস করিতেন না, তবে যাহা দৈবে ঘটিয়াছে, সে স্বতন্ত্র কথা। মনোরমার অতি নিদ্রা হইত না এবং ইচ্ছা করিয়া রাত্রিও জাগিতেন না। সমাধির সময়ের কথা স্বতন্ত্র, উহাকে জাগ্রত কি নিদ্রা কোনও সংজ্ঞাই দেওয়া যায় না। কাহাদের সমাধি হইবে? গীতা বলেন,—

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥"

যাঁহার আহার-বিহার (গমনাগমনাদি) কর্ম্ম-চেষ্টা নিদ্রা ও জাগরণ যুক্ত (অর্থাৎ সংযত বা নিয়মিত) তিনিই দুঃখবিনাশক যোগ (সমাধি) লাভ করিতে পারেন।

উপরি-উক্ত শ্লোক পূর্ব্বোক্ত শ্লোকেরই বিধিপক্ষে। মনোরমার আহার-নিদ্রার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি অত্যন্ত বেড়াইতে ভালবাসিতেন না। যখন আমরা হাজারীবাগে ছিলাম, তখন নির্জ্জন মাঠে বেড়াইবার অত্যন্ত সুবিধা ছিল। কিন্তু মনোরমার সেরূপ ইচ্ছা বড় দেখি নাই। তবে সেখানে বাড়ীর মধ্যে যে বাগান ছিল, তাহাতে বেড়াইতেন এবং কদাচিৎ কোন দিন রাত্রে আমরা বলিলে কহিলে বাহির-বাড়ীর বাগানে বেড়াইতেন। যখন আমরা দেওঘরে ছিলাম, তখন বাড়ীর চারিদিকেই মাঠ ছিল; বিশেষতঃ দেওঘরে মেয়েদের বেড়ানই একটা প্রধান কর্ম্ম। কলিকাতায় যাঁহারা একান্ত অসূর্য্যম্পশ্যা, তাঁহারাও দেওঘরে গেলে মাঠে বেড়াইয়া থাকেন কিন্তু মনোরমার সে অভ্যাস বড় ছিল না। পাড়াপ্রতিবেশিনীরা অনেক বলিলে কহিলে তবে কখন কখন তাঁহাদের সঙ্গে বাহির হইতেন। বস্তুতঃ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া গালগল্প করিয়া সময় কাটাইতে তিনি একেবারেই ভাল-বাসিতেন না। কিন্তু নিজগৃহে অলসভাবে বসিয়া থাকিতেন না। আপনার যতটুকু কর্ত্তব্য, তাহা করিতেন। সংসারের কার্য্য করিতে কখনও বিরক্ত হইতেন না। একদিন আমাদের বন্ধু বাবু মোহিনী-মোহন রায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "সংসার লইয়া আপনাকে বড়ই ব্যস্ত থাকিতে হয়, ইহাতে কি আপনার মনে বিরক্তি আসে না?" মনোরমা পরিজনবর্গের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন,

"ভগবান্ ইঁহাদিগকে আমাকে দিয়াছেন, ইঁহাদের প্রতি ত আমার কর্ত্তব্য আছে।" এই কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি তিনি শুষ্কভাবে করিতেন না। তাই অন্যত্র সুখ-ভোজন পরিত্যাগ করিয়া লোকেরা তাঁহার ঘরে শাকান্ন খাইয়া থাকিতে ভালবাসিত।

"যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্তইত্যুচ্যতে তদা।"

যখন বশীভূত চিত্ত সর্ব্বপ্রকার কাম্য বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করে, তখনই তাহা যোগযুক্ত (সমাহিত) বলিয়া উল্লিখিত হয়। সমাধির সময় মনোরমার যে অন্য কোনও বিষয়েই কামনা থাকিত না, এমন কি, বিষয়ান্তরজ্ঞানও থাকিত না, একমাত্র আত্মজ্ঞানই থাকিত, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

"যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ।।"

জিতচিত্ত যোগী ব্যক্তির চিত্ত আত্মযোগানুষ্ঠানকালে নির্ব্বাত-নিষ্কম্প দীপের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকে।

সমাধির সময়ে মনোরমার চিত্ত যে কিছুতেই বিচলিত হইত না, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। কত কত ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

"যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি।।" ২০।

স্থখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১।
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ২২।
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্। ২৩॥

যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয় (১), যে অবস্থায় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকেই অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয় (২), যে অবস্থায় শুদ্ধ বুদ্ধিমাত্রলভ্য, অতীন্দ্রিয় আত্যন্তিক স্থখ উপলব্ধি হয় (৩), যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না (৪), যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভকে অধিক বলিয়া মনে হয় না (৫), এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না (৬), সেই অবস্থার নামই যোগ, তাহাতে দুঃখের সম্পর্কও নাই, তাহাই বিশেষরূপে অবগত হইবে।

উপরিলিখিত ৬টী অবস্থাই মনোরমাতে পরিষ্কাররূপে দেখা গিয়াছে। নিম্নে তাহার কিছু কিছু আভাস দেওয়া যাইতেছে।

১। মনোরমা যখন ধ্যানে বসিতেন, তখন এক মিনিটকাল মাত্র নীচের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন, পরে যোড়-হস্তে নমস্কার করিতেন; এই নমস্কারে প্রায় এক মিনিট সময় লাগিত, নমস্কারান্তে হাত দু'খানি যোড় করিয়া কোলে রাখিয়া বসিতেন। তখনি, একটা গভীর জলাশয়ের মধ্যে যেমন প্রস্তরখণ্ড ডুবিয়া যায়, তেমনি চিত্ত একেবারে অন্তরে ডুবিয়া

যাইত, বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক থাকিত না। তখন চীৎকার করিয়া ডাকিলে কিংবা সজোরে ঠেলিলেও তিনি কিছুই অনুভব করিতে পারিতেন না। ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া যে তাঁহার মন বসিতে থাকিত, সেরূপ নহে। শীতের দিনে দুর্ব্বল-ব্যক্তি যেমন আস্তে আস্তে জলে নামে, সেরূপ নহে, গ্রীষ্মের সময় বালকেরা যেমন পুলের উপর হইতে ঝাঁপ দিয়া নদীর জলে ডুবিয়া যায়, মনোরমার চিত্তনিরোধ সেইরূপ, ইচ্ছামাত্র তখনই হইত, ইহাতে কোনও চেষ্টার প্রয়োজন ছিল না। এ বিষয়টি আমরা পুনঃ পুনঃ কাছে বসিয়া উপলব্ধি করিয়াছি এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিয়াছি।

২। ধ্যানের সময় মনোরমার যে আত্মদর্শন হইত, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। (১ম খণ্ডে)। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন—"আমি যে শরীর হইতে স্বতন্ত্র, তাহা আমি দেখিতে পাই।"

৩। মনোরমা বলিয়াছেন, "(সমাধিসময়ে) মনে হয় যেন, অমৃত-সাগরে ডুবিয়া আছি। সেরূপ সুখ সংসারের কিছুতেই নাই। কাণে কিছু শুনা যায় না, চ'কে কিছু দেখা যায় না, জিহ্বায় কিছু আস্বাদ করা যায় না, মনের কোন কল্পনাও থাকে না; তবু কি আশ্চর্য্য যে, আনন্দে প্রাণ এমনই ডুবিয়া যায় যে, প্রাণের কোন স্থানে ফাঁক থাকে না।

৪। দেহ যে শরীর নয় এবং শরীর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সমাধির সময় নিয়তই ইহা উপলব্ধি হইত, কখনও এ অবস্থা ছুটিয়া যাইত না। তখন দেহাত্মবুদ্ধি একেবারেই থাকিত না।

৫। মনোরমার সংসারে অভাবের অভাব ছিল না, দারিদ্রের একশেষ, তাহাতে রোগ এবং গৃহীর নিত্য-নৈমিত্তিক যে সকল ক্লেশ, তাহা ত আছেই। আমি কখনও কখনও বলিতাম, দেখ, মহাপুরুষেরাও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন; আমাদের অভাব দূরের জন্য তুমি যদি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, আমার বিশ্বাস, সে প্রার্থনার ফল অবশ্য ফলিবে। আমি আরও বলিতাম, দেখ, আমি সাংসারিক সুখের জন্য প্রার্থনা করিতে বলিতেছি না; কিন্তু যে সমস্ত অভাব আমাকে নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানের নাম করিতে দেয় না, সেইগুলি যাহাতে দূর হয়, নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার নাম করিতে পারি, তুমি এই জন্য ত প্রার্থনা করিতে পার? মনোরমা তাহাতে উত্তর করিতেন যে, "সে সময় (সমাধির অবস্থায়) কোন অভাব বোধ থাকে না, কোনও প্রার্থনাও আসে না, প্রার্থনার কথা মনেও থাকে না। আর এমনি আমি, প্রার্থনার কোন প্রয়োজন বোধ করি না; কেন না, আমরা না বলিলেও ত পরমেশ্বর আমাদের কি প্রয়োজন, তাহা দেখিতেছেন।"

৬। মনোরমা সমাধির সময় যে গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হইতেন না, ইহার শত শত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১০৫ ডিগ্রি উগ্র জ্বর ও শিরঃপীড়া লইয়া ১২ ঘণ্টা একাসনে সমাধিস্থা থাকাই উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ভক্তিবর শ্রদ্ধাস্পদ বাবু গোরাচাঁদ দাস মহাশয়ের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। গোরাচাঁদ বাবু মনোরমার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "আমি ত তাঁহার (মনোরমার) কথা ভাবিয়া কূলকিনারা পাই না।

সংসারে সামান্য একটা অভাব বা উদ্বেগ উপস্থিত হইলে আমরা কিছুতেই মনস্থির করিতে পারি না, আর ইনি সংসারের অশেষ অভাব ও উদ্বেগে, বিশেষতঃ ব্যাধি-যন্ত্রণা সমস্তের মধ্যে থাকিয়া যখন ইচ্ছা তখনই ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন হইতেছেন!"

কোনও একজন ধর্ম্মপিপাসু ব্রাহ্ম মনোরমার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, "আমরা কত দূরে আছি।"

নানা-কথা

বাড়ীতে আমরা যাঁরা ছিলেম, তাঁরা সকলেই যে "সুবোধ সুশীল বালক" ছিলেম, তা নয়। আমাদের অভিমান ছিল, আব্‌দার ছিল, রাগ ছিল, মানুষের যেমন থাকে, তেমনি সকলই ছিল, কিন্তু মনোরমা কাহারও দ্বারা বিরক্ত হন নাই, কাহাকেও বিরক্ত করেন নাই। আমরা যখন কোনও বিষয় লইয়া আলোচনা করিতাম, তখন ক্রমশঃ আলোচনা তর্কে, তর্ক বিতণ্ডায় এবং বিতণ্ডাটা উষ্ণতায় পরিণত হইত। কেননা, আমাদের অভিমান, আত্মম্ভরিতা, বিজিগীষা কম ছিল না। তর্কটা যখন সাময়িক ভাবে আমাদের মন মলিন করিত, আমাদের মুখ এবং কাণের গোড়া লাল হইয়া উঠিত,; তখন একজন "এখন খেতে বসুন" বলিয়া মৃদু হাসির সহিত ডাকিলে, সকলের সকল উত্তেজনা কমিয়া যাইত, সকলে মিলিয়া মনের আনন্দে, ঢেঁকির শাক, মসুরের ডাল ও নারিকেলের

বড়া দিয়া ভোজনানন্দে নিমগ্ন হইতেন। তাঁর কাছে আর বিরোধ নাই, বিবাদ নাই, তিনি কারুর পক্ষেই নন,অথবা সকলের পক্ষেই সমান।

রক্তমাংসের সম্পর্কশূন্য, নানাস্থানের, নানা বংশের, নানাভাবের নানারুচির এতগুলি লোককে স্বামী ও সন্তানগণের সঙ্গে সমানভাবে সেবা করেছেন এবং সকলকেই সন্তুষ্ট রেখেছেন, আর একদিন দুদিন নয়, অভাবের সংসারে চিরকাল এই ভাবটী রক্ষা করেছেন, এই কথাটী মনে ক'রে এখন সত্যই আমার খুব আশ্চর্য্য বোধ হয়।

তিনি কাহারও মন জোগাইবার জন্য কিছু করেন নাই, সেরূপ করিতে গেলে পরিবারের মধ্যে অসন্তোষ প্রবেশ করা অসম্ভব হতো না।

ক্ষুদ্র বিষয়ে সূক্ষ্ম-দৃষ্টি

এক সময় আমরা কোন এক পরিবারের সঙ্গে এক বাড়ীতে ছিলাম, অথবা তাঁহাদের বাড়ীতেই আমরা ছিলাম। গৃহস্থালী ও আহারাদি পৃথক্ ছিল। সেই পরিবারে থাকিয়া একটি বিদেশী ছাত্র স্কুলে পড়িত। উক্ত পরিবারের সকলেই সেই যুবককে আপনজনের মতন যত্ন ও স্নেহ করিতেন। কোনও একটা সামান্য কারণে, বলিতে গেলে যুবকেরই বুঝিবার ত্রুটীতে, সেই পরিবারের সঙ্গে তাহার মনান্তর ঘটিল। এই অবস্থায় একদিন সেই যুবকটি বাজার হইতে মিছরী কিনিয়া আনিয়া মনোরমার কাছে রাখিল এবং প্রতিদিন

বিকালবেলায় পানা প্রস্তুত করিয়া দিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিল। ঘটনাটি যৎসামান্য কিন্তু মনোরমা উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। এখন কি করিবেন? যুবকের এরূপ কাজ করা তাঁহার মতে উচিত হয় নাই, এতদিন যাঁহারা এত যত্ন করিয়াছেন, এখনও তাঁহাদেরই ঘরে থাকিয়া রাগ করিয়া অন্যের হাতে মিছরির পানা করিয়া দেওয়ার জন্য কিনিয়া আনিয়া মিছরি দেওয়া অসঙ্গত কার্য্য, অন্য পক্ষে এই নিরাশ্রয় যুবকের এই সামান্য অনুরোধ, বিশেষতঃ পানীয় সম্বন্ধে, রক্ষা না করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, এই উভয় সঙ্কটের কথা তিনি আমাকে বলিলেন। আমি বলিলাম "ইহার মধ্যে আর মনে করার কি আছে?" কিন্তু সেই পরিবারের একজন শিক্ষিত কুটুম্ব একদিন আমাকে বলিলেন যে, সেই ছাত্রটির মিছিরি রাখা এবং তাহাকে পানা করিয়া দেওয়া তাঁর (মনোরমার) পক্ষে ভাল কাজ হয় নাই। আমার বুদ্ধিতে এতটা আসেই নাই। আমি দেখিলাম, মনোরমার হৃদয়টি খাঁটি নিকৃতি, জিনিসটা উহাতে দিলেই ওজনটি ঠিক হইত। তিনি সে ঘরের গৃহিনীকে ঘটনাটি বলিয়া নিজের কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিতেন, আমি মাঝখানে পড়িয়া ভুল করিয়া দিলাম। বাজে বুদ্ধির এমনি দোষ। সেই কুটুম্বের মন্তব্যটুকু যখন আমি মনোরমাকে বলিলাম, তিনি একটু হাসিলেন, সে হাসির অর্থ এই যে, এতটা যে হইতে পারে, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। যুবকের আচরণ তাঁহার নিকট সচ্ছত বোধ হয় নাই। সমস্ত জীবনে মনোরমার বিরুদ্ধে এই একটি মাত্র মন্তব্য আমার কাণে আসিয়াছে। কিন্তু এ বিষয় তিনি একান্ত নির্দ্দোষ ছিলেন। এরূপ ক্ষুদ্র ঘটনায় অনেক স্থলে ঘর ভাঙ্গিয়া যায়।

তিনি আমার কথা কখনও উপেক্ষা করিতেন না, ইহাতে সময় সময় আমাকে লজ্জা পাইতে হইয়াছে।

একদিন কোনও এক মহিলার নিকট একটা আবশ্যকীয় জিনিষের জন্য মনোরমাকে একখানা পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলাম। সে জিনিসটি চাহিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। আমি বলিলাম, "লেখ না, তা'তে কি? এখন ত পর নন।" মনোরমা কলম ধরিয়া বলিলেন, "বল, কি লিখ্‌বো?" আমি যাহা বলিলাম, সেই সেই শব্দ লিখিয়া দিলেন। উত্তর যাহা আসিল, তাহা অনুকূল নহে। তিনি চিঠিখানা পড়িয়া হাসিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি হইলে অসন্তুষ্ট হইতাম, কিন্তু তাঁহার হাসি দেখিয়া মনে হইল যে, তাঁহার প্রত্যাশার অতিরিক্ত কিছু ঘটে নাই, সুধু আমার অনুরোধেই পত্র লিখিয়াছিলেন।

সারা জীবনে একটী প্রার্থনা

সমস্ত জীবনে মনোরমা জোর করিয়া আমার নিকট একটিমাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে প্রার্থনা এই যে, যখনই আমি তাঁহার নিকট হইতে অন্যত্র থাকিব, প্রতিদিন একখানা করিয়া পোষ্ট কার্ড লিখিতে হইবে, তাহাতে সুধু এই খবরটি থাকিলেই চলিবে যে, "আমি ভাল আছি।" আমি তাঁহার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে রাজি হইলাম এবং তাঁহাকেও ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করাইলাম যে, তিনিও আমাকে প্রতিদিন পত্র লিখিবেন। আমরা জীবনে উভয়ই এই প্রতিজ্ঞা যথাসাধ্য পালন

করিয়াছি। কিন্তু হায়, তুমি কোথায় চলিয়া গেলে? সেখানকার ঠিকানা ত কিছুই বলিয়া গেলে না। আজ ২০ বৎসর হইয়া গিয়াছে, কোন খবর দিলে না, কোনও খবর লইলে না, তোমার হৃদয় কেমন করিয়া এত পাষাণ হইল?

আমি বলিতাম, "এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কখন্ বা বসিয়া নাম করিব?" কয়েক দিন আমার মুখে এই কথা শুনিয়া মনোরমা বলিলেন, "ঝঞ্ঝাট কি মিটে? কিছু করিতে হইলে ইহার মধ্যেই করিতে হয়।" এই সামান্য কথাটা আমাকে বড়ই নূতন লাগিল। আমি ভাবিলাম, সত্যই ত, ঢেউ থামিলে ডুব দিব, এই আশায় সমুদ্রের কূলে বসিয়া থাকিলে কখনই ডুব দেওয়া যায় না। ঢেউয়ের মধ্যেই ডুব দিতে হয়, ঝঞ্ঝাটের মধ্যেই নাম করিতে হয়। কিন্তু পারি কই? মনোরমার শান্ত চক্ষের দিকে তাকাইয়া ভাবিলাম, কল্যাণি, আমার অবস্থা তুমি বুঝিতে পার কি?

একবার আমার দিদি আমাদের কাপড় কেনার জন্য কিছু টাকা পাঠাইয়াছিলেন, মনোরমা সেই টাকায় জিনিস কিনিতে আমাকে ফরমায়েস দিলেন। তাহাতে বালক-বালিকাদিগের প্রয়োজনীয় মোটা কাপড়ের ধুতি-জামাই প্রধান, আমার জন্যও কয়েকটা ফরমায়েস ছিল। পরে লিখিয়াছেন, 'যদি টাকায় কুলায়, তবে আমার জন্য একখানা কাপড় আনিবে। কেননা, আমার ৩খানা আছে, আর একখানা হইলে ধোপা-বাড়ী দেওয়ার সুবিধা হয়।'

আর একবার আমাকে কতকগুলি বিশেষ অভাবের কথা জানাইলেন। একজন লোক বলিত যে, "দুঃখ ত কিছুই নাই, যা কিছু কষ্ট অন্নবস্ত্রের, তাও বৎসরে ১২টি মাস মাত্র।" মনোরমার পত্র পড়িয়া আমার এই কথাটা মনে হইয়াছিল। চিঠিখানা খুব গম্ভীরভাবেই লিখিয়াছিলেন, পরে বোধ হয়, মনে হইল যে, এই চিঠি পড়িয়া আমার মুখ মলিন হইবে, তাই দুইটি ছত্র বসাইয়া দিয়া ব্যাপারটাকে একেবারেই হাল্‌কা করিয়া দিলেন। পত্রের শেষে লিখিলেন,—

"খরচ পঠত পঠ
ন পঠত ভত ভত মরণং।"

অত অভাবের কথা জানিয়াও এই শেষ ছত্র ২টি পড়িয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম, মনে হইল, আমাকে হাসাইতেই লিখিয়াছেন।

কতকগুলি সঙ্গীত তাঁর প্রিয় ছিল। একাকী কখন কখন গুণ-গুণ স্বরে উহা গাহিতেন। স্নানের ঘরের কাছে কাণ পাতিলে একটি গান প্রায়ই শুনা যাইত ;—

"তব শুভ সম্মিলনে প্রাণ জুড়াব হৃদয়স্বামী।
কবে, বসিব একান্তে, প্রাণকান্ত, তোমায় লয়ে আমি ॥
মধুর বৃন্দাবনে, গোপি-জন-গণ সনে,
তোমার, নিত্যপদ সেবি প্রভো কৃতার্থ হইব আমি" ইত্যাদি

সংসার সম্বন্ধে তাঁর মত ছিল "বাড়ীটি ভাল হবে, শয্যা যেমনই হউক ; চাউলটি ভাল হবে, অন্য উপকরণ যেমনই হউক।" তিনি

বলিতেন, "বাড়ীটি ভাল হ'লে মাটীতে শোয়া আর ভাতগুলি ভাল হ'লে শুধু খাওয়াও ভাল।" এখানে "ভাল" অর্থ পরিস্কার।

কলিকাতায় অনেক পরিবার মেস্ করিয়া থাকে, বিশেষ ব্রাহ্মসমাজে। মনোরমা অন্যের সঙ্গে ভাগের বাড়ীতে থাকা পছন্দ করিতেন না। তিনি বাড়ীতে অতিথি রাখিতেন কিন্তু অংশী রাখিতে চাহিতেন না। তাঁর বাড়ীটি যতই ছোট হউক, সেটি ষোল আনা তাঁরই হবে। "পর-ভাতুয়া হওয়াও ভাল, তবু পর-ঘরো হওয়া ভাল নয়" পূর্ব্ববঙ্গের এই প্রবাদবাক্য তিনি মানিতেন।

মনোরমা তখন হাজারীবাগে, রেবতীমোহন তখন মূকবধির-বিদ্যালয়ের শিক্ষক। একদিন রেবতী কলিকাতায় বসিয়া বসিয়া মনে মনে কল্পনা করিতেছেন যেন, মনোরমা দেহত্যাগ করেছেন। শ্রীমান্ শোকে অধীর হয়ে আছেন, এমন সময় একজন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ লোক যেন তাহাকে একটা সঙ্গীত করিতে অনুরোধ করিলেন, রেবতী বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ধমক দিলেন। কল্পনা ভাঙ্গিয়া গেল, মনে হইল, সত্য সত্যই যেন তিনি ধমক দিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহাঁরা মনোরমার দেহত্যাগের কল্পনা করিয়াও একান্ত ব্যথিত হইতেন।

শ্রীমান্ রেবতীমোহন কয়েক বৎসর হইল (মনোরমার দেহত্যাগের বহু বৎসর পরে) "নল-দময়ন্তী" নাম দিয়া একখানি অতি সুন্দর সাহিত্যগ্রন্থ রচনা করিয়া সেই গ্রন্থখানি মনোরমার নামে উৎসর্গ

করিয়াছেন। রেবতী বলেন, তাঁহার গ্রন্থে উৎসর্গপত্রে যে মনোরমার নাম থাকিবে এই আকাঙ্ক্ষাই তাঁহাকে উক্ত গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবর্ত্তিত ও উৎসাহিত করিয়াছে।

মনোরমার দেহত্যাগের পরে শ্রীগুরুদেব বেণীমাধবকে বলিলেন, "বেণী, তোমার দরদী গেল।" মনোরমার অভাবে বেণী সত্যই মাতৃ-হীন হইয়াছে।

ব্রাহ্ম সমাজের কবি, ভক্ত ও গাথক টাকি নিবাসী ৺ইন্দুভূষণ রায় মহাশয় গুরুদীক্ষা-প্রণালীর সপক্ষ ছিলেন না; কিন্তু তিনি আমাকে ও অন্যান্য অনেককে বলিয়াছেন যে, "আমিও গুরু মানি, আমার গুরু মনোরমা"। ইন্দুবাবু জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে মনোরমার ভাশুর। অশিক্ষিতা ভাদ্রবধূর প্রতি কতদূর শ্রদ্ধায় এই কথা বলিয়াছেন।

খাদ্যবস্তুর মধ্যে মনোরমার খুব প্রিয় বস্তু ছিল শাক। একদিন একজন বলিলেন, 'ভাল আতপের ভাত, বিশুদ্ধ ঘি আর শাক হইলে অন্য কিছুরই দরকার হয় না।' মনোরমা বলিলেন, "সুধু শাক হইলেই ভাল খাওয়া হয়, আর কিছু লাগে না।" তাঁহার রান্না করা শাকের স্বাদ আজিও ভুলি নাই।

আমরা যখন ঢাকা ষ্টিমারে বরিশাল গিয়াছিলাম, তখন ষ্টিমার-ষ্টেশন যেখানে ছিল, সেখান হইতে অনেক দূর নৌকায় চড়িয়া সহরে যাইতে হইত। মনোমোহন ও রাজকুমার আমাদিগকে নেওয়ার জন্য

অগ্রসর হইয়া ষ্টিমার-ঘাটে গিয়াছিলেন। একখানা ছোট ডিঙ্গি নৌকা, তাহাতে তাঁহারা ২জন এবং আমরা সসন্তান স্বামী স্ত্রী ৮টি ও নৌকার মাঝি। কাজেই নৌকাখানি বেশী বোঝাই হইয়াছিল। নদীতে বেশ একটু ঢেউ উঠিয়াছিল এবং আমরা সকলেই ভয় পেয়েছিলাম। বিশে-ষতঃ মনোরমা এবং তাঁহার সন্তানগণ কেহই সাঁতার জানেন না। ত্রাহি ত্রাহি মনে করিয়া আমরা কোনরূপে কূল পাইলাম। রাজকুমার তখন নূতন গোড়া ব্রাহ্ম যুবক, কু-সংস্কারের ধার ধারেন না কিন্তু কূলে যাইয়া তিনি বলিলেন যে "আমার ভরসা ছিল যে বৌ' ঠাকুরাণী যখন নৌকায় আছেন তখন কিছুতেই নৌকা ডুবিবে না।"

আমাদের বড় কন্যাটী বড়ই আবদেরে ছিল, কেননা তিনছেলের পরের মেয়ে। লোকেরা বলে "তিনছেলের পর হয় ঝি, সংসারে ঢালে ঘি", মেয়ে আমাদের সংসারে তখন ঘি ঢালিতে পারে নাই, তবে তার জন্য আদর ঢালা ছিল। সে একদিন বড়ই রাগ করিয়াছে, কাকু (মনো-মোহন) তাহাকে থামাইবার জন্য কাঁদে তুলিয়া লইয়াছেন, বালিকা সেই আদরের পরিবর্ত্তে কাকুর ঘাড়ে এমনই নখের আঁচড় দিয়াছে যে, ঘাড়ের কাছটা দিয়া রক্ত পড়িতেছে। মনোমোহন সেই অবস্থায়ই তাহাকে কাঁধে লইয়া মনোরমার কাছে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলি-লেন, "বৌ'ঠান্, চেয়ে দেখুন, আপনার মেয়ে বয়সের হিসাবে মারে ভাল।" এত আদর আপন সন্তানকেও অনেকে করিতে পারে না। বৌ-ঠানের সংসার কি সুখের সংসারই ছিল, তাঁহার সন্তানদের দৌরাত্ম্যেও তাহাদের প্রতি বিরক্তি নাই।

অশীতিপর বৃদ্ধ পূজ্যপাদ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন যে, একদিন পূজনীয়া দিদিমা (গোস্বামী মহাশয়ের শাশুড়ী মহাশয়া) শ্রীমান্ বেণীকে বলিলেন, "বেণী, তুমিত মনোরমার জন্য তাদের সংসারের কতই কর, আমাদের জন্য ত কর না," বেণী বলিলেন, "আপনারা কি আমাকে তাঁহার মতন স্নেহ করিতে পারেন ?"

বর্ত্তমানে হবিগঞ্জ বিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান শিক্ষক আমাদের পরম স্নেহভাজন গুরুভক্ত শ্রীমান্ কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরতা বলিলেন যে, ভবানীপুর চাউলপটীর বাড়ীতে মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যদি গুরুদেব তাঁহাকে (মনোরমাকে) সন্তানগণ লইয়া সুন্দরবনে জন-মানব-শূন্য স্থানে বাস করিতে বলেন, তিনি তাহা করিতে পারেন কি না ? মনোরমা বলিলেন যে, তাহা পারেন। কুঞ্জ বিহারী বলিলেন, তাহাতে ভয় হইবে না ? মনোরমা বলিলেন, "গুরুদেব বলিলে আর ভয় কি ?" মনোরমা যে তাঁহার হৃদয়ের সত্যভাব চুলমাত্র বাড়াইয়া বলিতে পারিতেন না, সেরূপ বলা যে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, তাঁহাকে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন, তাঁহারা সকলেই ইহা বিশ্বাস করেন। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" গীতার এই অমূল্য উপদেশ যাঁহার হৃদয়ে অধিকার লাভ করিয়াছে, তিনি "গুরুব্রহ্মের" আদেশ পালনে ভীত হইবেন কেন ? ঈশ্বরের কথা পালন করিতে অথবা তাঁহার সঙ্গে চলিতে কি কাহারও ভয় হয় ? আমি ব্রহ্মাকেই বিশ্বাস করিতে পারিনা "গুরুব্রহ্ম" মানিব কি রূপে ? ঋষিরা দোহাই দিয়া বলিয়াছেন

"আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনঃ"। নিজের জীবন দেখিলেই বুঝিতে পারি ধর্ম্ম হইতে কতদূরে আছি।



"প্রেমলতা" "স্নেহলতা" প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ-গ্রন্থরচয়িত্রী সুকবি শ্রীযুক্ত দেব কুমার রায় চৌধুরীর জননী শ্রদ্ধেয়া কুসুম কুমারী দেবী, কোন একজন সুবিখ্যাত ধার্ম্মিকা মহিলাকে ভক্তি করিতেন এবং প্রায়শঃ দেখিতে যাইতেন। উক্ত মহিলার ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত, তিনি একজন যোগিণী ছিলেন। একদিন তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়া দেবী কুসুম কুমারী মনোরমার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "এমনটি কোথাও পাইবেন না।" একজন প্রবীণা আচার্য্যা, যোগিণী, অন্যজন সমবয়স্কা সখী, সংসার-নিরতা কুলবধূ, তবু আত্মীয়াগণের মন তাঁহারই প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত ছিল!

একাদশীতে পান্ত ভোজন। আমরা তখন শুকিয়া ষ্ট্রীটে ছিলাম। বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগত লইয়া অনেক লোক, সে দিন একাদশী। কেহ কেহ একাদশী করেন অর্থাৎ ভাত না খাইয়া রুটি কি লুচি ইত্যাদি আহার করেন। কিন্তু হাতে পয়সা নাই, যাহা দ্বারা মনোরমা অতিথি দিগের এইরূপ একাদশীর বন্দোবস্ত করিবেন, বলিলেন যে, পান্ত ভাত আছে আপনারা তাহাই মুটি মুটি খাইতে পারেন। আশ্চর্য্য এই যে, উপবাসব্রতীরা তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া অন্য কোথাও গেলেন না এবং নিজেরাও আহারের অন্য বন্দোবস্ত করিলেন না, তাঁহার হাতের দেওয়া সেই মুটি মুটি পান্তা ভাত খাইয়া পিত্তরক্ষা করিলেন। আসল কথা কেহই সেই

দান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। একাদশী কারী (অবশ্য পুরুষ) বন্ধুগণ আনন্দের সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা ও লবণ মাখিয়া পান্ত খাইলেন। এই একাদশী পালনের কথা যখন গোস্বামী মহাশয়ের নিকট পৌছাইল, তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। মনোরমার হাতে খাইয়াই তাঁহাদের তৃপ্তি, তাঁহার বস্তু উপেক্ষা করার যো নাই, তা লুচি হউক বা পান্ত ভাত হউক।

এ ঘটনাটী শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বিহারী গুহ ঠাকুরতা বলিলেন, তিনিও একাদশীর দলের একজন ছিলেন।

উক্ত কুঞ্জ বিহারী গুহ ঠাকুরতা আরও বলিলেন যে, বাড়ীতে তখন অনেক লোক, সকাল বেলা কয়েক পয়সার কালোজাম কেনা হইয়াছিল, রাত্রে কুঞ্জ বাড়ীতে আসিলে তাঁহার হাতে দুটি জাম দিয়া মনোরমা বলিলেন যে, তোমার ভাগের দুটি জাম রয়েছে। কুঞ্জ বলিলেন, ইহাও কি না রাখিলে নয় ?

আর একবার কুঞ্জ অন্য বাড়ীতে থাকিতেন। তাঁহাকে মনোরমা ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কুঞ্জ আসিলে বলিলেন যে, তাহার শরীর দুর্ব্বল দেখা যাইতেছে, অতএব কয়েক দিন এখানে আসিয়া একটু একটু দুধ খাইয়া যাইতে হইবে। কুঞ্জ বলিলেন, "আপনার শিশুরা উপযুক্ত দুধ পায় না, আমি খাইব ?" মনোরমা বলিলেন, তাহারা এখন সুস্থই আছে, তোমার শরীর খারাপ হইতেছে সুতরাং তোমাকেই খাইতে হইবে।

মনোরমার চিঠিপত্র

যাঁহারা মনোরমাকে পত্র লিখিয়াছেন, তিনি যথাসাধ্য নিয়মিত-রূপে তাঁহাদের পত্রের উত্তর দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিশেষ কারণ ভিন্ন কাহাকেও প্রায় পত্র লেখেন নাই, কিন্তু সকলেরই সংবাদ লইয়াছেন। যাঁহারা নিয়মিতরূপে তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন এবং উত্তর পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমান্ রেবতীমোহন সেন ও শ্রীমান্ বেণীমাধব দে এই দুই জনই প্রধান। আমার নিকট যে সকল চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা রক্ষিত হয় নাই; অন্য কাহার নিকট কি আছে, জানি না, জানিবার চেষ্টা করিতেও পারি নাই। রেবতীমোহন ও বেণীমাধব যত্ন করিয়া যে সকল চিঠি রাখিয়াছিলেন তাঁহারা দয়া করিয়া সেগুলি আমাকে দিয়াছেন। সেই সকল চিঠির নানাস্থান উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। ঐ সকল পত্রে মনোরমার চরিত্র ও ব্যবহার এবং সংসার ও সাধনার কথা অনেকটা বুঝা যাইবে।

রেবতী এবং বেণীমাধবের নিকট যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাতে দেখা যায় যে, পরিচিত লোক মাত্রেরই খবর জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের সংবাদ ত লইবেনই, সেজন্য ব্যাকুলতাই বা কত! তদ্ভিন্ন, যোগজীবনবাবু, জগবন্ধুবাবু, শান্তি তাঁর সন্তানবর্গ, দিদিমা, উমেশবাবু, সরলা, সুকুমারী, বৃন্দাবনবাবু, মণিবাবু, মোহিনী-বাবু, সতীশবাবু, কুঞ্জ, কুসুম, পান্নার মা এবং তাঁদের বাড়ীর সকলের, বরিশালের ফরিদপুরের অনেক লোকের খবরই জানিতে চাহিয়াছেন।

সকলকে চিঠি লিখিতে পারেন নাই, ততটা অভ্যাসও ছিল না, কিন্তু সকলেরই সংবাদ পাইতে উৎসুক ছিলেন।

মনোরমার লিখিত অধিকাংশ পত্রেই তারিখ আছে, সন নাই, এবং কোথা হইতে লিখিতেছেন, তাহাও লেখা নাই, তবে বিচার করিয়া উহা যতটা বাহির করা গেল, বন্ধনীর মধ্যে তাহা দেওয়া হইল। আর পত্রের মধ্যে যে সকল শব্দ না বসাইলে অর্থ সুস্পষ্ট হয় না, তাহাও বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু মন্তব্য দিয়াছি।

শ্রীমান্ রেবতীকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে পাঠ "স্নেহাস্পদেষু", সম্বোধন "রেবতীবাবু", স্বাক্ষর "আপনার বধূঠাকুরুণ মনোরমা।" শ্রীমান্ বেণীকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে পাঠ "কল্যাণবরেষু", সম্বোধন "বেণী" এবং স্বাক্ষর "তোমার মা মনোরমা।" বরিশালের শ্রীমান্ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ও রাজকুমার ঘোষ প্রভৃতিকেও স্নেহাস্পদ ভ্রাতা কিম্বা দেবরের মতনই দেখিতেন ও লিখিতেন।

শ্রীমান্ রেবতীমোহন সেনের নিকট লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত।

ওঁ

স্নেহাস্পদেষু

২২শে শ্রাবণ
মঙ্গলবার
(হাজারীবাগ ইং ১৮৯৫)

রেবতীবাবু,

আপনার পত্র পাইয়া ইচ্ছা করিয়াই উত্তর দিই নাই, কারণ,(ইচ্ছা-ছিল) গুরুদেবের জন্মদিন (উৎসব) হইয়া গেলে আপনাকে পত্র লিখিব।

কাল গুরুদেবের জন্মদিন হইয়া গিয়াছে, আজ আপনাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছি। উৎসবের বিবরণ শুনুন;—কাল সকালবেলা হরিসভায় কয়েকজন লোক আসিয়াছিলেন। করুণাবাবু, অক্ষয়বাবু, দীনবাবু প্রভৃতি আসিয়াছিলেন। সকালবেলা কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তন খুব লাগিয়াছিল, সকলেই প্রায় নাচিয়াছিলেন, কেহ কাঁদিয়াছেন, কেহ চীৎকার করিয়াছেন। প্রত্যেকের নাম করিয়া লেখা দরকার মনে করি না। বাবু ও উপেন-বাবু, খুব নাচিয়াছেন। কীর্ত্তনের পরে জল-খাবার লুচি, রসগোল্লা, মোহনভোগ দেওয়া হইয়াছিল। বেলা দুইটা হল্লে, কবিরাজ মহাশয় আসিয়া ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, কিছুক্ষণ পরে বিনা নিমন্ত্রণে পণ্ডিত অক্ষয়-বট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ" বার বার বলিতে লাগিলেন, ভাগবত বন্ধ হইল। সকালবেলা যাঁহারা আসিয়াছিলেন, বিকালবেলা তাঁহারা আসিয়াছিলেন। গান আরম্ভ হইল। এ বেলা অক্ষয় বাবু (উকীল) আগে উঠিয়াছিলেন, তার পরে সকলেই উঠিয়াছিলেন, তখনও খুব নাচানাচি হইয়াছিল। গান হইতে সন্ধ্যা হইল, পরে আমাদের বাবু আরতি আরম্ভ করিয়াছিলেন, গান-বাদ্য হইয়াছিল, বাবু নাচিয়া আরতি করিয়াছিলেন, খুব ভাব হইয়াছিল। সকালবেলার নাচ কিছুক্ষণ আমি দেখিয়াছিলাম, তার পরে আর কিছুই দেখি নাই, গান কাণে গিয়াছে। উৎসবে, প্রেমরসে, ভাব ও ভক্তিতে সকলেই ভাসিয়াছিল, একমাত্র আমি পাপী শুকনো জায়গায় ছিলাম। আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, এত ভাবে, এত প্রেমরসে আপনি কেমন করিয়া শুকনো রহিলেন? ইহার উত্তর আমি দিতে পারিব না।

২৫৭

—"বরিশালের কথা যে লিখিয়াছেন, গোবিন্দ বাবুর কথা, (কবি-রাজ) মথুরবাবুর কথা, বাবুর মুখে সকলি শুনিয়াছি। রাজকুমার বাবুকে পত্র লিখিয়াছি। পুরুষ মানুষ স্বাধীন, ইচ্ছা হইলে চলিয়া যাইতে পারেন। স্ত্রীলোক জাতি কিছু কাজের নয়, ইচ্ছামত কিছু করিবার সাধ্য নাই।"

* * "লোকজন খায়, অনিচ্ছা নাই, ধার করিয়া একটি লোক খাওয়াতে আমার ইচ্ছা হয় না।"

কিন্তু এ কথা মনোরমা শেষকালে রক্ষা করিতে পারেন নাই। দেওঘরে দরিদ্রদিগের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহাই ইহার প্রমাণ। দরিদ্রের দুঃখ অসহ্য হওয়ায় "আমাকে এ দেশে কেন আনিলে?" বলিয়া যখন কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন, তখন তাহাদিগকে খাওয়াবার জন্য অবস্থার দিকে মোটেই দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। যথাস্থানে উহার সবিশেষ বিবরণ দেওয়া গিয়াছে।

শ্রীমান্ রেবতী বোধ হয় অনুরোধ করিয়াছিলেন, সমাধির অবস্থায় তাঁহার সম্বন্ধে গুরুদেবকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে, তদুত্তরে মনোরমা লিখিয়াছেন,—"আমি বসিলে (সমাধিস্থা হইলে) গোঁসাইকে আপনার সম্বন্ধে যাহা আমার ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে আমার আপত্তি নাই। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, গোঁসাই আসিবার (কলিকাতায় আসিবার) বেশী বাকি নাই, নিজেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন। সাক্ষাৎ পুত্র থাকিতে বাপ আঁটকুড়া!"

অন্য পত্রে—"রেবতী বাবু, আপনি কোনও ভাবনা করিবেন না, নিজে চেষ্টা করিয়া কিছু করিবার যো নাই, যা হবার তাই হবে, নিরাশ হইবেন না।"

অন্য পত্রে—"রেবতী বাবু, আপনার দীর্ঘ পত্র পাইয়া খুব সুখী হইয়াছি। এই রকম বড় পত্র পাইতে আমি বড় ভালবাসি। খোকার জ্বর সারিয়াছে। টুলুর পেটের অসুখ ভাল হয় নাই, চিতুর জ্বর হইয়াছিল; ভাত খাইয়াছে * * * পাঁড়ে রাখা হয় নাই। আমার (এবং) জেঠী মারও ইচ্ছা নাই। বামুন দিয়া যে সুবিধা হবে, বোধ করি না। বাবু বলেন, পাঁড়ে রাখ, আমার ইচ্ছা, বাইরে যে ছোট ঘর আছে, তাহা রান্নাঘর করি, এক বেলা আমিও রান্না করিতে পারিব, কাজে কি হবে, জানি না!"

অন্য পত্রে—"আপনার খাওয়ার বন্দোবস্ত করেন নাই শুনিয়া কষ্ট পাইলাম। দুধ না হয় জল, ঘি ত খাইতে পারেন, (২৪ বৎসর পূর্ব্বে) ভাতের সঙ্গে খাইতে পারেন না, (মেসের) সকলকে ফেলিয়া কেমন করিয়া খাইবেন? কিন্তু খানিক ঘি গরম করিয়া শুঁঠ কি গোলমরিচের গুঁড়া দিয়া খাইবেন, তাহাতে উপকার হইবে। * * রান্না খাইতে আপনার অসুবিধা হইতেছে, শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইতেছে, শারীরিক ক্ষতি হইতেছে, ইহা বুঝিয়া সেখানে থাকাও ক্লেশকর, কি করিতেই বা বলিব? সতীশবাবু কোথায় খান? সরলাদের বাড়ী আপনার ইচ্ছা হইলে খাইতে পারেন, আপনার উপর সরলার ভাল ভাবই আছে, আমরা যতদূর জানি। কলিকাতায় ভাল আম পাওয়া যায়, যখন মুড়ি খান, মুড়ি না খাইয়া দুইটা ভাল আম কিনিয়া খাইবেন, এ বিষয় আমার অনুরোধ জানিবেন।"

আমরা হাজারীবাগ চলিয়া গেলে রেবতীমোহন এক মেসে ছিলেন, মেসের রান্না ও খাদ্য তাঁহার পছন্দ হইত না, যেমন স্বল্প-

কারী, তেমনই অপবিত্র, বিশেষতঃ তখন রেবতীর শরীর খুব খারাপ ছিল, এই সংবাদ পাইয়াই উপরের পত্র লিখিয়াছেন।

অন্য পত্রে "—ঋণ আছে, ভাবিয়া আর কি করিবেন, যা হইবার হইবে, ঐ সকল চিন্তা যত মনে না আনিয়া পারেন, ততই ভাল। চিন্তা করিয়া ফল নাই, শরীর নষ্ট করা। পিতা-মাতাকে সুখী করিবেন, এই ইচ্ছা ভাল, আপনার যতদূর সাধ্য করিবেন। প্রার্থনা করিতেছেন, বেশ, করিবেন। আপনাদের কষ্টের দিন ত কাটিয়া আসিল। গুরুদেব কলিকাতায় আসিলে আর কিছু উপকার হউক বা নাই হউক, মনের কথা বলিয়া ত শান্তি পাওয়া যাইবে, কিছু নাই বা হইবে কেন? আপনি গোঁসাইয়ের ওখানে গান গাহিয়া কত সুখ পান, কত সময় আনন্দ পান, প্রাণ শান্তিতে থাকে।"

অন্য পত্রে * * "বাবুর ফটো আমাকে উপহার দিবেন? আমি আপনার উপহার পাইলে বড়ই সুখী হইব এবং সেই ফটোখানা আমার কাছে যত্ন ক'রে রাখিব। একে আমার স্বামীর ফটো, তাতে আপনার উপহার, ইহার আর কথা কি?

—"আপনি নারিকেল দিয়াছিলেন, তাহা এখনও আমরা খাইতেছি। কৃপণতা করিয়া নারিকেল খরচ করা হয়।"

অন্য পত্রে—"আপনার পেটের অসুখের কোনও ঔষধ খাইতেছেন কি না? শুষ্ণী শাক খাইবেন, তাহাতে মাথা ঠাণ্ডা হয়, রাত্রে ঘুমও হয়, খাইয়া দেখিবেন। আপনার খাওয়ার অসুবিধার কথা শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইল, গুরুদেব কলিকাতায় আছেন, তাই

এখন (হাজারীবাগে) আসিতে লিখিতে ইচ্ছা হয় না। খাওয়ার একটু বন্দোবস্ত না করিলে কেমনে চলিবে? পেট ভরিয়া কতদিন না খাইয়া পারা যায়? মাছের ঝোলের বন্দোবস্ত করিবেন। আপনি ত অন্য কিছু (ডাল প্রভৃতি) খাবেন না। ইহাতে লজ্জা করিলে চলিবে কেন? গান করিয়া মাথা গরম হইলে বেশী গান না গাওয়া ভাল। গুরুদেবের নিকট গান গাহিতে হইলে আমার "না" করিবার ক্ষমতা নাই। ব্যারাম হইয়াছে, ইহা চিরদিন থাকিবে, এইরূপ ভাবিতেছেন কেন? ব্যারাম সকল লোকেরই হয়।"

ইহার পরে গুরুদেব রেবতীকে হাজারীবাগ যাইয়া থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন জানিয়া মনোরমা লিখিলেন ;—

—"গুরুদেব যখন বলিয়াছেন হাজারীবাগ আসিতে, তখন আর ভয় কি? এখানে আসিলে সারিয়া যাইবে। আপনি যখন পত্র লিখিবেন, তখনি আপনার শারীরিক অবস্থা বিশেষ করিয়া লিখিবেন। সকল কথারই ফল পাওয়া যায় না। * * ছুটী না পাইলেও চলিয়া আসিবেন, যা হবার হইবে। টাকার জন্য শরীর নষ্ট করিবেন না।"

আধ্যাত্মিক কোন প্রশ্ন সমাধির মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতে রেবতী-মোহন মনোরমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তদুত্তরে লিখিয়াছেন,— "আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লিখিয়াছিলেন, আমার আগে খুব ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু আজকাল কেবল মনে হয়, আপনি নিজে (গোঁসাইকে) জিজ্ঞাসা করিলে তৎক্ষণাৎ উপকার পাইবেন।"

অন্য এক পত্রে রেবতীর প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন;—"রাজা থাকিতে কোটালের দোহাই কেন?" অর্থাৎ গুরুদেব সাক্ষাতে থাকিতে আমাকে এ প্রশ্ন করিতেছেন কেন?

ঋণ-শোধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—"ভূতনাথকে (ভূতনাথ গোপ কলিকাতায় আমাদিগকে দুধ যোগাইতেন) টাকা দিয়াছেন কি না? তাহার আর কত বাকি রহিল, জানিয়া রাখিবেন, ভুল না হয়, কত পাবে। ভূতনাথকে ঐ টাকা দিতে আমিই বলিলাম।"

"আমাদের বাবু, * * * বাবুর টাকা না দিতে পারিয়া বড় লজ্জিত আছেন, তা ব'লে কি করা যায়? এই টাকা অভাবে * * * বাবুর কষ্ট হইবে না, ভূতনাথের খাওয়া পরারই কষ্ট হইতেছে, তাহাকে টাকা দেওয়াই উচিত মনে হইল।" একজনার টাকা না দিলে আমাদের অসম্মান হয়, অন্যের টাকা না দিলে তাহার ক্লেশ হইতে পারে, দু'জনকে এক সময় দেওয়ার শক্তি নাই, কাজেই নিজেদের মানের দিকে না তাকাইয়া ভূতনাথকেই টাকা দিলেন।

অন্য পত্রে,—"গুরুদেবের পায়ের আবির পাইয়া বড় আনন্দিত হইয়াছি, আমরা মাথায় কপালে দিয়াছিলাম। আপনি সকল সময় কলিকাতায় থাকাতে আমাদের এই বড় সুবিধা, গুরুদেবের ওখানে কিছু হইলে আমরা বঞ্চিত হইব না।"

অন্য পত্রে,—সহানুভূতি।—"তিনটি মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছি, প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিয়াছিল! মানবের এক মুহূর্ত্তেরও আশা নাই।

ভাবিতে গেলে সংসার কিছুই না। যে কা'ল মরিবে, সেও কত কাজ করিবে, এই আশায় কাজ করিতেছে। আশায়ই সংসার চলিতেছে। আপনার খুড়ীমা আছেন কি? বৌটি চিরদুঃখিনী হইয়া রহিল। বিনোদার মা আর শোক পান নাই, এই প্রথম, তাঁহার কষ্টের একশেষ হইতেছে। বিনোদা কোথায় মারা গেল জানাবেন। শ্রীচরণ-বাবুর ছেলেটি (শ্রীমান্ অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী) কেমন আছে, জানাবেন।" ইত্যাদি।

মনোরমা যাঁহাদের শোকে সহানুভূতি করিতেছেন, তাঁহারা কেহই আমাদের আত্মীয় নহেন, আমি বুঝিতেও পারিতেছি না, তাঁহারা কে? বোধ হয়, রেবতীমোহনের আত্মীয় হইবেন।

কলিকাতায় আমার চো'ক উঠিয়াছিল, এই পীড়ায় আমি প্রায় দুই মাস শয্যাগত ছিলাম। সেই সময় মনোরমা রেবতীমোহনকে লিখিয়াছেন,—

"স্নেহাস্পদেষু।— দেওঘর

৩রা চৈত্র সোমবার।

(১৩০৫বাং)

আজ আপনার কার্ড পাইলাম। বাবুর জন্য চিন্তিত রহিলাম। ওখানে কিছু কাজ করিতে পারিতেছেন না, বসিয়া রহিয়া বা কি করি-বেন? কলিকাতা গরম বেশী, চক্ষু (চোক উঠার ক্লেশ) বেশী হইবার কথা। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন, যদি তিনি আসিতে বলেন, তবে যে সময়ে রওয়ানা হইলে কষ্ট রাস্তায় পাইতে না হয়, সেই সময় রওয়ানা করিয়া দিবেন।"

"আপনাদের নিকট শুশ্রূষার ত্রুটি হইবে না, আমার চিন্তা থাকে। অন্য কোন ব্যারাম হইলে কলিকাতা হইতে আসিতে লিখিতাম না। * * রেবতী বাবু, এবার আমাদের উপরে আপনি উঠিয়াছেন। এক জন একখান পত্র লিখিলেন না। আমরা বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলাম। * * যে কয়দিন উনি নিজে পত্র লিখিতে না পারেন আপনি রোজ আমাদের সংবাদ দিবেন। এক খানা কার্ড লিখিতে বেশী সময় লাগিবে না। গুরুদেব কেমন আছেন লিখিবেন। চক্ষে কি ঔষধ দেওয়া হয় লিখিবেন। পত্র লিখিতে ভুল না হয়।"

—"দোলের সময় বেশী করিয়া আবির গুরুদেবের পায় মাখাইয়া কৌটায় করিয়া আমাকে দিবেন।"

অন্য পত্রে—

—"রেবতী বাবু, আপনি বেশ মানুষ, (আপনার) অসুখের সংবাদ লিখিয়া আর পত্র লিখিতেছেন না, কারণ কি? আপনি কি আমার প্রতি রাগ করিয়াছেন? আমার ত বিশ্বাস হয় না যে, আমার কোন অপরাধের জন্য আপনি পত্র লেখা বন্ধ করিয়াছেন। আপনার অসুখের জন্য আমরা বড়ই চিন্তিত আছি। রেবতী বাবু, আপনাকে মিনতি ক'রে বলি পত্র লিখিতে বিলম্ব করিবেন না। গুরুদেবের শরীর ভাল না জানিয়া বড় ভাবনা হইয়াছে। তিনি কেমন আছেন, বিস্তারিত করিয়া লিখিবেন।"

অন্য পত্রে— * * "সকল কথারই কি ফল পাওয়া যায়?" ইহা লিখিবার কারণ আছে। আপনি লিখিয়াছিলেন, 'আমার শরীর

ভাল না, এ কথা বার বার লিখিয়া ফল কি?' সেজন্য আমি লিখিয়াছিলাম, 'সকল কথার কি ফল পাওয়া যায়?'

"আপনি যে প্রসাদ পাঠাইয়াছিলেন, আমাদের ভাগ্যে ঠিক্ প্রসাদ মিলে নাই, আমরা কাগজ ছিঁড়িয়া একটু করিয়া খাইয়াছি।"

"আপনারা গুরুদেবকে দেখিয়া নয়ন জুড়াইতেছেন, জীবন সার্থক করিতেছেন, আমরা হাজারীবাগে বনের মধ্যে বসিয়া কূয়ার জল খাইতেছি।"

"বেণীকে একটা কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি, তাহা এই,—আমার ইচ্ছা, গুরুদেবের মাথার চুল পাইলে রাখিয়া, একটা কবচে করিয়া ছেলেদের নামে নামে এক একটা, আমাদের দুজনের নামে দুইটা, আপনার ও বেণীর দুইটা, তাবিজমধ্যে ভরিয়া বেণী আনে। তাবিজ তামার হউক কি লোহার হউক।"

শ্রীমান্ রেবতীকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, "গুরুদেবকে একাকী পাইলে অথবা যাঁহারা কাছে থাকিলে দোষ নাই বুঝিবেন, তাঁহারা থাকিলে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, আমার মৃত্যু আগে হবে, কি ওঁর?"

এই সময় হইতে মনোরমার মনে যেন একটা বিচ্ছেদের ছায়া পড়িয়াছিল, যাহাতে আমার ফটো নিশ্চয়ই তোলা হয়, সে জন্য রেবতীকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। * ফটো তোলার বাই তাঁহার মোটেই ছিল না। এই জন্য তাঁহার নিজের ফটোও তোলা হয় নাই বলিলেই হয়। একবার রেবতী তাঁহার স্কুলের (মুক-বধির বিদ্যালয়ের) শিক্ষক মোহিনী বাবুর দ্বারায় আমাদের গ্রুফ তুলিয়া-

* যে দুই জন শিক্ষানবীশ আমাদের গ্রুফ তুলিয়াছিলেন তাহাও ভাল হয় নাই।

ছিলেন, মোহিনী বাবু তখন এ কাজে একান্ত শিক্ষানবীশ ছিলেন। শ্রীধরকৃষ্ণ তামাহানি নামক একটি বম্বেবাসী যুবক অল্প কিছু দিন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। তিনি মনোরমাকে 'দিদি' বলিতেন, তাঁহার দিদির ফটো তুলিতে ইচ্ছা হওয়ায় তিনি একদিন তুলিয়াছিলেন। উক্ত যুবকও একান্ত শিক্ষানবীশ ছিলেন। বিশেষতঃ মনোরমা হাসিয়া ফেলায় সে ফটোখানিও ঠিক উঠে নাই। বেঙ্গল ফটোগ্রাফারের স্বত্বাধিকারী নীলমণি বাবু আমাদের গুরুভাই ছিলেন, তাঁহারা অতি যত্নে মনোরমার ফটো তুলিতে পারিতেন; কিন্তু এ বিষয়ে মনোরমার নিকট হইতে কখনও উৎসাহ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং আমার ফটো তুলিবার জন্য রেবতী মোহনকে জেদ করিয়া লেখার মধ্যে মনে হয় যেন, কোনও ভাব ছিল। দেহত্যাগের পূর্ব্ব হইতেই একটু 'হারাই হারাই', ভাব আসিয়াছিল।

একজন ফটো-গ্রাফার গ্রুফ্ হইতে মনোরমার ফটো আল্‌গা করিয়া এন্‌লার্জ করিয়াছিলেন সেখানি দেখিয়া মনোরমাকে চেনা যাইত; কিন্তু আমাদের পূজনীয়া বৃদ্ধা দিদিমা (গুরুদেবের শাশুড়ী ঠাকুরাণী) যখন কিছুদিন গিরিডিতে আমাদের বাড়ীতে ছিলেন, তখন আদর করিয়া তিনি প্রতিদিন মনোরমার সেই ছবিখানার কপালে ও সিঁথিতে সিন্দূর এবং সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের ফোঁটা দিয়া সাজাইতেন, তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, সেই ছবিখানা কাচে আবৃত ছিল না, কাজেই উহা একেবারেই নষ্ট হইয়াছে। উহার আর সংস্কার করা সম্ভব কি না জানি না, তবে এ পর্য্যন্ত সেজন্য কোনও উদ্‌যোগ করা হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়িল। শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু (পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য-প্রণেতা) মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করিয়া মনোরমার চিতার উপর যাহাতে একটি ছোট-খাটো মন্দির হইতে পারে সে জন্য দেওঘর মিউনিসিপালিটীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া ছিলেন। উহা শবদাহকদিগের বসিবার স্থান হইতে পারিত; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অবশ্যকর্ত্তব্যকর্ম্ম আজিও সম্পন্ন হয় নাই।

শ্রীমান্ বেণী মাধবের নিকট লিখিত
মনোরমার পত্র হইতে উদ্ধৃত।

শ্রীমান্ বেণীমাধব দে মনোরমার সন্তানস্থানীয়। শ্রীগুরুদেব এরূপ কথা বলিয়াছিলেন, যাহাতে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বজন্মে মনোরমার সহিত বেণীমাধবের মাতা-পুত্রবৎ সম্বন্ধ ছিল। মনোরমার দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বেণী মাধব যেরূপভাবে মনোরমার সেবা ও তাঁহার সন্তানগণের জন্য লালন পালন করিয়াছেন, সেরূপ সত্যকার মা কিংবা ভ্রাতা ভগিনীর জন্য করিলেও অসামান্য বলা যাইত। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু দুঃখের বিষয় এই ছিল যে, সেই সময় বেণীমাধব তাঁহার জনক-জননী ও ভ্রাতা-ভগিনী গণের জন্য কিছুই করেন নাই। মনোরমা বেণীকে তাঁহার কর্ত্তব্য ধরাইয়া দিতে কখনও ভুলেন নাই। বরিশালে যাইয়া পিতা-মাতার সঙ্গে দেখা করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছেন ;—বেণী, কা'ল তোমার কার্ড পেয়েছি। বরিশাল গিয়া তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করিলে তিনি তোমাকে কি বলিলেন, ভাই-বোনেরা কে কি বলিল,

তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হইল কি না লিখিবে। কি জন্য তোমার কষ্ট হইল, বিস্তারিত লিখিবে।"

অন্যত্র,—"ফ্লানেল দিয়া সেমিজ আমার (জন্য) না করিয়া তোমার মা'র জন্য কি বাবার জন্য কিছু নিলে ভাল হইত। দে'া, তুমি তাঁহাদের প্রথম সন্তান, তোমাকে দিয়া অনেক আশা-ভরসা ছিল, তুমি তাঁহাদের সকল আশাই মাটী করিয়াছ। যখন যাহা পার, তোমার তাঁহাদেরই দেওয়া উচিত। আজ এ সম্বন্ধে অনেক লিখিলাম, তোমার ভাল লাগিবে কি মন্দ লাগিবে, জানি না। মা বাবা সম্বন্ধে তোমার কি করা উচিত, গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিতে পার। তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই ঠিক, সেই অনুসারেই কাজ করিবে।"

বেণীমাধব প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় পিতামাতা তাঁহাকে অন্যান্য সন্তানগণের ন্যায় ঘরে রাখিতে পারেন নাই, এই ঘটনা হইতে বেণীমাধব অভিমানে আর তাঁহাদের সংসর্গে যান নাই। মনোরমা যদিও বেণীকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন, কিন্তু পিতামাতা ও ভ্রাতা-ভগিনীগণ সম্বন্ধে বেণীমাধবের উপেক্ষার ভাব তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। নানা ভাবে এ কথা বেণীকে বুঝাইয়াছেন, পিতামাতার সেবা ভিন্ন তাহার অন্য সমস্ত সেবাই যে ব্যর্থ হইতেছে, নানারূপে তাহা জানাইয়াছেন। পরিশেষে গুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে বেণীকে উপদেশ দিয়াছেন। মনোরমা বেণীমাধবের পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগিনীগণকেও স্বজনের মধ্যে ধরিয়াছেন, তাহাদের জন্য কত সহানুভূতি।

"তোমার সম্বন্ধে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছিলাম

এই জন্য যে, আমাদের মনে হয়, আমাদের জন্য তুমি কত কর, যে মা তোমাকে গর্ভে ধরিয়াছেন, তাঁহার কিছু করিতেছ না, তোমার সেই কার্য্য ন্যায় কি অন্যায়, গোঁসাই যাহা বলেন, তাহাই ঠিক; তোমার ইচ্ছা না হইলে জিজ্ঞাসা করিবে না।”

এই সকল পত্রে শ্রীমান্ বেণীকে শুধু ভাবের পথ হইতে কল্যাণের পথে নেওয়ার জন্য কি মর্ম্মান্তিক বাসনা। আর গুরুদেবের বাক্যের উপর কি দৃঢ় নির্ভর! তথাপি অন্যের স্বাধীন ইচ্ছার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে মোটেই ইচ্ছা নাই। প্রথম নিজে যাহা কর্ত্তব্য মনে করিতেছেন তাহাই বলিতেছেন, যদি তাহাতে ভুল থাকে, এই আশঙ্কায় গুরুবাক্যে নির্ভর করিতে বলিতেছেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই পরিশেষে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিবে। তিনি কাহারও উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহেন না, অথচ অকল্যাণ দেখিতে পারেন না।

শ্রীমান্ রেবতীকে হাজারীবাগ হইতে লিখিয়াছেন যে, “আপনাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়া ভাল লাগে না।” শ্রীমান্ বেণীকে লিখিয়াছেন, “শত সুবিধা হইলেও তোমরা কাছে না থাকিলে ভাল লাগে না।”

আমাদের ছোট পুত্র টুলু, (দেবরঞ্জন) বেণীমাধবের এতই বাধ্য যে, তাহাকে পাইলে সে হাতে স্বর্গ পায়। রেবতী যতদিন কাছে থাকেন, ততদিন নানাভাবে গৃহ আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে, আমাদের বাড়ীই সহরের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের আকর্ষণের স্থান হয়। বেণীমাধব ছেলে মেয়েদের যত্ন করেন, যথাসাধ্য মনোরমার সকল কাজের সাহায্য করেন। তাহাতে মনোরমা খুবই উপকার বোধ করেন; কিন্তু তাঁহাদের

কোনও কর্ত্তব্যে যাহাতে ক্রটী না হয়, সে দিকে তাঁহার সর্ব্বদাই সজাগ দৃষ্টি ছিল। রেবতীকে লিখিয়াছেন—"বালি (যেখানে তাহার ভ্রাতা থাকিতেন) গিয়াছেন কিনা, বাড়ী যাবেঁন, সে স্থান ভাল নয় বেশী দিন থাকিবেন না। মা কেমন আছেন, আত্মীয়গণ কেমন আছেন" ইত্যাদি সর্ব্বদাই লিখিতেন। বেণীমাধবকে যাহা লিখেছেন তাহার অর্থ এই যে, তুমি কাছে থাকিলে আমার উপকার হয়, ভাল লাগে—টুলু হাতে আকাশ পায়, কিন্তু সে জন্য আমি স্বার্থপর হতে চাহি না অর্থাৎ তোমাদের যাহাতে কল্যাণ হয় তাহাই আমি চাই।

নাম করার কথা;—"নাম করার কথা যে লিখিয়াছ, লিখিতেছি, শোন; আমি ইচ্ছা করিয়া নাম করি না. (নাম) শ্বাস-প্রশ্বাসে চলে কিনা তাহা আমি বুঝি না। ভিতরে সর্ব্বদাই সকল কাজে সমস্ত অবস্থায় নাম চলিতেছে। * * আমি অন্যের জন্য প্রার্থনা করিলে কি হবে জানি না। আমি মনে করি আমার জন্য প্রার্থনা করার দরকার, কারণ, আমি সংসারে ব্যস্ত আছি।"

অন্যত্র;—"আমার কথা আর বলিব কি? তোমরা আমাকে এত ভালবাস, আমি তাহার এক আনা ভালবাসিতে পারি না, একি আমার ভাল অবস্থা? এক এক সময় মনে হয়, এ দেহ থেকে প্রাণটা বাহির হইলেই ভাল হয়, কতদিন আর এ ভাবে বন্দী থাকিব ? আমি আর কতকাল বাঁচিব গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিতে পার কি? তিনি অনুগ্রহ করিলে বলিতে পারেন সন্দেহ নাই।"

দেহের মধ্যে একটা বদ্ধ অবস্থায় আছেন, এই অপূর্ণতা তাঁহাকে সময় সময় যেন কষ্ট দিত; কিন্তু এ ভাব বেশীক্ষণ থাকিত না।

সংসারের কাজে এবং আমাদের দোষেই মনোরমা রীতিমত ধ্যানে বসিতে পারেন না, সাধারণ স্ত্রীলোকের মতন তাঁহাকে গৃহ-কার্য্য করিতে হয়, ইহা দেখিয়া শ্রীমান্ বেণীমাধব আমাদের উপর বিরক্ত ছিলেন। এক এক জনার এক এক ভাব, অন্যের সঙ্গে না মিলিলেই বিরোধ। শ্রীগুরুদেব যখন শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন, তখন বেণীমাধব সেখানে গেলে গোঁসাই মনোরমার ধ্যানে বসা সম্বন্ধে কি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বেণী মনোরমাকে লিখিয়াছিলেন যে, কেন নিয়মিত-রূপে বসা হয় না, সে কথার উত্তর গুরুদেবকে বেণীমাধব দিতে পারিলেন না। এই কথা জানিয়া মনোরমা তাঁহাকে লিখিয়াছেন;—"গুরুদেব যখন আমার বসার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তর দিতে পারিলে না কেন? আবার কখনো কথা উঠিলে বলিবে, আমি নিজের দোষেই বসিতে পারি না, মায়ার মোহে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি। গুরুভক্তি নাই, সেই জন্যই গুরুবাক্য প্রতিপালন করিতে পারি না। সময় সময় আমার মনে হয়, এ দেহে আর কিছু হইবে না, যদি হইবার হইত, আমি কোন দিক্ তাকাইতে পারিতাম না, না বসিলে প্রাণে জ্বালা হইত। কৈ, সে সকল হয় না, বেশ সুখে আছি, খাই, ঘুমাই, আর কি? অন্য কেহ যখন না থাকিবে, তুমি যদি পার, জিজ্ঞাসা করিও, এ জীবনে কিছু আশা আছে কি?"

মনোরমা যে উত্তর দিলেন অথবা যে নিবেদন করিলেন, শ্রীমান্ বেণীর বোধ হয় তাহা মনোমত নহে, তাহার কথা এই যে, সংসারের পরিজনও অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যায় অথবা সংসারের নানারূপ ঝঞ্ঝাটে মনোরমা যথোচিত অবসর না পাওয়াতেই

ধ্যানে বসিতে পারেন না। মনোরমাকে রাত্রিদিন বসিতে অবসর দিয়া তাঁহার সন্তানগণের ময়লা পরিষ্কার, কাঁথা ধোয়া, খাওয়ানো ছোঁচানো সমস্তই সে নিজ হাতে করিতে ভালবাসে। এইরূপই সে করিত, ব্যাপারটী বড় সহজ নয়। যে ব্যক্তি এইরূপ আচরণ করিয়া সুখী হয়, অন্যের জন্য বা অন্য কাজে মনোরমা সময় নষ্ট করিলে তাহার ভাল লাগিবে কেন? ভাল লাগা ত দূরের কথা, যাহাদের জন্য মনোরমা সময় ব্যয় করেন, তাহাদের প্রতিও সে বিরক্ত হয়। বেণীমাধবের ভালবাসা ও সেবা উভয়ই নিঃস্বার্থ; কিন্তু একটি ভুলের জন্যই তাহাকে কষ্ট পাইতে হইয়াছে, সেটি মনোরমাকে বুঝিবার ভুল। ভগবানের কৃপায় মনোরমার মতন অবস্থা যাঁহাদের লাভ হয়, তাঁহাদিগকে অন্য লোক কখনও ইচ্ছা-মত চালাইতে পারে না, ভিতরের শক্তি দ্বারা তাঁহারা পরিচালিত হন, অন্তের ইচ্ছামত যে কোনও ছাঁচে তাঁহাদিগকে ঢালা যায় না। তাঁহারা ক্ষুরধারের উপর দিয়া চলিয়া যান, একটু পা টলিলে পতন ও মৃত্যু। সুতরাং অন্যের আকর্ষণে কি বিকর্ষণে তাঁহাদের গতি পরিচালিত হইতে পারে না। এমন কি, যাঁহারা সেবা করিবেন, সাহায্য করিবেন, তাঁহাদের নিকট হইতেও ওজনের বাহিরে এক রতি গ্রহণ করিবেন না! তাঁহারা বান্ধা রাস্তায় চলেন। না বলিলেও অশিষ্ট হয় না। শেষ জীবনে বলিয়াছেন যে,—

পাঠক জানেন যে, বদান্য জমিদার ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় আমাদের প্রতি কিরূপ অহেতুকী সদাশয়তা দেখাইয়াছেন। ছোজারীবাগে তাঁহার প্রকাণ্ড ভবন ছাড়িয়া দিয়া তদুপরি প্রায় দেড়

হাজার টাকা আমাদের জন্য খরচ করিয়া এক বৎসর কাল আমাদের নিরুদ্‌বেগ বাসের ও স্বাস্থ্যলাভের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় একদিন তিনি আমাকে কোন কাজে কলিকাতায় যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লিখিলেন। যে কারণেই হউক, মনোরমার ইচ্ছা ছিল না যে, আমি সেকাজে যাই। একজন হিতৈষী বলিলেন, "ভদ্রলোক (কালীকৃষ্ণ বাবু) এত উপকার করিতেছেন, তাঁহার কথা রক্ষা করিলে ক্ষতি কি ?" মনোরমা বলিলেন, "তিনি যে উপকার করিতেছেন, সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ কিন্তু সেইজন্য তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই যে করিতে হইবে, এমন কিছু কথা নয়।" কালীকৃষ্ণ বাবু যেমন হঠাৎ একজনার উপর সদয় হন, তেমনি হঠাৎ এক কথায় বিরক্ত হইতে পারেন, এ বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে কথা হইত। তিনি যদি বিরক্ত হইয়া তখন আমাদের খরচা বন্ধ করিয়া দিতেন তবে সংসারের হিসাবে আমরা খুবই বিপন্ন হইতাম। কিন্তু মনোরমার সে দিকে লক্ষ্য নাই। তিনি উপকারীর প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ আছেন কিন্তু উপকারীকে খোসামোদ করিয়া চলা তাঁহার ভাববিরুদ্ধ কার্য্য। কালীকৃষ্ণ বাবু সাহায্য না করিলে কি উপায় হইবে, এ চিন্তা কখনও তাঁহার মনে আসে নাই। তাঁহার মন, বুদ্ধি, সংসার, পরিজন, সমস্তই ভগবানে অর্পিত হইয়াছিল ; কাজেই কোনও আশঙ্কা, কোনও চাঞ্চল্য তাঁর ছিল না, তাঁহার আচার আচরণ দেখিলেই মনে হইত, তিনি যাঁহার উপর নির্ভর করিতেছেন, সে দেবতা, নিত্য সত্য জীবন্ত জাগ্রৎ বস্তু, তিনি মানুষ নহেন।

গুরু-দর্শন।

এক পত্রে আছে, "গোঁসাইকে দেখার কথা যে লিখিয়াছ, আমি বসিলে (ধ্যানে) দেখিতে পাই।"

ফরমায়েস।

"ছেলেরা বলে, মা, সোনা দাদাকে (বেণীকে) এই সকল (জিনিস) আনিতে লিখিয়া দেও, আমি বলিয়াছি, তোদের সোনাদাদা কি চাকুরী করিতে গিয়াছে, যে, তার কাছে কেবল ফরমায়েস দিবি ?" কিন্তু আমি নিজেও কত ফরমায়েস দেই"।

শ্রীমান্ রেবতী ও বেণীমাধব সময় সময় মনোরমাকে ও ছেলেদেরে জিনিস কিনিয়া পাঠাইতেন। রেবতী তাঁহার তখনকার সামান্য-বেতন হইতে এবং বেণীমাধব বলিতে গেলে ভিক্ষা করিয়া পাঠাইতেন। ইহাঁরা যে ভাবে এই কার্য্য করিতেন, সেই ভাবকে উপেক্ষা করিয়া উহা পাঠাইতে নিষেধ করিতে মনোরমার ক্ষমতা ছিল না। এ ক্ষেত্রে তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইত। সে সব দান কত স্নেহের, কত আদরের, কত মর্ম্মান্তিক! ইহাঁদের প্রদত্ত সামান্য বস্তুকে মনোরমা অসামান্য মনে করিতেন। ইচ্ছা করিয়া কখন কখন ইহাঁদিগকে ছোট-খাটো ফরমায়েস দিতেন। তিনি জানিতেন, ইহাতে তাঁহারা কিরূপ আনন্দিত হইবেন।

আর সঙ্কোচ ছিল না আমার দিদির কাছে, মনোরমা তাঁহাকে

কোনও কথা লিখিতেই সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। দিদি আমার স্নেহময়ী, ভাই-বৌকে ননদ এবং ননদকে ভাইবৌ কতটা ভালবাসিতে পারে, তাহা দুজনাতেই দেখিয়াছি। কোন বিষয় বলিতে কি চাহিতে দিদির কাছে হয় ত আমার সঙ্কোচ আসিত, কিন্তু মনোরমার তিনি একেবারেই আপনার, তাঁর কাছে তাঁর কিছুই সঙ্কোচ ছিল না।

—"যদি ফরিদপুর যাও, তবে গুরুদেবের জন্য খেজুরী গুড় আনিবে।"

এই খেজুরী গুড়ের ফর্‌মায়েস অনেক পত্রে আছে। ফরিদপুরের খেজুরী গুড় অতি উৎকৃষ্ট, তিনি খেজুরী গুড়ের পায়স রাঁধিয়া সকলকে খাওয়াইতে ভালবাসিতেন।

বেণীমাধব মনোরমার জন্য কিছু কিছু জিনিস আনিবেন, তাঁহাকে তাহা জানাইয়াছেন, তদুত্তরে মনোরমা লিখেছেন,— "এখন তুমি জিনিস আনিলে লোকের নিকট টাকা চাহিয়া এক প্রকার ভিক্ষা করিয়া আনিতে হইবে। সেই টাকা আমার জিনিস আনিতে খরচ করা ঠিক কি না, গুরুর চরণে নিবেদন করিবে, পরে যাহা বলেন, করিবে।" অন্য এক পত্রে লিখিয়াছেন,— "তোমার হাত খালি, ফরমায়েস লিখিলে কি হইবে? বাবু যদি শীঘ্র আসেন, তবে যদি কয়েকটি টাকা পাঠাইতে পারি, তবে কি কি জিনিস আনিতে হইবে লিখিব।" কিছুই আনিতে না বলিলে পাছে বেণীমাধব দুঃখিত হন, এই জন্যই যেন লিখিয়াছেন—

—"খুজরা, যদি কিছু পার কিনিয়া রাখিবে। দিয়াশলাই,—

গায়ের সাবান একখানা, কাপড় ধোয়া সাবান, সুতার বোতাম ছোট ও বড়, সুই-সুতা, যুগু, টুলু খুকীদের খেলনা কিছু, যুগু টুলুর বল (ন্যাকড়ার বল) যদি পার, কিছু খেজুরী গুড় আনিবে।"

—"তুমি আগ্রহ করিয়া (সেমিজ) তৈয়ারি করিয়াছ তাহা আমি নিশ্চয়ই (গায়ে) দিব। তোমার কম্বল বিক্রয় করিয়া সেমিজ করিয়াছ, তুমি নিজে শীতে কষ্ট পাইবে, শুনিয়া কষ্ট হইল। তোমার ইচ্ছা ছিল, গরম কাপড়ের কামিজ করিতে, সুবিধা-মত করিতে পারিতে, কয় টাকা হইলে তোমার গায়ের কম্বল হয় লিখিবা।"

—"তুমি যখন প্রণাম করিলে, মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে সুখী হইতে (লিখিয়াছ), আমার ত মনে হয় নাই, যা করিবার মনে মনেই করিয়াছি, আমি মাথায় হাত দিলে তুমি ভালবাস, কেন মাথায় হাত দিতে তুমি বলিলে না? তুমি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইতে সতু (বড়ছেলে) প্রভৃতি প্রণাম করিলেও আমি মাথায় হাত দেই না, অভ্যাস নাই।"

—"বেণী, এটা তুমি কি লিখিয়াছ? আমাকে মা বলিয়া ডাকিলে আমি লজ্জিত হইতাম, ইহা তোমার বুঝিবার ভুল। এ সকল ভাবিয়া মনে কষ্ট পাইবা না।"

—"তোমার কম্বল কিনিবে কি লুই কিনিবে, জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তুমি বলিয়াছিলে, ভাল কম্বল কিনিতে তোমার ইচ্ছা, যাহা তোমার ভাল লাগে কিনিবে।"

—"বেণী, তোমার কি যে মনের এক ভাব হইয়াছে, বুঝিতে

পারি না। তুমি কেবলই বল, তোমার সঙ্গে হাসিয়া কথা বলি না, ইহার কোন অর্থ আমি পাই না। সতুর মতন তোমাকে আমি মনে করি। ছেলেদের কিছু বলিলে রাগ হয় সত্য বটে, অন্যায় মত অসময়ে বলিলে রাগ হয়। তুমিই বল, সতুই বলুক, নিতুই বলুক, সকলকেই মন্দ বলি। সকলের চেয়ে সতুই বেশী বকা খায়, অধিক কি লিখিব, বৃথা কথা ভাবিয়া মনে কষ্ট পাইও না।"

—"তোমার গুরুদেবের সঙ্গে থাকিলে যদি মন ভাল থাকে, তবে যে কয় দিন ইচ্ছা হয়, থাকিতে পার, ঐখানে প্রাণে শান্তি পেলে সেই প্রকৃত শান্তি, তুমি আসিলে আমার উপকার হয় বটে কিন্তু আমি স্বার্থপর হইতে চাহি না।"

—"আমাদের লেপের এখন দরকার নাই, তোমার কম্বল ক্রয় করিবা, কারণ, টাকা হাতে হইলে লেপ এখানে করা যাইবে, কম্বল এখানে পাইবে না।"

—"আজকাল বেশ ঠাণ্ডা পড়িতেছে, আর সকলেই লেপ গায় দেয়, আমাদের ঘরে এখনও লাগে না, লুইতেই শীত বারণ হয়।"

—"গুরুদেব আগের চেয়ে শুকাইয়া অর্দ্ধেক হইয়াছেন শুনিয়া প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিয়াছিল। তিনিই যখন বলেন, ভাল আছেন, তিনি যাহাতে ভাল থাকেন তাহাতেই আমাদের ভাল। মনে করিয়াছিলাম গুরুদেব যতদিন কলিকাতা থাকিবেন, ততদিন কলিকাতায়ই থাকিব। গুরুর কি ইচ্ছা বুঝি না, কর্ম্মচক্রে পড়িয়া ইচ্ছার বিপরীত কাজ গুরুই করাইলেন। আহা, এমন গুরু পাইয়া আমরা ইহার মাহাত্ম্য বুঝিলাম না, গুরুদেব

কখন্ কি বলেন লিখিয়া জানাইবে, ঐ সকল কথা শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়।"

—"তুমি লিখিয়াছ, আমি তোমাকে দেখিলে লজ্জা বোধ করি, ইহা তোমার ভুল। এমন অনেক কাজ আছে, সতুকে (বড়ছেলেকে) দেখিলেও সামলাইয়া চলি।" মনোরমা কখনও ভাবের আতিশয্যে সঙ্কোচ হারান নাই। সর্ব্বদা সঙ্কোচময়ী ছিলেন।

—"তুমি মন্দ বলিলে ছেলেরা অসন্তুষ্ট হয় বটে, (সে) যখন তখন, পরে তোমার উপর (তাদের) বিরক্তিভাব কিছুই থাকে না। আমরা মারিলে কি বকিলে কি বিরক্ত হয় না? নিশ্চয় হয়, উহা স্থায়ী থাকে না। তুমি ছেলেদের কিছু বলিলে আমি কখন কখন মন্দ বলি, ছেলেদের মধ্যে যেই যাহাকে কাঁদায়, আমি তাহাকে মন্দ বলি, তুমি তাহাতে অসুখী হইয়া থাক? জানিতে চাই। অমনিই ছেলেরা অনেক সময় কেঁদে বিরক্ত করে, কেহ কিছু বলিয়া অনর্থক কাঁদাইলে ভাল লাগে না, তাই বলি।"

মনোরমা সন্তানদিগের উপর কঠিন শাসন করিতেন না। কিন্তু সকল সন্তানই তাঁহার একান্ত বাধ্য ছিল। নিতু বলিল, "মা, আমি পুকুরে স্নান করিব।" বাড়ীতে পুকুর ছিল। মা বলিলেন, "না, আজ স্নান করিবে না।" প্রায় এক ঘণ্টা কাল শিশু এই বায়না ধরিয়া মায়ের পেছনে পেছনে কাঁদিল, মা কোনও কথাই বলিলেন না। আর একদিন অন্য একটা জিনিসের জন্য আবদার করিল, মা বলিলেন "জানত? আমি একবার "না" বলিলে কিছুতেই পাবে না, তবে বিরক্ত করো না।" সন্তানরা জানিত তাহাদের মায়ের

"হাঁ" কখনও "না" হবে না, "না" কখনও "হাঁ" হবে না। ১২ বৎসরের ছেলেটি অবধি মাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া বাড়ীর বাহির হইত না। আমরা প্রতিদিন সকালবেলায় যখন উপাসনা করিতাম তখন ২ বৎসরের শিশুটি অবধি সেই সময়টুকু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, অন্যান্য শিশুগুলি আমাদের অনুকরণ করিয়া চোক বুজিয়া থাকিত, কিছু মাত্র চঞ্চলতা করিত না।

আমি কোন কারণে রাগ করিয়া কোনও ছেলেকে মারিলে, সে যখন কাঁদিতে থাকিত, আমি সহ্য করিতে পারিতাম না, সেই রোরুদ্যমান্ শিশুকে কোলে তুলিয়া লইতাম। তখন মনোরমা আমার এই কাজে আপত্তি করিয়া বলিতেন, "এরূপ করিলে ছেলেরা খারাপ হয়, শাসন করিয়া তখনই আদর করা ভাল নয়, হয় এরূপ শাসন (প্রহারাদি) না করা ভাল, আর করিলে যতক্ষণ ইচ্ছা কাঁদিতে দেওয়া ভাল।" মনোরমার শাসন-গুণে তাঁর সন্তানগণ যেরূপ পিতা-মাতার ভক্ত ও অনুগত হইয়াছিল, আমার পরম সৌভাগ্য যে, এই সুদীর্ঘ কালেও সেই সুশিক্ষার ফলভোগে আমি বঞ্চিত হই নাই।

স্নেহের বশীভূত হইয়া সন্তানদের দোষ না দেখা এবং রাগের বশীভূত হইয়া কঠিন শাসন করা, ছেলে-মেয়ে খারাপ করার ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আর নাই। তাই মনোরমা সেরূপ শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন না। আমার শাসনও তিনি সর্ব্বদা পছন্দ করেন নাই।

পারিবারিক উদ্‌বেগে স্থিরতা।

এক পত্রে ;—"টুলুর খুব জ্বর হইয়া বসন্ত উঠিয়াছিল, চারিদিন প্রায় জ্বরে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল, নিতুর গায়ে যে বসন্ত হইয়াছিল, সেই জাতীয় বসন্তই টুলুর উঠিয়াছিল। জ্বর খুব বেশী, সমস্ত গায়েই উঠিয়াছিল, এখন সারিয়া উঠিয়াছে, মুখে একেবারেই রুচি ছিল না। বসন্তগুলি শুকাইয়া গিয়াছে, খাওয়াতে রুচি হইতেছে। টুলু ভাল হইয়াছে, কোন আশঙ্কা নাই। যুগুর আমাশা নাই, পাঁচড়ার জ্বালায় অস্থির, হাতে, পায়ে, মাথায় পাঁচড়া হইয়াছে, হাত দুখানি উঠাইয়া রাখে, গায়ে চুলকানী আছে, হাত নাড়িতে পারে না। দিনে আমরা পাঁচড়া গালিতে যাই, ভয়ে দেয় না, রাত্রে বোধ হয় স্বপ্নে দেখে, আমরা পাঁচড়া গালিতেছি, 'মা গো মা গো' করিয়া ভয়ানক চীৎকার করিতে থাকে। খুকীর পাঁচড়া আছে, নিতুর পাঁচড়া কমিয়াছে, চিতুরও কমিয়া আসিতেছে, সতুর হইয়াছে, বাবুরও হইয়াছে, জেঠাইমার হইয়াছে, আমার অল্প হইয়াছে, টুলুর ত আছেই। আমি (ধ্যানে) বসিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, রোজই বসিতাম; ৩.৪ ঘণ্টা বসিতাম, সপ্তাহে একদিন, কিছুদিন সমস্ত দিন বসিব ভাবিয়াছিলাম, ওদের অসুখে গোলমাল হইয়া গিয়াছে। মায়া-মোহে জড়িত আমি, এদের অসুখ দেখিয়া কি প্রকারে বসিব ? আমার সে প্রকার অবস্থা গুরু দেন নাই।" এইরূপ উদ্‌বেগের মধ্যেও তিনি বসিলেই সমাধিস্থা হইতেন।

বেণীমাধব প্রভৃতির ইচ্ছা ছিল, মনোরমা সংসারের সমস্ত কাজ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়া, আর কাহারও দিকে না তাকাইয়া, সর্ব্বদা ধ্যান-ধারণায়ই নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহারা তাঁহার সংসারের বন্দোবস্ত করিবেন, কিন্তু তাঁহারা বুঝিতেন না যে, মনোরমা সংসার-বিদ্বেষী বিরক্ত-সন্ন্যাসিনী নহেন, তিনি গার্হস্থ্যধর্ম্মাবলম্বিনী যোগিনী। তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই, সকলকেই পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন। নিজের ইচ্ছামত মনোরমাকে চালাইতে, এমন কি, খাওয়াইতে পরাইতে গিয়াও বেণী ও জ্যেঠাইমা মনে ক্লেশ পাইয়াছেন, মনোরমা নিজের পথ কখনও পরিত্যাগ করেন নাই।

এক জনার উপর যখন দশ জনার ভক্তি-শ্রদ্ধা বা ভালবাসা জন্মে তখন সেই দশ জনার মধ্যে প্রতিযোগীতা স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া পড়ে, ইহা হইতে মনান্তর ঘটে। এরূপ অবস্থায় কাণ্ডারী যদি কোনও দিকে বিন্দুমাত্র ঝোঁক দেন, তবেই ভরা ডুবিল, ঘর ভাঙ্গিল। মনোরমার চরিত্রে ও ব্যবহারে কেহই এমন কিছু দেখিতে পান নাই, যিনি মনে করিবেন যে, তাঁহার অপেক্ষা তিনি অন্যকে অধিক ভাল বাসিতেন, বরঞ্চ সকলেই ভাবিত যে, আমাকেই সকলের অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন, এই জন্যই সমস্ত পর লইয়া আজীবন অনটনের মধ্যেও তাঁহার সংসার চিরকাল সমান ভাবে চলিয়াছে। এ বিষয় তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্," এই তত্ত্বকথাটী মনে পড়ে।

—"গুরুদেবের শরীর কেমন লিখিয়া জানাইবা। রেলে (বৃন্দাবন) যাইতে গুরুদেবের শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়ে নাই ত? বিশেষ করিয়া

লিখিবে। গুরুদেবের চরণে তুমি আমার হইয়া প্রণাম করিবে। ভক্তগণ, কে কেমন আছেন সকলের চরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিবে। যোগ জীবন বাবু, জগবন্ধু বাবু, শান্তি, বুড়া ঠাকুরুণ, কেমন আছেন? দিদিমাকে প্রণাম দিবে, উক্ত বাবুদেরে প্রণাম। শান্তির বড় ছেলে দুটী, ছোট ছেলেটী কেমন আছে লিখিবে।" ইত্যাদি।

—"বৃন্দাবন স্থানটী কেমন তোমার লাগিতেছে? কীর্ত্তন কেমন হইতেছে? গোঁসাই কি বলেন, সকল লিখিবা। মনে হয় কতকাল হইয়াছে যেন গুরুদেবকে দেখি না। তোমাদের ছেড়ে আসিয়াছি, (যেন) অনেক দিন।"

রেবতী ও বেণীর নিকট মনোরমা যে সকল চিঠিপত্র লিখিয়াছেন সে সকলের মধ্যে গুরু-ভাই ভগিনী, আত্মীয় স্বজন সকলের সংবাদ জানিবার জন্যই আগ্রহ। সকল চিঠি মিলাইয়া দেখিলে মনে হইবে যে যাহাদের খোঁজ করেন নাই তেমন বন্ধু বান্ধব মোটেই নাই। সকলের জন্যই টান; সে টান একটানা স্রোতের মত অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে।

ঢাকায় শ্রীগুরুদেব যখন ধূলট করেন, সেই অনির্ব্বচনীয় মহোৎসবে আমরা যাইতে পারি নাই, কেন না গুরুদেব তখন আমাদিগকে গিরিডিতেই কিছুকাল থাকিতে বলিয়াছিলেন, সেই সময় মনোরমা শ্রীমান্ বেণীকে লিখিয়াছেন—

—"ধূলটে অনেক কাণ্ড হইতেছে, তোমরা আনন্দে দিন কাটাইতেছ, শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম। কি অপরাধে আমরা এ ব্যাপার দেখিতে পাইলাম না বুঝিতে পারি না, তোমরা দেখিয়া

জীবন সার্থক করিতেছ, তোমরা ধন্য হইলে। বাবু এ কয়েক দিন পর্য্যন্ত "ঢাকা ঢাকা" করিয়া কষ্ট পাইতে ছিলেন, আমাদের রাখিয়া কি প্রকারে যাইবেন, গতিকেই যাওয়া হইল না। গুরুদেব কবে কলিকাতা আসিবেন লিখিবা। গুরুদেব আসিলেই আমরা যাইব এইরূপ ইচ্ছা।"

সংসারের কথা, খরচের কথা, কোথাও যাওয়ার কথা, কাজ-কর্ম্মের কথা, ছেলে পিলেদের পীড়ার কথা সমস্তই গুরুদেবকে শুনাইতে পত্রে অনুরোধ আছে। সেই গুরুগত-প্রাণা গুরু ভিন্ন কিছুই জানিতেন না।

মনোরমার চিঠিপত্রে আপনাকে যতটুকু প্রকাশ করিয়াছেন কথা বার্ত্তায় সেটুকুও পারিতেন না। প্রাণের ভাব প্রকাশ করিতে তাঁহার রসনা সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত ছিল। কিন্তু তাঁহার মুখের প্রফুল্লতা ও দৃষ্টির প্রসন্নতা মনের ভাব ব্যক্ত করিত, সকলেই সহজে সে নীরব-ভাষা পড়িতে পারিত, তাহাতে জটিলতা ছিল না।

নানাজনের চিঠিপত্র

(১ম পত্র)

লেখক—বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ প্রচারক ও আচার্য্য অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস মহাশয়।

বরিশাল।

২৯শে এপ্রিল ১৯১৮

—"আর বাহিরে থাকিতে ইচ্ছা করে না, মনোরমা যেমন ভগবান্‌কে লইয়া ধ্যানের ঘরে দিনের পর দিন কাটাইয়া দিত, ইচ্ছা হয়,

আমার জীবনের শেষের কয়েকটা দিন ঐ ভাবে যাপন করি। মনোরমা সরলা, সাধ্বী, পবিত্রা এবং যেরূপ ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিণী ছিল, তাহাতেই ঈশ্বরের কৃপায় ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমার বাহিরের দৃষ্টি দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ভগবান্ কৃপা করিয়া কবে মনোরমার ন্যায় আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া দিবেন? মনোরঞ্জন, তোমার কি মনে নাই, তুমি ও আমি দ্বার দ্বার ভিক্ষা করিয়া সমাজে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া বৈরাগ্য-সাধনের ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম? মনোরমা তাহাতে কত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার ইহলোকের দিন ক্রমে ফুরাইয়া যাইতেছে। মনোরমার জীবন-চরিতের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইলে দেখিতে পাইব, এমন আশা ছিল না, মনে হয়, আমারই উপকারের জন্য আমি ইহলোকে থাকিতে থাকিতেই আমাকে সেই সুযোগ দান করিলেন"।

(২য় পত্র)

লেখক—বরিশালের প্রবীণ ব্রাহ্ম ও সঙ্গীত রচক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দাস।

বরিশাল

২৮।৪।১৮

"আমি সেই পূত-চরিত্রার বিষয় যতই চিন্তা করি, ততই যেন এক গভীর ভাব-সমুদ্রে ডু'বে যাই! এমন সরল, শান্ত ও মধুর প্রকৃতি আমি এ জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি। সুখে, দুঃখে ও দৈন্যে সমভাব। ঘোর দারিদ্র্যের কশাঘাতেও মুখের প্রফুল্লতা বিনষ্ট করিতে পারে নাই। সর্ব্বদাই সহাস্য-বদন। বিপদে এরূপ ধৈর্য্যশীলা রমণী সংসারে আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইঁহার

আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। সে চরিত্র সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তিনি যে সমাধির অবস্থায় অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিতেন, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক্ হয়েছি!

"নীতির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও নারী-জীবনে সেরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। যাহাতে সন্তানগণ নীতি-পরায়ণ হইতে পারে, সেদিকে তাঁর তীব্র দৃষ্টি ছিল। * * * এক দিনের জন্যও তিনি নিজের অভাব কাহাকেও জানিতে দিতেন না। দৈন্যের মধ্যেও অন্নপূর্ণা, অতিথি-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আমি সেই সতীর পূত-চরিত্র সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না। সেই পুণ্য-কাহিনী শ্রবণে শুষ্ক প্রাণে সুধারস সঞ্চারিত হয়। ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করুন, যেন দেবীর দেব-দত্ত ধর্ম্মভাব ধ্যানে এ পাষাণ-হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হয়"।

(৩য় পত্র)

লেখক—শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ ঠাকুরতা।

—"আত্মপ্রতিষ্ঠা বা লোকরঞ্জনের জন্য মহাত্মাদিগের সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। আমার সে দোষ হওয়া অসম্ভব নহে; কেননা, আমি ভুলের মধ্যেই আছি।

—"আমি হাজারীবাগ হইতে ৩।৪ বৎসর মনোরমা দেবীর সহিত একসঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে সন্তাননির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তিনি একজন উচুদরের মহাত্মা, ইহা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার জীবনে বিশেষ কোন অলৌকিক ঘটনা বা কোন বুজ্‌রুকীর কথা শুনি নাই। আমি বুজ্‌রুকী ভালবাসি না। বুজ্‌রুকী দেখিলে হয় ত বা তাঁহাকে সাধু বলিয়া মানিতে পারিতাম না।

বুজ্রুকীকে আমি সাধুতার অঙ্গ বলিয়া মনে করি না। তাঁহার স্বাভাবিক উদার অমল ব্যবহারই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই ৩।৪ বৎসর বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমার দোষদর্শী চক্ষু তাঁহার ব্যবহারে কোন ত্রুটি দেখিতে পায় নাই। তাঁহার সরলতা, উদারতা, সদাশয়তা, পরদুঃখকাতরতা, দয়া, স্নেহ, ভালবাসা সকলই অদ্ভুত। তাঁহার সমদর্শিতা ও নির্ভরশীলতার বিষয় চিন্তা করিলে অবাক্ হইতে হয়। স্বামী, পুত্র প্রভৃতি স্বজন এবং গৃহস্থিত অন্যান্য লোকদিগের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে কখন তাঁহার বৈষম্য দৃষ্ট হয় নাই। তিনি কখনও শাস্ত্রাদি পড়িয়াছেন বলিয়া শুনি নাই; কিন্তু তাঁহার আচার-ব্যবহার এবং কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া মনে হইত, তিনি যেন শাস্ত্র-চক্ষু সূক্ষ্ম-দর্শী যোগিনী ছিলেন। তিনি আত্মীয় পর সকলের জন্যই প্রয়োজনানুসারে ব্যবস্থা করিতেন। স্তন্যপায়ী শিশু এবং রোগীর সুব্যবস্থা করিয়া পরে স্বামী, পুত্র বা গৃহস্থ অন্যান্য সকলের খোঁজ-খবর করিতেন। তাঁহার এ সমস্ত ব্যবহারই এমন স্বাভাবিক স্নেহ, ভালবাসা এবং সরলতা-মাখা ছিল যে, তিনি সহজেই সকলকে আপনার করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার পরদুঃখকাতরতা এবং ঈশ্বরনির্ভরতাও আশ্চর্য্য। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, একদিন একটি ব্রাহ্ম ভদ্রলোক, পরিবার সহ অনশনের পর নিজ অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া মনোরমা দেবীর নিকট ২৲ টাকা চাহিলেন। সেদিন মাত্র দু'টাকাই সম্বল ছিল। তিনি এমনি ব্যথীত হইয়া পড়িলেন যে, ছেলেপিলে বা অন্য কাহারও দিকে তাকাবার আর তাঁহার অবসর হইল না। ঘরে যাহা ছিল, তাহাই সে ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটিকে দিয়া যেন কথঞ্চিৎ স্বস্তি লাভ করিলেন। ঘরে

আহার্য্য নাই, ৬।৭টি ক্ষুধার্ত্ত বালক-বালিকা মাকে ঘিরিয়া আছে, আর মা স্থির-ধীর-শান্ত-ভাবে বসিয়া আছেন, চিন্তার রেখাটি মাত্র মুখে দৃষ্ট হইতেছে না, ইহা কি অলৌকিক ব্যাপার নহে? তাঁহার পবিত্র সঙ্গে নির্ভরতা জিনিষটা কি, তাহার একটু আভাষ বুঝিয়াছি। সে দিনের ব্যাপার শেষে কি হইল, তাহা আমার মনে নাই।

"তাঁহার আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, হাসন-ভাষণ সকলই স্মরণীয়। তাহা আর জীবনে ভুলিবার নহে।

"আমার জীবনের যাহা কিছু পরিবর্ত্তন, তাহার মূলে তিনিই। শুনিয়াছি, সাধুসঙ্গলাভ হইলে ভগবৎকৃপায় সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়। পরন্তু তাঁহার সমাধির অবস্থাও দর্শন করিয়াছি। সমাধি সম্বন্ধে আমার কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই; কিন্তু ঋষিরা বলেন, চিত্ত শান্ত ও সমাহিত না হইলে, বিষয় হইতে বিরত না হইলে, সমাধি হয় না। কিঞ্চিন্মাত্রও বিষয়বাসনা থাকিলে চিত্তচাঞ্চল্য নষ্ট হয় না। চঞ্চল চিত্তে যোগলাভ হয় না। সমাধি অবস্থায় তাঁহার সংসারের আবিলতাহীন সাম্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অনেকে ধন্য হইয়াছেন এবং আমিও যথেষ্ট কল্যাণ লাভ করিয়াছি।

"তিনি স্বভাবতঃই অল্পভাষী ছিলেন এবং বাহ্যাড়ম্বর মোটেই ভালবাসিতেন না। তিনি এতই চাপা ছিলেন যে, ভিতরে প্রকাশিত তত্ত্ব বাহিরে কখন প্রকাশ করিতেন না এবং দশজনের মধ্যে কোন ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন বলিয়াও শুনি নাই।

"তাঁহার জীবন আমার উপর অনেক কাজ করিয়াছে এবং করিতেছে"।

(৪র্থ পত্র)

লেখক—শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন বি, এ,
শিক্ষক কলিকাতা সিটি স্কুল।

১৫।৫।১৮

"বরিশাল জেলাস্কুলে পাঠকালে আমি মহলানবিশদের বাসায় অবস্থিতি করিতাম। এখনও স্পষ্ট মনে আছে, একাধিকবার স্নান-কালে তিনজন ব্রাহ্ম যুবাপুরুষকে রাস্তা দিয়া গমন করিতে দেখিয়াছিলাম। পরম শ্রদ্ধাভাজন মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। তাঁহার উজ্জ্বল গৌরকান্তি ও প্রতিভাপূর্ণ মুখচ্ছবি, আমার চিত্তে ভক্তির উদ্রেক করিত। তখন আমি হিন্দু-সভার বাল্যাশ্রমের সভ্য ছিলাম। সাক্ষাৎভাবে ইঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল না। ভক্তিভাজন সুপ্রসিদ্ধ অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের সংস্রবে আসিয়াই ব্রাহ্ম সমাজকে ভালবাসিতে আরম্ভ করি। ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া গুহ মহাশয়ের সুমিষ্ট উপাসনা ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা আমাকে ব্রাহ্ম সমাজের দিকে আরও আকর্ষণ করিতে লাগিল। ঘনিষ্ঠভাবে না মিশিয়াও দূর হইতে বন্ধুদিগের মুখে ইঁহার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। ঘোর দারিদ্র্যেও ইঁহারা পরম সুখী, এ কথা আমি ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিবার পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। ব্রাহ্ম সমাজে আসিবার সময়ও ইঁহারই সদা-প্রফুল্ল মুখখানি আমাকে ঘোর সংগ্রামের মধ্যে আনন্দ প্রদান করিত; ইঁহার চিরনির্ভরশীল জীবন আমাকে উৎসাহ ও সাহস দিয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়া ইঁহাকেই গুরুরূপে পাইয়াছিলাম। যখন আমার স্ত্রী, ব্রাহ্ম-সমাজে আসিবার

জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, ইনিই তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য আমাকে সাহস দেন এবং ইঁহারই গৃহে তাঁহাকে কন্যার ন্যায় গ্রহণ করেন। গৃহিণীর সেবা ও পরিচর্য্যা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। একদিকে অভাব, নিত্য আহারের বন্দোবস্ত নাই, অন্যদিকে একজন হিষ্টিরিয়া রোগিণীর ভার ইচ্ছা করিয়া মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা ভাবিলেও অবাক্ হইতে হয়। এই সময়ে কোন দিন আমি তাঁহার মনে অসন্তোষের চিহ্নও দেখি নাই, সে কি যত্ন! সে কি ভালবাসা! একমাত্র পুত্র বলিয়া পিতামাতার বড়ই আদরের ছিলাম, বড় অভিমানী ছিলাম। তাঁহার (মনোরমার) ব্যবহারে এমন একটু খুঁত পাই নাই, যাহা দ্বারা আমার অভিমানে একটুও আঘাত লাগিতে পারিত। এই পরিবারের সহিত ব্যবহারে আমার কোনদিন সঙ্কোচ-বোধ হয় নাই। কতদিন ইঁহার নিকট জলখাবার চাহিতাম, যেদিন ঘরে কিছু থাকিত না, হাসিয়া বলিতেন, "আজ তো ঘরে কিছুই নাই।" যৌবনে এই পরিবারটিকে আদর্শ পরিবার বলিয়া আমরা স্বামিস্ত্রীতে গ্রহণ করিয়াছিলাম। বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছিলাম, দারিদ্র্যই সম্পত্তি, অভাবই সুখের আকর।

তাঁহাকে কখনও রাগ করিতে দেখি নাই। সদা প্রফুল্ল, হাসিভরা মুখ, আবার কত গম্ভীর; সহানুভূতির কতই আকর্ষণ। যখন সম্মুখে দাঁড়াইতেন, যেন এক পবিত্র, প্রসন্নময়ী দেবিমূর্ত্তি! সাক্ষাৎ করুণা!

এত লিখিবার আছে, যাহা ফুরায় না। তাঁহার নাম স্মৃতিপথে আসিলে প্রাণে যে ভাব আসে, বাক্যের সাধ্য নাই যে, সে প্রকাশ করে।

(৫ম পত্র)

লেখক—শ্রীযুক্ত করুণাকুমার দাস বি, এ— কানপুর

দেরাদুন

ওঁ ১৫।৫।১৮

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

"আপনার সহধর্ম্মিণীর জীবন-চিত্র ২য় খণ্ড মুদ্রিত হইতেছে, ইহা আমাদের পক্ষে অতিশয় আহ্লাদের বিষয়। তাঁহার পুণ্য ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কাহিনী যতই লোকের নিকট বিদিত হয়, ততই আমাদের দেশের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে। রমণীগণ সমাজরূপ হর্ম্ম্যের ভিত্তিস্বরূপ, তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া পুরুষ যে শিক্ষা পাইবে, তাহার দ্বারা দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গল বা অমঙ্গল সূচিত হইবে।

"আমার পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয় যে সময় বাগেরহাটে পোষ্ট-মাষ্টার ছিলেন, তখন আপনার স্নেহগুণে আমাদের আপনকার পরিবার-সকলের সহ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। অধ্যয়ন জন্য আপনি উৎসাহ প্রদান করিয়া বরিশালে লইয়া গিয়া আপনার গৃহে স্থান দান করিয়াছিলেন, তাই আমার ভবিষ্যজীবন গঠন করিবার সুবিধা পাইয়াছিলাম। সুকুমার বয়সের ছাপ মানুষের সহ চিরদিন থাকিয়া যায়। ভগবৎ-চরণে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি যে, সৌভাগ্যবশতঃ আপনাদের পরিবারে স্থান পাইয়াছিলাম। জীবনে সেই প্রথম পিতাঠাকুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিদেশে বাস করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু যিনি বিধাতা, তিনি পূর্ব্ব হইতেই আপনাদের স্নেহ-ক্রোড় আমার জন্য প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আপনার গৃহে যাইয়া আমি আপনাদেরই

একজন বলিয়া প্রথম হইতে গণ্য হইয়াছিলাম। মনে হয়, সে কেবল তাঁহার (মনোরমার) উদার ও সরল হৃদয়ের গুণে। বিলাসশূন্য, অনলস, সম্মানিত বংশের একজন হইয়াও আত্মাভিমানবর্জ্জিত, সেই অল্পভাষী, মাতৃভাবপূর্ণ চিত্রখানি এখনও স্পষ্ট মনে জাগরূক আছে। পুত্রের ন্যায় স্নেহ পাইয়া প্রথম হইতে আমি আপনার পুত্রকন্যাগণের "করুণদাদা" হইয়াছিলাম। ইহা যে কেবল আমার পক্ষেই প্রযুজ্য, তাহা নহে, পরিবারে যাঁহারাই ছিলেন বা আগন্তুক হইয়া আসিতেন, তাঁহারাই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, অপর গৃহে বাস করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিবার অবসর তিনি কখনই কাহাকে দিতেন না। তাঁহার প্রকৃতিতে আমি প্রথম হইতেই এই দেবভাব লক্ষ্য করিয়াছিলাম। সঙ্কীর্ণতা যেন চিরদিনের জন্য তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল।

স্কুলে পড়িতাম,—

"অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং।
উদার চরিতানন্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্॥"

আর আপনার গৃহে পুস্তকগত বাক্যের জীবন্ত সাক্ষ্য পাইতাম, দৃষ্টান্তের এইরূপ মহতী শক্তি।

তৎপর তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে আমার বলা ধৃষ্টতামাত্র। কারণ, তিনি সে রাজ্যে যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা আমার জানিবার ক্ষমতা হয় নাই। পুরাকালে আমাদের দেশে ব্রহ্মজ্ঞ-মহিলাদের কথা পড়িয়াছি। কিন্তু চক্ষের সম্মুখে দেখিবার সুযোগ

ভগবান্ করিয়া দিয়াছিলেন। তাই সৌভাগ্যবশতঃ দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। প্রথম হইতেই আমি বরিশালে লক্ষ্য করিতাম, তিনি কথা অতি অল্প বলিতেন। নীরবে সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক ধীর ও গম্ভীর-ভাবে সকল কার্য্য সমাধা করিতেন। চলিত কথায় বলে, "হাতে কাম মনে রাম" এইরূপ ভাবে জীবনযাপন করিতেন। তৎপর আপনি যখন বরিশাল হইতে অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক শক্তির কথা শ্রবণ করিয়া বড় আনন্দিত হইতাম। কতক দিবস পর যখন আপনি ভবানীপুর বাস করিতেছিলেন এবং পরহিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া "হিপ্‌নোটিজম্" দ্বারা নানা দুরারোগ্য ও ডাক্তারের অসাধ্য-রোগ হইতে লোকদিগকে মুক্ত করিয়া কলিকাতা ও তৎসন্নিকটস্থ স্থানের লোকদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন, সেই সময় আমিও কলিকাতায় বাস করিতেছিলাম। অবসর পাইলেই আপনার নিকট যাইতাম। তখন একদিন দেখিলাম, "মা" ধ্যানস্থা হইয়া দেড় দিবস রহিয়াছেন। ক্রোড়ের শিশু পর্য্যন্ত একবারও ক্রন্দন করিতেছে না। যে আসনে বসিয়াছেন, সেই আসনেই স্তিমিত-লোচন হইয়া রহিয়াছেন। দেখিয়া যুগপৎ আশ্চর্য্য ও আনন্দ হইল। পুস্তকের অধীত কথা পাইয়া সেই দিবস চক্ষু ও কর্ণের বিবাদভঞ্জন করিলাম। মহর্ষি বেদব্যাস যে লক্ষণা করিয়াছেন, তাহা চক্ষে দেখিতে পাইলাম।

"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥"

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"
"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্ত কালেহপি ব্রহ্ম-নির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥"

গীতা।

(৬ষ্ঠ পত্র)

লেখক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার।

পুরুলিয়া।

১৮।৫।১৮

আমার বহুজন্মের ভাগ্যের ফলে আমি জীবনে দুইবার মনোরমা দেবীর আশ্রয়ে বাস করিতে পাইয়াছিলাম। প্রথম বোলপুর শান্তি-নিকেতনে এবং দ্বিতীয়বার হাজারিবাগে। বোলপুরে যখন ছিলাম, তখন আমি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। সাধু, শাস্ত্র, গুরু প্রভৃতির কোনও ধারই ধারিতাম না এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ একটা কোনও ধারণা যে ছিল, তাহাও নয়। সে সময় তিনি প্রায় প্রত্যহ সাধন করিতে বসিয়া সমাধিস্থ হইতেন। অপরাহ্নে তাঁহার স্বামী ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত মনো-রঞ্জন বাবু তাঁহার কর্ণে নাম শুনাইয়া তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করিতেন। এই ব্যাপারের কিছুই আমি বুঝিতাম না। সমাধির কথা পুস্তকে পড়িয়াছিলাম এবং লোকের মুখেও শুনিয়াছিলাম; কিন্তু তৎপূর্ব্বে

সমাধিস্থ কোনও ব্যক্তিকে দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই; কারণ, এরূপ লোক যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রথম দর্শন হইতেই আমি তাঁহাদের পরিবারের প্রতি এমনই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তাঁহাদিগকে কখনও আপন জন ব্যতীত অন্য কিছুই মনে করিতে পারি নাই। এই আকর্ষণ এবং আত্মীয়তা-বোধ তাঁহাদের ব্যবহারে আমার দিন দিনই বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাঁহাদের সংসার অনটনের সংসার; কিন্তু কোনও অবস্থাতে এক মুহূর্ত্তের তরেও তাঁহার মলিন মুখ দেখি নাই। তিনি সদাই হাস্যমুখী ছিলেন কোন প্রকার প্রদর্শনের ভাব তাঁহাতে কখনও দেখি নাই। ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ কথা তাঁহার মুখে কখনও শুনি নাই, যদিও তাঁহার ধর্ম্ম-জীবন খুব উচ্চ ছিল।

আমাদের প্রত্যেকেই ভাবিতেন, "আমাকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করেন।"—সংসারের সমস্তই ভুলিয়া যাইতে পারি, কিন্তু তাঁহার মধুর ব্যবহার কখনও ভুলিতে পারিব না। লোকের নিন্দা বা প্রশংসার দিকে চাহিয়া কখনও তাঁহাকে কার্য্য করিতে দেখি নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার অনটনের সংসার। দুধ যাহা আসিত, তাহাতে সকলের কুলাইত না, যাহারা নিতান্ত অসুস্থ বা যেদিন যাহাদের নিতান্ত প্রয়োজন, তাহাদিগকেই তিনি দুধ দিতেন। এ বিষয় স্বামী ও সন্তানগণের সঙ্গে অন্যান্য লোকের পার্থক্য করিতেন না। এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে যে, আমাদিগকে দুধ না দিয়া প্রয়োজন বোধে তাঁহার স্বামী ও পুত্রদিগকেই দিয়াছেন। নিজেদের নিতান্ত

প্রয়োজন সত্ত্বেও আমরা বাহিরের লোকদিগকে ভাল করিয়া খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকি, ভয় পাছে নিন্দা হয়। তাঁহার পর কেহ ছিল না, এবং নিন্দা প্রসংশার ধারও তিনি ধারিতেন না, কাজেই তাঁহার ব্যবহার অতি সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। এই প্রকার ব্যবহার আমি এ পর্য্যন্ত কোথাও দেখি নাই।

আমি হাজারিবাগে যাইয়া মাসাধিককাল তাঁহাদিগের কাছেই ছিলাম। সে সময়কার একটী ঘটনা আমার বিশেষ ভাবে মনে আছে। যতদিন তাঁহাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমার শরীর ও মনের অবস্থা খুব পবিত্র ছিল। অনেক সময় নির্জ্জনে বসিয়া ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মনোরমা দেবীর জীবনের প্রভাবেই আমার তাদৃশ অবস্থা হইয়াছিল। হাজারিবাগ থাকিতে আমি তাঁহাকে নিয়মিতভাবে সাধনের জন্য বসিতে দেখি নাই, মধ্যে মধ্যে বসিতেন। বসিয়াই সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। ২০।২৫ ঘণ্টা সমাধিস্থ থাকিতেন। সে সময় তাঁহার মুখশ্রী স্বর্গীয় প্রভায় দীপ্ত হইত। আমি দেখিয়া অবাক হইতাম। তাঁহারা যেদিন হাজারিবাগ পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া আমি সেই শূন্য গৃহে ২।৩ ঘণ্টা ক্রমাগত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়াছিলাম; কোনও প্রকারে চিত্তস্থির করিতে পারি নাই। ইহাতেই তাঁহার স্নেহ ও আকর্ষণ কত গভীর ছিল কিছু বুঝা যাইবে।

আমি তাঁহার ভিতর যাহা দেখিয়াছি তাহা সম্যক বুঝাইয়া বলিবার শক্তি আমার নাই। আমি বিশ্বাস করি তাঁহার কৃপা ও আশীর্ব্বাদেই আমার সদ্গুরু লাভ হইয়াছে।

(৭ম পত্র)

সাধনাশ্রম

লেখক—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত,

ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক।

২১০।৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬ই জুন ১৯১৮।

——"আপনার ধর্ম্মশীলা পত্নী স্বর্গীয়া মনোরমা দেবীর জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে আমি যাহা জানি, তাহা লিখিয়া পাঠাইবার জন্য আপনি একখানি পত্র লিখিয়াছেন। ঐ পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া বড়ই সুখী হইয়াছি, তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আমার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া পত্রের উত্তর দিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল।

আমি তরুণ বয়সে যখন ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, তখন অনেকবার বরিশাল গমন করিয়া আপনার গৃহে অতিথি হইয়াছি। ঐ সময় আপনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন, আপনার আয় অতি অল্পই ছিল, কিন্তু আপনার এবং দাতা কালীকুমারের কন্যা মনোরমা দেবীর মনটা খুব বড় ছিল বলিয়া অতিথি ও ধর্ম্মবন্ধুদিগকে আপনারা আপনাদের পরিবারের লোকের মত মনে করিয়াই গ্রহণ করিতেন। মনোরমা দেবী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ঐ সকল লোকদিগকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতেন, তাঁহার যে শত প্রকারের অভাব আছে, সে কথা তিনি মনেও করিতেন না। তাঁহাকে যে লোকের পরিচর্য্যার জন্য

দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে হইত, সে জন্য তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তিখানি মুহূর্ত্তের জন্যও ম্লান হইয়া পড়িত না। তাঁহার সরল, সুপবিত্র ও আধ্যাত্মিক জ্যোতিবিমণ্ডিত মুখখানি দর্শন করিলেই হৃদয়ে একটি সমধুর ভক্তির ভাব জাগিয়া উঠিত। আমার মায়ের নামও মনোরমা, এবং তাঁহার স্বভাবের ন্যায় অত্যন্ত সরল ও পবিত্র ছিল। এই জন্য তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার স্নেহ পাইয়া, অল্পসময়ের মধ্যেই আমার অন্তরে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। মনোরমা দেবী বেশী কথা কহিতেন না, তর্ক করিতেন না, একটি সুমধুর সলজ্জ হাস্যশ্রীই তাঁহার মুখখানিতে ফুটিয়া থাকিত। অথচ ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা উপস্থিত হইলে, তিনি ঈষৎ হাসিয়া দুই একটি কথায় আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। সেই দুই একটি কথা আমাদের বেশ ভাল লাগিত।

একবার আপনি এক নৌকায় সপরিবারে মাণিকদহ গ্রামে ব্রহ্মোৎসবে যাইতেছিলেন। আমিও আপনাদের সঙ্গী হইয়াছিলাম। ঐ সময় নৌকার মধ্যে মনোরমা দেবীর অত্যন্ত জ্বর হইয়াছিল এবং ভয়ানক মাথা ধরিয়াছিল। তখন সেই অপরিচিত স্থানে ও নদীর মাঝখানে কোথায়ই বা ডাক্তার, কোথায়ই বা ঔষধ? রোগিণী নীরবেই রোগযন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার কোন রকম চাঞ্চল্য ও অসহিষ্ণু ভাব লক্ষ্য করিতে পারিলাম না।

কিন্তু মনোরমা দেবীর আশ্চর্য্য সাধনা ও ধর্ম্মভাবের কথা স্মরণ করিয়া এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না। আমার আজ একটী বিশেষ দিনের বিশেষ কথা লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে। সাধকদিগের জীবন চরিতে ও হিন্দুশাস্ত্রে সমাধির কথা পাঠ

করিয়াছিলাম, আমি কিন্তু সেই অবস্থায় মানুষের মধ্যে যে কি রকম লক্ষণ সকল প্রকায় পায়, তাহা ইতিপূর্ব্বে কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। সেবার বরিশাল সহরে যখন আপনার গৃহে বাস করিতেছিলাম, তখন একদিন বিকাল বেলায় হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, মনোরমা দেবী সাধন করিতে বসিয়া সমাধিতে ডুবিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া মনোরমা দেবীর গৃহে প্রবেশ করিয়া যে দৃশ্য দর্শন করিলাম, তাহা বহুদিন আমার স্মরণ থাকিবে। দেখিলাম, কোথা-য়ই বা তাঁহার সংসার, কোথায়ই বা তাঁহার ছেলে-মেয়ে, তিনি সকলের কথাই বিস্মৃত হইয়া অসীম সুন্দরের অপরূপ রূপের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছেন, অনেকক্ষণ পরে আপনি তাঁহার কাণের কাছে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তিনি চোখ মেলিয়া চাহিলেন। যতদূর মনে পড়ে, তাহাতে মনে হয়, মনোরমা দেবী সেই দিন তিন ঘণ্টা সমাধিতে মগ্ন হইয়া-ছিলেন। নিরাকার অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে ডুবিয়া মানুষ যে কি অমৃতরস পান করিতে সমর্থ হয়, তাহাও সে দিন উত্তমরূপ অনুভব করিতে পারিলাম।

এই সাধনপরায়ণা নারী যদি অকালেই সংসার হইতে প্রস্থান করিয়া পরলোকগমন না করিতেন, তাহা হইলে আজ পরিণত-বয়সে হয় ত তাঁহার কতই উন্নত ধর্ম্মজীবন দর্শন করিতে পারিতাম। কিন্তু ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা, তাহাই পূর্ণ হইয়াছে, এখন আপনার রচিত জীবন-চিত্র গ্রন্থের মধ্যে যেন মনোরমা দেবীর জীবনের কাহিনী পাঠ করিয়া বিশ্বাসের ও সাধনের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হই"।

(৮ম পত্র)

লেখিকা শ্রীমতী শোভনা নন্দী।

(স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা।)

কালীকচ্ছ

২০-৫-১৮

"স্বর্গীয়া মনোরমা দেবীর পবিত্র সংস্পর্শে আসিবার সুবর্ণ-সুযোগ আমার জীবনে একবারের জন্য ঘটিয়াছিল। একবার কিছুদিন ধরিয়া ম্যালেরিয়াতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ি, আমার পিতা-ঠাকুর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় আমাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য কোথায় লইয়া যাইবেন, এ চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়েন। এই সময় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বাবু সপরিবারে হাজারিবাগ জুলুপার্কে ছিলেন। তিনি আমায় সেখানে লইয়া যাইবার জন্য বাবাকে অনুরোধ করেন। এই পরিবারের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলাম; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে গাড়ী হইতে নামিলাম, অমনি কাকীমা (মনোরমাদেবী) আমাকে যে কি স্নেহের সহিত কাছে টানিয়া নিলেন, মনে হইল যেন, কত দিনের পরিচিত আত্মীয়। ২।৩ দিন পরই আমি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ি, কাকীমা স্নেহময়ী মাতার ন্যায় আমার শুশ্রূষা করেন। আমরা শিশুকালে মাতৃহীন, মাতৃস্নেহের আস্বাদ এই প্রথম পাইলাম। একটু সুস্থতালাভের পরই বাবা আমাকে রাখিয়া চলিয়া যান, অথচ আমি কখনও একদিনের তরেও মনে করিতে পারি নাই যে, পরের

নিকট আছি। কাকীমার সেই শান্ত, ধীর, গম্ভীর, অথচ মিষ্ট স্বভাব-খানির স্মৃতি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার ভগবানে অটল বিশ্বাস সেই বালিকা-বয়সেই আমাকে বিস্ময়ে অবাক্ করিত। আমি একদিন তাঁহার সমাধির অবস্থাও দেখিয়াছি, সেই সময় তাঁহার কোলে কন্যা, অথচ সারাদিন বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া এক-ভাবে একস্থানে বসিয়া রহিলেন, এমন কি, এক এক বার তাঁর শিশু কন্যাকে স্তন্যপান করান হইল কিন্তু তবুও তাঁর জ্ঞান নাই। সংসারে শত কোলাহলেও তাঁর সেই ধ্যানের কোন ব্যাঘাত উপস্থিত করিল না। তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য ছিল। একবার তাঁর একটি নিকট আত্মীয়ার মৃত্যু-সংবাদ আসিল, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এই আত্মীয়াটি * পালন করিয়াছিলেন, সেই কারণে পুত্র অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন, ক্রমা-গত ফিট্ হইতে লাগিল। মাতা নীরবে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে পুত্রের শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিলেন; নিজে একটুও অধীর হইলেন না। দরিদ্রতায়, শোকে কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখি নাই। শিশুকাল হইতে যে কয়েকটি মাতৃস্থানীয়া মহিলার স্নেহক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছি ও যাঁহাদের মহৎ জীবনের উচ্চ আদর্শ বর্ত্তমানে আমার জীবনের পথনির্দ্দেশে সতত সাহায্য করিতেছে, শ্রদ্ধেয়া মনো-রমা দেবী তাঁহাদের মধ্যে একজন। ছয়মাস তাঁহার নিকট ছিলাম, একদিনও সঙ্কোচ বা অসুবিধা বোধ করি নাই, এই সময়ের মধ্যে

* এই আত্মীয়া অল্পবয়সে বিধবা হইলে, মনোরমার মাতা আড়াই বৎসরের মনো-রমাকে ইঁহার কোলে তুলিয়া দেন, ইনি মনোরমাকেও মায়ের ন্যায় পালন করেছেন। পাঠক ১ম খণ্ডে পড়িয়াছেন, ইনিই "মেজদিদি।"

তাঁহাকে কোন দিনও রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করিতে দেখি নাই, কাহাকেও ধমক দিতে শুনি নাই অথচ স্বভাবের এমনই অসাধারণত্ব ছিল যে, সকলেই আমরা যেমন তাঁকে ভালবাসিতাম, অন্য দিকে তেমনি ভয়ও করিতাম। তাঁহার নিকট মাতৃস্নেহের আস্বাদ পাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম। সন্তানকে বিদেশে পাঠানর সময় মা যেমন ব্যাকুল হন, আমি আসিবার সময় তিনি ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ীতে তুলে দিলেন। আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নাই; কিন্তু যে দিন শুনিলাম, তিনি ইহলোক ছাড়িয়া গেছেন, সে দিন যেন প্রাণটা হায় হায় করিয়া উঠিল। আমার প্রতি তাঁহার সেই অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা ভুলিবার নয়। তাঁহার সম্বন্ধে যে লিখিয়া বুঝাইতে পারি, সে শক্তি আমার নাই; তবুও তাঁহার স্নেহের ঋণ জীবনে ভুলিতে পারি না বলেই এইটুকু লিখিলাম।"

(৯ম পত্র)

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ (বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ)

—"এমন দেবীর বিষয় আমার কলমে আমার মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি, এমন আশা যদি করিয়া থাকেন, তবে কেবল কষ্টই পাইবেন, তবে যাহা মনে হইল, তাহাই লিখিলাম। সর্ব্বদা যাঁহার সঙ্গে থাকা যায়, তাঁহার চরিত্রের প্রভা, দেবভাব, সকল সময় সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। কিন্তু তবুও বৌ-ঠাকুরাণীর গৃহে তাঁহাকে দেবী বলিয়া প্রাণের সহিত ভক্তি না করেছেন, এমন বোধ হয়, আমাদের মধ্যে কেহই ছিলেন না। তখন আপনার গৃহে

মনোমোহন, রেবতী, চণ্ডীবাবু, বেণী, করুণ ও আমি ছিলাম, কতক দিন অমৃতও ছিলেন, তার পর গোরাচাঁদ বাবু দ্বারিকা বাবু, প্রেমিক গোবিন্দ বাবু, মথুর (কবিরাজ) বাবু সর্ব্বদাই আসিতেন এবং সকলেই বৌ-ঠাকুরাণীকে প্রাণের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন। কেবল তাহা নয়, ইহাদের কাহার কাহার মুখে আমি শুনিয়াছি যে, "ইনি পূর্ব্বজন্মের সাধন-ভজনের ফলে ইহকালে এই উন্নত ধর্ম্মভাব লাভ করিয়াছেন ও সমাধিস্থ হইয়া মকরন্দরসপানে বিভোর হইয়া সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবিয়া থাকেন।" আহা, সেই সমাধিস্থ অপূর্ব্বমূর্ত্তি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ভক্তিভাবে তাঁহার শরণতলে পড়িয়াছেন। সমাধিস্থ হইয়া আছেন, দিনের পর রাত্রি কাটিয়া গেল, এক ভাবেই দিনরাত কাটিয়া যাই-তেছে, সেই ধীর প্রশান্ত মূর্ত্তি অচল অটল ভাবে যোগাসনে আসীনা, শিশুছেলে হামা দিতে দিতে আসিয়া মায়ের স্তন্যপান করিয়া গেল, কিন্তু মা একবার শিশুকে আদর করিলেন না, বা কোলে লইলেন না। মা কোথায় কোন্ রাজ্যে ডুবিয়া রহিয়াছেন! শিশু মা মা বলিয়া ডাকিল, সাড়া নাই, শব্দ নাই, এমন দৃশ্য কি কেহ দেখিয়াছে? সে কি অপূর্ব্ব কি গভীর সমাধি! বৌ-ঠাকুরাণীর প্রাণ, মন, চিত্ত কেবল আনন্দধামে কি অমৃতরসপানে মগ্ন থাকিত, তাহা আমরা এখনও আস্বাদন করিতে সক্ষম নই। আহা, আমি কোথায়! আমি কত ক্ষুদ্র! আমি এই রসের মর্ম্ম কি বুঝিলাম, জানি না। বৌঠাকুরাণী এই রসাস্বাদনের কোন্ রাজ্যে প্রবেশ করিতেন, তাহা আমি ধারণাও করিতে পারি না। যখন আপনারা স্বার্থের তাড়নায় আবার বৌদিদিকে সংসারে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিতেন ও তাঁহার

কর্ণমূলে নাম করিতেন, তখন তিনি কত অনিচ্ছায় ফিরিয়া আসিতেন, তখনকার তাঁহার মুখের ছবি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। আপনার পত্র পাওয়ার পর একদিন উপাসনার শেষ অবস্থায় সেই "জ্যোতির্ময়ী শুভ্রবসনা দেবীমূর্ত্তি প্রেমাবেগে পূর্ণ হাসি-হাসি মুখ লইয়া আমার সম্মুখস্থ হইয়াছিলেন। অনেকদিন পর আবার দেখিলাম, প্রাণ ভরিয়া প্রণাম করিয়া ধন্য হইলাম। আমাকে এই অনুগ্রহ কেন করিলেন, বৌ-ঠাকুরাণী জানেন, তবে ইহা জানি যে, যেখানেই থাকুন না কেন, আমাকে ফেলিতে পারিবেন না।

সংসারে চলাফেরা, কাজ-কর্ম্মের বিষয় তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লেখা নিষ্প্রয়োজন। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যিনি আমার বৌদিদির সঙ্গে কয়েকদিন কাটাইয়াছেন, তিনি সেই দেবী-চরিত্রের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তাঁহাকে কোনও অবস্থায়ই হাসিশূন্য দেখি নাই, এমন নিস্বার্থ অভিমান-অহঙ্কারশূন্য, অমায়িক-প্রাণ! অম্লান বদনে সারাদিন খাটিতেছেন কিন্তু মুখে হাসি লেগেই আছে! সেই স্নেহমাখা করুণমূর্ত্তি আমার প্রাণে লেগেই আছে। ঘোরতর বৃষ্টি হইতেছে, ঘরে জল পড়িতেছে, বিছানা এ স্থান হইতে ও স্থানে নিতেছেন ও ছেলেপিলেদের টানাটানি করিতেছেন, হয় ত সমস্ত রাত্রি বিছানায় গা দিতে পারিলেন না। ধনীর কন্যা, পিতার গৃহে সুখে লালিত-পালিত, দরিদ্রতার ভীষণ-লাঞ্ছনা অম্লানবদনে হাসিমুখে সহ্য করিতেন। নিজের শরীরকে সাজাইতে তিনি কোন দিন জানিতেন না ও সে চেষ্টাও দেখি নাই, অথচ অন্যকে সাজাইয়া সুখী হইতেন। এখনও আমার স্ত্রী বলিয়া থাকেন, 'দিদির (মনোরমার)

একখানা মাত্র মুল্যবান্ সাড়ী ছিল, সেই সাড়ী তিনি কোন দিন পরিধান করেন নাই। আমি যখন আসিলাম, তিনি সেই একমাত্র সাড়ীখানা আমাকে দিলেন, সেই সময় আমার অনেক কাপড় ছিল, উহা না হইলেও আমার চলিত, তবুও তিনি সেই সাড়ীখানা আমাকে পরাইয়া পরম সুখী হইলেন।

'তিনি নিজে সাড়ীখানা পরেন, আমার একান্তই ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু তিনি বলিলেন যে, আমার ছোট বোন্‌কে না পরাইয়া কি করিয়া নিজে পরি' ? বাস্তবিকই এ সব কাজ তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। কেননা, প্রেমে বৌঠাকুরাণীকে এই আত্মত্যাগ শিক্ষা দিয়াছিল, কোন্ প্রেমে এই দরিদ্রতার লাঞ্ছনা অম্লানবদনে বহন করিতেন, এখন সকলেই বুঝিতে পারেন। তিনি অগাধ প্রেমসাগরে ডুবিয়া থাকিতেন, সেই প্রেমের বলেই কোন কষ্ট তাঁহাকে কষ্ট দিতে পারিত না। সংসারে থাকিয়া কেমন করিয়া সকল দুঃখ-কষ্ট বহন করিয়া হৃদয়-দেবতাকে হৃদয়ে লাভ করিয়া ধর্ম্মপথে চলা যায়, সেই জীবন্ত-চিত্র বৌঠাকুরাণী আমাদের কাছে রাখিয়া গিয়াছেন।"

(১০ম পত্র)

লেখক শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক ও 'ব্রহ্মবাদী'র সম্পাদক।

ওঁ

কল্যাণ কুটীর—বরিশাল।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ—১৩২৫।

"জীবন-পথে চলিতে-গিয়া বিবিধ সম্পর্কে বহুলোকের সংস্রবেই

আসিতে হইয়াছে। তাঁহাদের ভিতরে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। আজ আসন্ন-বার্দ্ধক্যে, এই নরনারীর সম্পর্কসূত্রে, লাভালাভের কথা স্বতঃই মনে আসিতেছে। অদ্য যদি সরলচিত্তে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিতাম, যাঁহাদিগকে জীবন-পথের সহায়রূপে, বান্ধবরূপে পাইয়াছিলাম, তাঁহারা সকলেই জীবনের পক্ষে ঠিক যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন, অধিকন্তু দিনের পর দিন ঘনিষ্ঠতম, অন্তরতম, হইয়াছেন, তবে জীবনটা কত সুখের হইত। কিন্তু তেমন সাক্ষ্য দিবার সৌভাগ্য আমার নাই। আজ ক্ষোভে, দুঃখে, বেদনায় বলিতে হইতেছে, জীবনের চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছি, অনেকের সাড়াশব্দ নাই। কত জন কত ভ্রমপ্রমাদগ্রস্ত হইয়া আজ বিরূপ বিরুদ্ধ। আর কত ভাই ভগিনী, অকপট অপার্থিব পবিত্র প্রীতি-সম্বন্ধ আজীবন সমান রাখিয়া অদ্য এই নশ্বর জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, এই বিদেহী দলের ভিতরে মনোরমা দেবী এক জন প্রধান।

আমি তাঁহাকে 'বৌঠাকরুণ' বলিয়া ডাকিতাম। ইহার পূর্ব্বে রক্ত-সম্পর্কিতা কোন নারীকে আমি আর এমন আপনার করিয়া ডাকি নাই অথবা এমন কেহ ছিল না। বিধাতার বিচিত্র বিধানে বহুদিক্ হইতে আমরা কয়েকজন ভাই আসিয়া আকাশের দিশাহারা পাখীর মত কিছু কালের জন্য আমরা এক বৃক্ষে একই কূলায়ে বাস করিয়াছিলাম। এই দলের ভিতরে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ই ছিলেন আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারে আমরা স্থান লইয়া পরিবারটিকে বড় করিয়া লইয়াছিলাম। মনোরমা দেবী ছিলেন পরিবারস্থ সকলের বন্ধনসূত্র। তিনি আমাদের সকলের—বিশেষভাবে আমার কে ছিলেন

আমি আজ তাহা লিখিয়া বুঝাইতে অক্ষম। আজ প্রায় এক মাস চেষ্টা ও চিন্তার পরে তাঁর সম্বন্ধে দুই চার কথা লিখিতে কলম ধরিয়াছি। কেবলি মনের ভিতরে এই দৈন্য যে লিখিতে গিয়া অমন স্বর্গীয় মহিমা-ময়জীবন বুঝি খাটো করিলাম, প্রকৃত পক্ষেও তাহাই হইবে।

আমি ৫।৬ বৎসর কাল কেমন করিয়া এই পরিবারের সেবক অথবা কর্ত্তা হইয়া অবাধে মনের সুখে কাটাইলাম, অদ্য আমি তার কারণ খুঁজিয়া পাই না। কেবল একটা কারণ বড় বলিয়া চোখের উপরে ভাসিয়া উঠিতেছে, সে কারণ মনোরমা দেবীর অকপট নিঃস্বার্থ নির্ম্মল অপার্থিব আত্মীয়তা। এমন আত্মীয়তা আমি আর এ জীবনে পাই নাই। তিনি জানিতেন, আমি তাঁর প্রকৃতই দেবর। আমার মত আপনার কেহ নাই। স্বামীর কাছে পারিবারিক খরচপত্রের কথা, অভাব-অন-টনের কথা বলিতেন না। বলিতেন এই দেবর ভ্রাতার কাছে। মনো-রঞ্জনবাবু আমাকে বড় আদর করিয়া "ভাইটি" বলিয়া ডাকিতেন। আমি তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতাম—এখনো ডাকি। অভাব অনা-টনের কথা স্ত্রী জ্ঞাপন করিলে দাদা, ভাইটির কাছে বলিতে বসিতেন। এমন সরল মধুর ভাইটি সম্বোধন আমাকে অদ্য পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। আমি এই পরিবারের এবং বহু নবাগত ব্রাহ্মবন্ধুর সেবক, ভাই ভাইটি, কাকা প্রভৃতিরূপে যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, আজ তাহা কল্পনার বস্তু বলিয়া মনে হইতেছে।

মনোরমা দেবী অরণ্যজাত বনফুলের মত সরল স্বাভাবিক সত্য-জীবনে আমাদের কাছে, প্রকাশিত ছিলেন। আবার কখনো বা মনে হয়, তিনি খনিজ হীরকের মত অসংস্কৃত, অপ্রকাশিত জ্যোতি লইয়াই

নীরবে আমাদের ভিতরে বাস করিয়াছিলেন। এমন নীরব জীবন আর প্রত্যক্ষ করি নাই। গাম্ভীর্য্যে সৌন্দর্য্যে প্রফুল্লমুখের হাসি সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ ছিল। শিশু পুত্র-কন্যা, বন্ধুবান্ধব, অতিথি-অভ্যাগতদিগকে লইয়া সে সময় বড়ই অভাবে ও দৈন্যে দিনপাত করিতে হইয়াছে, কিন্তু মনোরমা দেবীর মুখের স্বর্গীয় পবিত্র হাসি ও দীপ্তি দিনেকের জন্য ম্লান হইতে দেখি নাই।

শৈশব হইতে সুখের কোলে লালিত-পালিত হইয়া—২৩।২৪ বৎসর বয়সে যখন তিনি দুই তিনটি সন্তানের মা, তখন ব্রাহ্মসমাজ-ক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গে উপস্থিত হইয়া সমস্ত অপরিচিত ও নিঃসম্পর্কিতদিগকে লইয়া ঘর-সংসার পাতিলেন। বলিতে কুণ্ঠা নাই, এই সবে তাঁর সংসারের রন্ধন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে হাতে খড়ি। বড় সঙ্কোচে, সন্তর্পণে তিনি আমাদিগকে প্রথম প্রথম ডাল ভাত, তরকারি রান্না করিয়া খাওয়াইতেন। আমরা বন্ধুরা তাঁর হাতের রান্না (বিচারতঃ তেমন কিছু নয়) অমৃত জ্ঞানে আহার করিয়া পরমা প্রীতি লাভ করিতাম। সকলের খাওয়া হইয়া গেলে নিজের জন্য অনেক দিন হয় ত কিছু থাকিত না কিন্তু কাহারও বুঝিবার কোনরূপ সম্ভাবনা ঘটিত না। আমরা বন্ধুরা—বাবু রেবতীমোহন সেন, বাবু রাজকুমারঘোষ, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ গুহ, প্রভৃতি সকলেই আমরা মনে করিতাম, মনোরমা দেবী আমাদের ভগিনী, বৌঠাকুরুণ, অধিকন্তু যেন জননী। সকলের উপরে এমন সমান প্রেম, সম-দৃষ্টি জীবনে আর প্রত্যক্ষ করি নাই।

তাঁর কথা সংক্ষেপে কি বলিব? জগতে ঘুণাক্ষরেও স্নেহ প্রেম ভালবাসাতে প্রদর্শন নাই, এমন দৃষ্টান্ত বিরল। মনোরমা দেবীর প্রেমে

তাহার একান্তাভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁর প্রেমের আদর অভ্যর্থনায় কোন দিন একটি শব্দ পাইলাম না। বিদ্যালয়ের কার্য্য শেষ করিয়া গৃহে আসিলে অন্নদায়িনী জননীরূপে নীরবে সহাস্য মুখে খাবার লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, সে নীরবতার ভিতরে কত যে আদর-যত্ন, আগ্রহ লুক্কায়িত ছিল, মনে হয়, যেন আর কোথায় ও এমন নূতন চিত্র দেখি নাই। আমরা বন্ধুরা, অনেক সময়ে একত্রে সকলে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের এই স্বর্গীয়া ভগিনী একাকিনী সকলের পথ্যাদি দান করিয়া অপরাহ্নে একমুষ্টি অন্ন গ্রহণ করিয়া রোগীর শিয়রে আসিয়া আবার জননী হইয়া বসিয়াছেন। আমার শিয়রে তাঁকে এই ভাবে বহু সময়ে পাইয়াছি। তিনি বয়সে সমান হইলেও তাঁকে মাতৃরূপে দর্শন করিয়া এবং তাঁর সেবা পাইয়া ধন্য হইয়াছি।

জীবনে তাঁহার কি এক অপূর্ব্ব দৃঢ়তা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও প্রশান্ত ভাব দেখিয়াছি। অভাবগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারে দিবসব্যাপী কর্ম্মের ভিতরে এক দিনের জন্য,বিক্ষেপ, বিমর্ষ, অস্থিরতা, উদ্বেগ দেখিলাম না। তাঁহার জীবনটা যেন অচঞ্চল স্থিরজলধি। সকল আনন্দে, সকল সাধু-প্রসঙ্গে, সকল পবিত্র সম্মিলনে, সকল উৎসবক্ষেত্রে তিনি উপস্থিত থাকিয়া নীরবে স্বর্গীয় হাসির ভিতর দিয়া তাঁর সহানুভূতি ও আনন্দ ব্যক্ত করিতেন কিন্তু কোন দিন ভাষায় প্রকাশ হইতে দেখিলাম না।

পরিবার-ক্ষেত্রে বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে আমাদের ভিতরে কত সময় মত, বিশ্বাস, ও কর্ম্ম লইয়া কত তর্ক-বিতর্ক হইত, তাহাতে কখনো যে বিমর্ষ না ঘটিয়াছে, এমন নহে; আহা! গৃহ-কোণে মনোরমা দেবী,

সে সকলের ভিতরে থাকিয়া ও যেন সে রাজ্যেই নাই। তিনি আপন মহিমাতে আপনি থাকিয়া আমাদের সকল বিমর্ষ দূর করিয়া দিতেন। তাঁর ধর্ম্ম বিশ্বাস স্বাভাবিক সত্য ভূমিতে থাকিয়া কি যে উদার ভাবের পরিচয় দিয়াছে তাহা আমি আজ বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

শিক্ষা, সভ্যতা, অনুশীলন ও অনুকরণ-বিহীন সত্য ধর্ম্ম-জীবন বলিতে ও বুঝিতে নারী সমাজে এমন জীবন আমার চক্ষে আর উপস্থিত হইয়াছে, এ কথা আমি বলিতে পারি না। ভগবৎ লাভ হইলে মানুষের জীবন যেমন হয় তাহা মনোরমা দেবীর জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিয়াছি। তিনি সমাধিস্থ হইয়া ধ্যান-নিমগ্না যোগিনী রূপে যখন সেই ভগ্ন-পর্ণ-কুটিরে ঘণ্টার পরে ঘণ্টা অতিবাহিত করিতেন, তখন সেই কুটির যেন সৌন্দর্য্যে সুগন্ধে স্বর্গীয় মহিমায় ভরপূর হইয়া উঠিত। আজ কত স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে।

পূর্ব্বে বেদনা প্রকাশ করিয়াছি, কত বন্ধুবান্ধব আজ বিরূপ কিন্তু মনোরমা দেবী আজ এ জগতে থাকিলে তাঁর সম্বন্ধেই কেবল এ দুঃখ প্রকাশ করিবার কারণ থাকিত না, ইহা প্রমাণিত ধ্রুব-সত্য। আজ আমি তাঁর স্নেহ ভালবাসার সমান অধিকারীই রহিয়াছি। সেই দেবী-রূপিনী বৌঠাকরুণ, আমাকে স্বর্গলোক হইতে জীবনপথে সাহায্য করিতেছেন, এই বিশ্বাস অদ্য আমার পক্ষে এক পরম-গৌরব ও পরম সান্ত্বনার বিষয়।"

সমাপ্ত

মনোরঞ্জন বাবুর অন্যান্য গ্রন্থ

১। **কুম্ভ-মেলা।** মেলার বিবরণ ও মহাত্মাদিগের জীবন-কথা সমন্বিত এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ তৃতীয় সংস্করণে বহুলরূপে পরিবর্দ্ধিত, সচিত্র ও উৎকৃষ্ট বাঁধাই।

জ্ঞানবৃদ্ধ দেব-গৃহবাসী ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের উক্তি—"গ্রন্থখানির প্রতি পংক্তিতে ভক্তি-সুধা উথলিয়া পড়িতেছে। এই ত্রিতাপ-জ্বালা-পূর্ণ সংসারে এই গ্রন্থখানি শান্তি-প্রদ হইয়াছে।"

দেশ-পূজ্য শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—"এই অতি উপাদেয় গ্রন্থখানি নূতন সংস্করণে আরও অধিক উপাদেয় হইয়াছে। মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

২। **মনোরমার জীবন-চিত্র।** ১ম খণ্ড মূল্য ১।০ বাঁধান ১॥০ দেড় টাকা।

৩। **নির্ব্বাসন-কাহিনী।** স্বদেশী আন্দোলনে নির্ব্বাসিত গ্রন্থকারের চৌদ্দ মাস নজরবন্দী অবস্থার ইতিহাস।

"Intensely interesting from start to finish" Modern Review মূল্য ॥০ আট আনা।

৪। **চম্‌-চম্‌।** একান্ত চিত্তাকর্ষক ও উপদেশ-পূর্ণ সচিত্র গল্পের বহি। দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ।৴০ আনা।